

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর
বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে
তুলে দিলাম।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

* জসীমউদ্‌দীন
* কবি ফররুখ আহ্‌মদ
* মোজাম্মেল হক
* 'কাব্যনির্মাণকলা' : আরিস্ট্‌টল

ভূমিকা

পঞ্চাশের গোড়ার দিক থেকেই প্রবন্ধ লিখ্‌তে শুরু করি। অনেক পত্র-পত্রিকা ও সংকলন গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রবন্ধ। সে-সব থেকেই বেছে নিয়ে চৌদ্দটি প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা গেল। প্রবন্ধগুলো নির্বাচনে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক স্নেহাস্পদ মনসুর মুসা। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত দুটি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একটি এবং নজরুল সম্পর্কিত দুটি রচনা ইতিপূর্বেই কোন না কোন সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। বাকীগুলো 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', 'পরিচয়', 'সারস্বত', 'পূবালী', 'সওগাত', 'মাহে-নও', 'সাহিত্যিকী', 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যাপারে 'মুক্তধারা' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন বন্ধুবর জনাব আবদুস সাত্তার সাহেব। এছাড়াও নানাভাবে সাহায্য করেছেন জনাব আবদুল হাফিজ, জনাব শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ ও আরও অনেকে। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই 'মুক্তধারা'র শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা মহাশয়কে, যিনি লাভ-লোকসানের কথা বিবেচনা না করেই আমার গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। আমার পুত্র শ্রীতুহিনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কন্যা কাকলি এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়ে আমার কাজকে অনেকটাই আনন্দদায়ক করে তুলেছে। তাদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। আমার সকল কর্মে যিনি প্রেরণা যুগিয়ে থাকেন, তাঁর কথা এখানে নাই বা বল্‌লাম। গ্রন্থটি পাঠকমহলে কিছুটা সমাদর পেলে কৃতার্থ বোধ করব।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিদ্যাসাগর ঃ সংস্কারক এবং শিল্পী	১
সাহিত্য-সমালোচক বিদ্যাসাগর	২৪
মীর মোশাররফ হোসেন ও তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'	৫২
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি	৭৩
রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রবন্ধ-সাহিত্য	৯০
মোজাম্মেল হক	১০৬
নজরুল কাব্যত্রয়ী ঃ অগ্নিবীণা-বিষের বাঁশী-ভাঙার গান	১২০
নজরুল ইসলাম ও বাংলা কবিতার ছন্দ	১৪২
নজরুলের সাহিত্য-ভাবনা	১৫৭
মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্	১৭২
কবি জসীম উদ্‌দীন	১৮৩
বাঙলা লোকনাট্যের ধারা ও জসীম উদ্‌দীন	২১৩
শিশু সাহিত্যিক জসীম উদ্‌দীন	২৩৭
বাংলা কাব্য সমালোচনায় পথিকৃত ঃ হরচন্দ্র ও রঙ্গলাল	২৪৫

বিদ্যাসাগর ঃ সংস্কারক এবং শিল্পী

বহু বরণীয় মানুষ ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ধন্য হয়েছিল। তাঁদের অনেকে আজ বিস্মৃত, অনেকের স্মৃতি আজও হয়তো প্রদীপের ন্যায় মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে, যুগঝঞ্ঝার ফুৎকারে কখন বা তা নিভে যায় তার ঠিক নেই। কিন্তু যুগঝঞ্ঝার তীব্র আক্রমণের মুখেও নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় আজও নিজ মহিমা প্রকাশ করে চলেছে, এমন একটি ব্যক্তিত্বের কথা আমরা কোন ক্রমেই বিস্মৃত হতে পারি না। সে ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য যুগান্তরেও ক্ষীণ হয়নি, বরং নতুন সমিধ পেয়ে তা আরও যেন বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে অপরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটি হলেন 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বিদ্যাসাগর। বরণীয় অনেক মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন, কিন্তু প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যে তিনি ছিলেন 'একতম'। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্য ও তজ্জনিত অভিনবত্বের ইঙ্গিত করতে গিয়ে জনৈক সুধী বলেছেন ঃ

''আমাদের এই মানুষের সমাজে দেবতার চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ মানুষ। তপস্যা করে জীবনে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সহজে এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যিনি মানুষের মতন মানুষ। মানুষের পক্ষে এ সমাজে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া যত সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয়। আজও আমাদের সমাজে, বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহরকালে, অতিমানুষ ও মানবদেবতাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ যত স্বল্পায়াসে হয়, সামাজিক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আদৌ সেভাবে হয় না। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, আমাদেরই এই সমাজে তাই যখন দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষ পর্বতের

মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, কোন অলৌকিক শক্তির জোরে নয়, সম্পূর্ণ নিজের মানবিক শক্তির জোরে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।" ১

বস্তুত আমাদের সমাজে 'মানুষের চেতনার আকাশ' যেখানে শত শতাব্দীর জের টেনে 'অতি-প্রাকৃত লোকের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল' 'সেই সমাজের মানস-পটে বিদ্যাসাগরের মতন এক মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব' হয়েছিল 'কি করে', তা ভাবতে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তাঁর পূর্ব-পথিক রামমোহন আমাদের চেতনার আকাশের ঐ কুয়াশাচ্ছন্নতাকে বিদীর্ণ করে সমাজের মানস-পটে একান্ত মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেও ধর্ম ও শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন। শাস্ত্রাচারের চক্রব্যূহে প্রবিষ্ট হয়ে অভিমন্যুর ন্যায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে অনেক কণ্টকই তিনি উৎপাটন করেছিলেন সন্দেহ নেই। তবে ঐ ক্ষেত্রেই 'pinned down' হয়ে পড়েছিলেন বলে বৃহত্তর সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি আত্মবিস্তারের সুযোগ পাননি। তাই তাঁর মানবিক ব্যক্তিত্বও পরিপূর্ণ প্রভায় জ্বলে উঠ্‌তে পারেনি। বিদ্যাসাগর ধর্ম ও শাস্ত্রাচারের দুর্গে প্রবেশ করে, কেবল মানুষকেই সকল কর্ম-চিন্তা ও ভাবনার কেন্দ্র করে, অতিলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের বশ্যতা অস্বীকার করে, সামাজিক জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেই অসাধ্যকে সাধ্য করে তুলেছিলেন। ধর্ম ও শাস্ত্রাচারের দুর্গ থেকে তাঁর প্রতি তীর বর্ষিত হয়েছে, হুমকি প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি সব্যসাচীর ন্যায় এক হাতে সে আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, তার প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন যুক্তি ও তর্কের লক্ষ্যভেদী বাণ নিক্ষেপ করে আর এক হাতে রচনা করে চলেছিলেন মানব-কল্যাণের নানা ক্ষেত্র শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারমূলক নানাবিধি কাজের মধ্য দিয়ে। অপরাজেয় পৌরুষ, অদম্য মনোবল, অপরিসীম চরিত্রবল ও অতুলনীয় কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণকে প্রায় নিঃসঙ্গভাবে

১। বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বঙালীসমাজ, ১ম খণ্ড। । প্রথম সংস্করণ। পৃঃ ১।

মোকাবেলা করে তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের মধ্যাহ্নলগ্নে শাস্ত্রাচার ও দেশাচারের শ্বাসরুদ্ধকারী অশুভ প্রভাবে আবিষ্ট বাঙালী সমাজে সুস্থ মানববুদ্ধির জয় ঘোষণা করে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তাই যুগান্তরে আমাদের মানুষ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে অনেকটাই সম্ভব করে তুলেছে।

বিদ্যাসাগর-জীবনীকারের মত আমাদের মনেও এক বিস্ময়ান্বিত প্রশ্ন জাগে ঃ "যে সমাজে মানুষের চেতনার আকাশ অতি-প্রাকৃত লোকের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই সমাজের মানস-পটে বিদ্যাসাগরের মত এক মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হল কি করে?"[২] উনিশ শতকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন-গড়নের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের পক্ষে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন বলে মনে হবে না। তাঁরা বল্‌বেন, 'যুগের পরিবর্তন হয়েছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল'। উনিশ শতকে না জন্মে দু' এক শতাব্দী আগে জন্মালে পরিবেশের সার্বিক বিরুদ্ধতা মানবকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার জগৎ থেকে বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে যেত ধর্মীয় মুক্তিসাধনার আত্মিক জগতে। চরিত্রগুণে তিনি হয়তো দেবতার মর্যাদা লাভ করতেন, কিন্তু তিনি মানবসর্বস্ব কর্ম-চিন্তার বৈভব দেখিয়ে একালের বহু মানুষের মধ্যে 'একজন বিশিষ্ট মানুষ হতে পারতেন না'। আসল কথা, উনিশ শতকে ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশে যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, সেই নবযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক লক্ষণ ছিল মানব-কেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যানধারণার ব্যাপক স্ফূর্তি। সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় মানব-চিন্তার এই আদর্শকেই বলে হিউম্যানিজম্‌। অপার্থিব, অমর্ত্য, অদৃশ্য ও অলৌকিক জগৎ থেকে পার্থিব, মর্ত্য, পরিদৃশ্যমান লৌকিক জগতের প্রতি মানুষের সকল চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াসই হিউম্যানিষ্ট আদর্শ। এর ফলশ্রুতি হল মানবতন্ময়তা ও মানবমুখিনতা। বিদ্যাসাগর এই আদর্শেরই ব্যাপক প্রেরণায় 'দুঃসাহসিক সমাজ-কল্যাণ ব্রতে' উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বিদ্যাসাগরের

২। পূর্বোক্ত পৃঃ ৪।

পূর্বে রামমোহনে এ প্রেরণা বেশ কিছুটা কার্যকরী লক্ষ্য করি। তার পরেও অনেক কৃতিমান্ বাঙালীর কর্ম ও চিন্তাধারায় তার তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু উনিশ শতকে তো বটেই, এই বিংশ শতাব্দীতেও হিউম্যানিষ্ট কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের তুল্য মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব একটিও চোখে পড়ে না। বিদ্যাসাগরের সমকালে এবং তাঁর পরেও এদেশে প্রতিভাবান, বিদ্বান্, দানশীল মানুষের অভাব ঘটেনি। কিন্তু বিদ্যাসাগর-চরিত্রে মনুষ্যত্বের যে অখণ্ড, সর্বব্যাপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করি এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। প্রথমাবধি বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা শিক্ষাসংস্কার, সমাজসংস্কার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবরূপায়ণপ্রচেষ্টা পরিচালিত হয়েছে ঐ সুউচ্চ মনুষ্যত্ববোধ-প্রসূত সার্বিক কল্যাণকামনা দ্বারা। কোন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির কথা, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাব, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের দুর্বল কামনা বা অমরত্বলাভের বাসনা থেকে তাঁর কর্মে প্রবৃত্তি জন্মেনি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা না চাইতেই এসেছে, অবশ্য তার জন্যে তাঁর কোন মাথা-ব্যথা ছিল না। হীন, স্বার্থান্ধ প্রতিপক্ষের হিংস্রতার উগ্রতা কখনই পারেনি এ দৃঢ়চেতা লোকটিকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলতে। সকল রকম হীনতাকে তিনি তাচ্ছিল্য করেছেন। শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সবার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছিল তাঁর কর্মযজ্ঞের অজস্র সুফল। অনন্যতন্ত্র প্রতিভার বলে নয়, অনন্যতন্ত্র মনুষ্যত্বের অখণ্ড মহিমার গুণেই তাঁর ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের উত্তুঙ্গতা লাভ করেছিল। তাঁকে অতিক্রম করার সাধ্য আজ পর্যন্ত কারও হয়নি। মধুসূদন যে তাঁকে greatest Bengali বলেছিলেন সেটা তাঁর কৃতজ্ঞ কবিচিত্তের সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র ছিল না। সেটা ছিল মহাকবির সুগভীর অন্তরানুভূতি ও মানবচরিত্রে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ মহাসত্য। ঐ একই বোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছিল বিদ্যাসাগর প্রশস্তি।[৩]

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই অপার মহিমাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে তাঁর জীবনের সেই 'হিউম্যানিষ্ট' আদর্শকেই ভালভাবে

৩। রবীন্দ্রনাথ—চারিত্রপূজা গ্রন্থের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রবন্ধচতুষ্টয় দ্রষ্টব্য।

বুঝতে হবে, যে আদর্শ তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে, তাঁর সাহিত্যকর্মে, শিক্ষাসংস্কারমূলক কাজে ও 'সমাজ কল্যাণের গণতান্ত্রিক' কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং যার ফলে উনিশ শতকের বাংলাদেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি চরিত্র বিশ্লেষণে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছেন। মধুসূদন বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত চিঠিপত্রে, রবীন্দ্রনাথ অনুপম চারটি প্রবন্ধে এবং রামেন্দ্রসুন্দর একটিতে অতি সার্থকভাবে সে চরিত্র-মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমি ইতিমধ্যেই সে চরিত্র-মহিমার ইঙ্গিত দিয়েছি। এখন দেখাতে চেষ্টা করব শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারমূলক নানাবিধ মানব-কল্যাণকর কাজ ও সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে কিভাবে তাঁর হিউম্যানিষ্ট অর্থাৎ মানবমুখিন জীবনাদর্শ জয়যুক্ত হয়েছে।

একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা, এমন কি তাঁর সাহিত্যকর্মও মূলত সংস্কারমূলক। দৈন্য-দুর্দশাগ্রস্ত বিকলাঙ্গ হিন্দু-সমাজকে তিনি ব্যাপক শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সুস্থ ও সবল করে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। ঐ একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি বাঙালী শিক্ষার্থীর জন্যে 'an enlightened Bengli Literature' সৃষ্টির চেষ্টা পেয়েছিলেন। বাংলা গদ্য ভাষার একটি সুষ্ঠু প্রকাশক্ষম রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজীর ভাণ্ডার থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে নতুন সাহিত্যের ভিত নির্মাণের অক্লান্ত সাধনা ঐ একই সংস্কারপ্রয়াসেরই বিচিত্র ভঙ্গিমা। মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস তিনি পাননি, তাঁর অবকাশ হয়নি বলেই বোধ হয়। মানব-কল্যাণ কামনায় অধীর অসহিষ্ণু এই মানুষটি এদেশের আপামর জনসাধারণের মূক মুখে ভাষা যোগানের কাজকে, নিজের স্বাধীন শিল্প-সাধনার চেয়েও, বড় কাজ মনে করেছিলেন। তাই স্বাধীন কল্পনাপুষ্ট 'মৌলিক' সাহিত্য রচনার পথে না গিয়ে তিনি বাংলার শিশুদের জন্যে, কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্যে, বাংলা ভাষায় প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য জ্ঞানগর্ভ পাঠ্যগ্রন্থ রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন বেশী করে। সবচেয়ে বড় কাজ যেটি তিনি করেছিলেন সেটি হল নিতান্ত

শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ভদ্রসমাজের উপযোগী করে মার্জিত ও পরিশীলিত রূপ দান করলেন। আর এই গদ্য ভাষারই প্রকাশক্ষমতা যাচাই করার উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্কৃত, ইংরেজী ও হিন্দী থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে লিখেছিলেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' ও 'ভ্রান্তিবিলাসে'র মত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে তাঁর গদ্যরচনাশৈলী চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে। অবশ্য 'বিধবা-বিবাহের' মত বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে রচিত গ্রন্থে এবং বিশেষত বেনামীতে রচিত কয়েকটি ব্যঙ্গরচনায় সে-ভাষা যে আরও ঋজুতা লাভ করেছে, তা বলাই বাহুল্য। ভাষার প্রাণশক্তি আবিষ্কারের এই অতন্দ্র সাধনা তাঁর শিল্পীমনের অর্গল যে খুলে দিয়েছিল, সে কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাঁর অনুবাদমূলক আখ্যায়িকা গ্রন্থেই নয়, বিতর্কমূলক রচনায়, এমন কি তাঁর রচিত শিশুপাঠ্য অনেক পুস্তকেও, এই শিল্পীমনের স্বাক্ষর মিলবে। তাই সংস্কারক বিদ্যাসাগর শিল্পীও বটেন সন্দেহ নেই।

কনিষ্ঠ সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগরের ভাষার অপরূপ মাধুর্যের প্রশংসা করেও, তাঁকে মৌলিক স্রষ্টার কৃতিত্ব দানে অস্বীকৃতির অজুহাত স্বরূপ বলেন যে তাঁর সৃষ্টি মূলত অনুবাদমূলক, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজীর ভাণ্ডার থেকে গৃহীত, তখন তাতে পূর্বসূরীর কৃতিত্বকে অহেতুক খাটো করে দেখবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আসলে অমন সুমধুর ভাষাসৃষ্টির ক্ষমতাকে শিল্পকর্ম বহির্ভূত ব্যাপার মনে করাটাই একটা অরসিকের কাজ, একথা বঙ্কিম ভালভাবেই জানতেন। তাই ভাষার মাধুর্যের প্রশ্নটিকে উল্লেখমাত্র করে তিনি রচনার বিষয়বস্তুর মৌলিকতার অভাবের ধুয়া তুলে বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তাকে কটাক্ষ করেছেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমের personal prejudice-ই যে বঙ্কিমের এই বিভ্রান্তির জন্যে দায়ী তা না বললেও চলে। সে যাই হোক, একথা স্বীকার্য যে, যে হিউম্যানিষ্ট আদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার কর্মে হাত দিয়েছিলেন, সেই একই প্রেরণায় তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যকর্মে সংস্কারকের

মনোভঙ্গী ও উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে উঠলেও, বিস্মিত হবার কিছু নেই। তাঁর সকল কর্মই পরিপূরক, তাঁর অখণ্ড মনুষ্যত্ববোধের পরিপোষক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের এই কর্মধারার পিছনে তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের কয়েকটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষার পোষকতা লক্ষ্য করা যায়। সে দুটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "সে-কালে বাঙালী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চেয়েছিল স্থায়িত্ব, সমাজ-ব্যবস্থায় চেয়েছিল হিন্দুয়ানি ও খ্রীষ্টানির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা।"[৪] বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকধর্মী গদ্য-রচনায় এবং সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারমূলক কাজে স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য অর্জনের ঐ মৌলিক আকাঙ্ক্ষা দুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগর তাঁর সত্তর বছরের জীবনে যে বিপুল কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন, তার তাৎপর্য একালের বাঙালীর পক্ষে তাই অপরিসীম। মানব-হিতকর বিচিত্র কর্মযজ্ঞে গোটা জীবনটাকেই যেন আহুতি দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর জন্যে জীবনের সকল আরাম আয়েশকে তুচ্ছ করেছিলেন, সমাজের নিন্দা-গঞ্জনাকে করেছিলেন অঙ্গভূষণ, সাংসারিক জীবনের সুখশান্তি থেকেও বঞ্চিত করেছিলেন নিজেকে। আচারের নীরস মরুবালিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল যে জীবনপ্রবাহ, যাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল নানা জীর্ণ সংস্কারের শৈবালদাম, তাকে জীর্ণতা-মুক্ত করে নবজীবনের খাতে পরিচালিত করার এক সুকঠিন দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তিনি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গ্রীক-পুরাণের রাজা Augeas-এর আস্তাবলে যুগ যুগ-সঞ্চিত অশ্বপুরীষের পর্বতস্তূপ অপসারণ করতে যেমন দরকার হয়েছিল Hercules-এর মত মহাবলশালী মানুষের হস্তক্ষেপ, তেমনি শাস্ত্রাচারের দুর্গে বন্দী ভ্রষ্ট-চরিত্র, নষ্ট বিবেক, সংস্কারের ক্রীতদাস এ দেশের সহস্র সহস্র মানুষকে দুঃসহ নারকীয় পরিবেশ থেকে মুক্তির আলোতে নিয়ে আসার জন্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুঃসাহসী, অক্লান্তকর্মী 'সর্বত্যাগী' সংগ্রামী মানুষ বিদ্যাসাগরের। মহাবল হার-কিউলিসের ন্যায়ই বিদ্যাসাগর সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের বেগবান

৪। প্রমথনাথ বিশী, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৮

প্রবাহ রচনা করে দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন এদেশের সামাজিক মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রার প্রতিবন্ধক নানা কদাচারের যুগযুগান্ত-সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপ। একদিকে সবরকম জীর্ণতার অবসান কামনা, অপর দিকে নব জীবনের বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় মানবিক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা —এই দ্বৈত তাগিদে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাতে সাফল্য কতটা এসেছিল, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ফল যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, বাংলাদেশের বিবর্তমান ইতিহাস তার সাক্ষ্য। যদি বলি, একালের বাঙালীর মেরুমজ্জায় যে কিছুটা শক্তি লক্ষ্য করা যায়, সুস্থ জীবনের স্বাদ পাওয়ার যে তীব্র তাগিদ তার দৈনন্দিন আচরণে পরিস্ফুট, ভাষায়-সাহিত্যে তার মানস-সমৃদ্ধির যে পরিচয় দেদীপ্যমান, তার মূলে বিদ্যাসাগরের সংস্কার-কর্মের অবদান অনেকখানি, তা বোধ হয় কোন যুক্তিতেই অস্বীকার করা চল্‌বে না। দেশাচার ও শাস্ত্রাচারের দুর্গে বন্দী, বহুকাল ধরে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে জড়ত্ব-প্রাপ্ত বাঙালীর ভাব-চিন্তার রুদ্ধ জগতে বিপ্লবী সংস্কার-কার্যের জোরালো হাওয়া বইয়ে দিয়ে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাই যে ঊনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু-সমাজকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছিল, তা এক তর্কাতীত সত্য। মোটকথা, মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডূকতা ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করে বাঙালীকে আধুনিক জীবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে রামমোহনের পরেই একতম কৃতিত্বের দাবিদার বিদ্যাসাগর। রামমোহন আধুনিকতার আগমনী গেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সমাজ-জীবনের চৌহদ্দিতে।

আগেই বলেছি, রামমোহনের মত ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, বিদ্যাসাগর বৃহত্তর সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত হতে দেননি। পারলৌকিক বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে সবল কাণ্ডজ্ঞানের প্রশস্ত প্রয়োগক্ষেত্রে সামাজিক জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন নিজের দূরদর্শিতার। তিনি বুঝেছিলেন তর্ক দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় মূঢ়তাকে আঘাত হানা যায় বটে, কিন্তু তাতে শীঘ্র সুফল লাভের আশা দুরাশাই বটে। তার চেয়ে যে দেশাচার শাস্ত্র ও ধর্মের

মস্তকে পদাঘাত করে মানুষকে চূড়ান্ত হীনতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যা মানুষের সুস্থ বিবেকবুদ্ধির উপর একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিশেষ, যা মিথ্যা সংস্কারের কূপে নিক্ষেপ করে যুগযুগ ধরে সামাজিক নরনারীর দুর্দশার একশেষ ঘটাচ্ছে, যার প্রশ্রয়ে মূর্খতা ও অজ্ঞানতা দম্ভভরে পাণ্ডিত্যের মুখোশ এঁটে স্বাধীন চিন্তাকে টুঁটি চেপে মারার মত আস্ফালন করে, সেই সর্বনাশা দেশাচারের দুর্গে আঘাত হেনে তাতে ফাটল ধরিয়ে বন্দী মানুষগুলোর মুক্তির পথ করতে পারলে পরিণামে বেশী সুফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, একথা তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই দেখি নানা কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন সামাজিক অচলায়তনের দিকেই তিনি প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। একদিকে শিক্ষার সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে তিনি সেই অবরুদ্ধ অচলায়তন থেকে বহির্গমনের পথ নির্দেশ করে সবাইকে মুক্তির নবালোকে আহ্বান করেছিলেন। অপরদিকে সংস্কারকের সম্মার্জনী প্রয়োগে সমাজ-জীবনের জরা-জীর্ণতার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত মুছে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন প্রাত্যহিক জীবনের এ বর্ত্মেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির, সুযোগ পাওয়া যাবে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের। ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী মানুষের প্রাণে সত্যবার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এই পথেই। তাই দেখি বিদ্যাসাগর ধর্মীয় বিতণ্ডায় না জড়িয়ে পড়ে অযথা শাস্ত্রবিচারে কাল হরণ না করে সমাজ-সংস্কারের বাস্তব পথ ধরেছিলেন প্রথম থেকে। সমাজ সংস্কারের তাগিদেই বাস্তব-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তিনি শিক্ষা-সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। আবার শিক্ষা-সংস্কারে সার্থকতা অর্জনের বাস্তব উপায় হিসেবেই তিনি বাংলা ভাষায় জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। বাস্তববুদ্ধিই তাঁকে শিখিয়েছিল যে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য যত মূল্যবানই হোক না কেন, দেশীয় ভাষায় তার রস-সম্পদ আস্বাদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে, তার দ্বারা কোন কল্যাণসাধন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা-সংস্কারের ব্যাপারে নানা সুপারিশ করতে গিয়ে একটি কথা প্রথমেই স্পষ্ট করে [illegible]ছেন যে শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রথম

লক্ষ্য হওয়া উচিত "এক সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলা।"[৫] মোট কথা, তাঁর সকল সংস্কার প্রচেষ্টা ছিল একটি সুশৃঙ্খল চিন্তা-প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি এক সুদক্ষ সেনানীর ন্যায় সুপরিকল্পিত চিন্তা-প্রণালী অনুযায়ী একটির পর একটি আক্রমণ রচনা করে সামাজিক অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে মুক্তির নবালোকে বাঙালীকে টেনে এনেছিলেন। এ সংগ্রাম বড় সহজ ছিল না—এ ছিল তাঁর জন্যে এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষা।

এ কার্যে সহযোগিতা তিনি যতটা পেয়েছিলেন, বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার চেয়ে শত গুণে বেশী। রামমোহন ও ইয়ংবেঙ্গলের ভাবধারায় তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার পূর্বসূত্র পাওয়া যায় সন্দেহ নেই; কিন্তু বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গলের ক্রিয়াশীলতা কোনদিনই তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে দেশাচার অমান্য করার, পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানার সৎসাহস তাঁদের অনেকেই দেখিয়েছেন, কিন্তু কোন সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে তা সমাজের জন্যে তেমন ফলপ্রদ হয়ে উঠেনি। বিদ্যাসাগরই প্রথম সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ, পণ্ডিতসমাজের একাংশের এবং কতিপয় অনুরাগী বন্ধুর প্রায়শ মৌখিক ও নৈতিক সমর্থন ছাড়া বিশেষ কোন সাহায্যই তিনি পাননি। একাই তিনি সহস্র রথীর ন্যায় অমিত বিক্রমে সংগ্রাম করে গিয়েছেন সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। একবার কাজে নেমে পড়লে, কিছুতেই পিছ-পা হননি তিনি। আপন কল্যাণব্রতের মহিমায় নিঃসংশয় বিশ্বাসের অধিকারী এই মানুষটি যে অদ্ভুত কর্মোদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রায় নজিরবিহীন। নানা সংস্কারমূলক কাজ উপলক্ষ করেই প্রকাশ পেয়েছিল এই কর্মোন্মাদনা। একদিকে দেশে সাধারণ-শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্যে যেমন তিনি অক্লান্ত কর্মীর ন্যায় কাজ করেছেন, অপর দিকে শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্যে দিনরাত চিন্তা করেছেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের সুপারিশ করে তিনি যে একাধিক

৫। বিনয় ঘোষ প্রণীত 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' ৩য় খণ্ড। পরিশিষ্টে উল্লিখিত Notes on Sanscrit College দ্রষ্টব্য।

রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও নৈয়ায়িক মন অপূর্ব ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গতি বিধান করে সংস্কৃত কলেজকে তিনি 'মানবতার নার্সারী' রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভাবাবেগ নয়, সুস্থ যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বলেই তিনি বেদান্তের মত দেশীয় দর্শনকে পাঠ্য-তালিকা থেকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের জীবনবাদী দর্শন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্যে সংস্কৃত শিক্ষার সাথে ইংরেজী বিদ্যার সামঞ্জস্য বিধানের গুরুত্ব তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন। এ কার্য সাধনে বাস্তব পন্থা নির্দেশেও তিনি পিছ-পা হননি। শুধু তাই নয়, সামাজিক কূপমণ্ডূকদের তীব্র বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেও তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বার সর্ব-শ্রেণীর জন্য মুক্ত করে দিয়ে শিক্ষাকে বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার সৎসাহস দেখিয়েছিলেন।

শিক্ষাসংস্কার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর আর একটি অবদান সরকারী সহযোগিতায় দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে বহু প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন। তাছাড়া গোঁড়া-সমাজের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ছাড়াও মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের মত উচ্চ-শিক্ষার প্রথম শ্রেণীর বাঙালী প্রতিষ্ঠানও তিনিই গড়েছিলেন। বাঙালীর শিক্ষার জন্যে তাঁর স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রমের তুলনা হয় না। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সকল পর্যায়েই সেকালে ভাল পাঠ্যপুস্তকের দারুণ অভাব ছিল। মদনমোহনের 'শিশুপাঠ' প্রাথমিক শিক্ষাব্রতীর সমস্যার একটু সুরাহা করেছিল বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ের' মত শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক আজ অবধি রচিত হয়নি। এ ছাড়া বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী' ইত্যাদি বই লিখে নবীন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনেকটাই দূর করেছিলেন। অবশ্য বন্ধু অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ'ও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বিবেচিত হবে। বিদ্যাসাগর বাংলা

শিক্ষার্থীদের জন্য উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করে, বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য-নাট্য গ্রন্থাদির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের দুর্গতি অনেকটাই ঘুচিয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও শিক্ষিত মানুষের রস-চেতনা উদ্বোধনের জন্যে তিনি সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে উপকরণ নিয়ে অপূর্ব গল্প-আখ্যায়িকা সমূহ রচনা করেছিলেন, সে সব কথা প্রসঙ্গান্তরে ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এইভাবে দেশব্যাপী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে তিনি মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সবাইকে জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের করণীয় বিশেষ কিছু ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার প্রসঙ্গে গোঁড়াসমাজে কিছুটা প্রতিবাদ দেখা দিলেও তাঁদের ধর্মীয় সংস্কারে, দেশাচারে খুব বড় কোন একটা আঘাত রূপে দেখা দেয়নি এ শিক্ষাসংস্কার কার্য। তাই বড় রকমের কোন বিরোধিতাও জাগেনি। কিন্তু এ কার্য যে একটা বৃহত্তর সমাজবিপ্লব সৃষ্টিরই মৌন আয়োজন ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি শিক্ষাসংস্কার ও প্রসারের কার্যধারা অব্যাহত রেখেও তিনি সামাজিক মানুষের বিশেষত হিন্দু নারীসমাজের দুর্গতি মোচনের জন্য দুঃসাহসিক সমাজ-সংস্কার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কোন ধর্মবোধের তাগিদ থেকে নয়, নিছক মানবীয় কারুণ্যবোধ থেকেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল এদেশের নারীসমাজের চূড়ান্ত দুর্গতির দিকে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, চিরাচরিত জীর্ণ-সংস্কারের প্রাচীর-আড়ালে নির্বাসিত নারী-সমাজ শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচারের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে পশুর চেয়েও হীনদশা প্রাপ্ত হয়েছে। কৌলীন্য প্রথার চূড়ান্ত বিকৃতিজনিত অভিশাপ নারীর জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বহ ও অমানবিক। তাকে দুর্গতির মুখে ঠেলে দিয়ে সমাজেরও মঙ্গল হয়নি। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহজনিত অকালবৈধব্যের অভিশাপ সমাজে বয়ে এনেছিল ব্যভিচারের স্রোত। সমাজপতিরা শাস্ত্র ও দেশাচারের দোহাই পেড়ে চিরাচরিত নিয়মে নারীর সতীত্ব রক্ষার আবশ্যকতার কথা আউড়িয়ে

অপরিসীম ঔদাসীন্য নিয়ে এর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সমাজ-দেহ বিনির্গত ক্লেদ জমে জমে যে পঙ্কলের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সমাজের যাবতীয় নীতিধর্ম যে ডুবে যেতে বসেছিল, সমাজের যে নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছিল একথা তাঁরা ভেবে দেখবার গরজ বোধ করেননি। সামাজিক এ দুর্দিনে বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসেছিলেন সমাজ-সংস্কারের কতকগুলো কল্যাণকর বাস্তব প্রস্তাব নিয়ে। কৌলীন্যপ্রথার অভিশাপক্লিষ্ট নারীসমাজের দুর্গতি নিরসনের, তথা সামাজিক ব্যভিচারের, স্রোত বন্ধ করার সাহসিক প্রচেষ্টাস্বরূপ তিনি, 'বিধবাবিবাহ' প্রচলনের যৌক্তিকতা নির্দেশ করলেন। এ দেশে শাস্ত্রের প্রতি মানুষের মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য লক্ষ্য করে, তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে এর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন। যদিও সমস্যার মানবিক দিকটিই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল বেশী, তবু গোঁড়াসমাজের মানস-প্রকৃতি লক্ষ্য করেই তিনি শাস্ত্রের সমর্থন খুঁজেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্ম-সমাজ ও কতিপয় সংস্কৃত পণ্ডিত এবং অনুরাগী সমর্থক ছাড়া কেউ তাঁকে সমর্থন করলেন না। গোঁড়া সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তাঁর বিরুদ্ধে, কিন্তু অনমনীয় মনোবলের অধিকারী বিদ্যাসাগর 'বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন-কার্যকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম' বলে অকুতোভয়ে ঘোষণা করলেন, আরও জানালেন যে, তিনি নিতান্ত দেশাচারের দাস নন, প্রয়োজন-বোধে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজী আছেন তিনি, তাঁর এই পবিত্র ব্রতকে সফল করে তুলতে। দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করলেন তিনি দেশব্যাপী; ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের সমর্থনও পেলেন। কিন্তু দেশাচারের দুর্গে প্রতিষ্ঠিত থেকে যুগযুগান্তরে মানুষের ভয় ও ভক্তির মুদ্রা ভাঙিয়ে যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এসেছেন যে সব লুব্ধ শকুনীতুল্য কপট ধর্মধ্বজীরা, তাঁরা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগরের প্রতি। যুক্তির পথে বিদ্যাসাগরকে পরাস্ত করতে অপারগ হয়ে তাঁরা অশ্লীল গালাগলি ও নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে শাণিত যুক্তির অস্ত্রে বার বার তাঁদের ঘায়েল করেছেন। তাঁদের নিন্দাবাদের জবাবে শালীন ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ

নিক্ষেপ করেছেন। সে এক মহাকাব্য। গোটা দেশই যেন দুই অংশে বিভক্ত হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল। দেশের কবি-সাহিত্যিকরাও তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ সংগ্রামে ঈশ্বরগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যরথীরা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন, কবিয়াল দাশরথির মত অনেকে আবার বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছেন। তবু প্রতিপক্ষ কখনই যুক্তি-তর্কে পেরে ওঠেননি। সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে তাঁরা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছিলেন নানাদিক থেকে। প্রকৃতপক্ষে, এতে তাঁদের দুর্বলতাই প্রকট হয়ে উঠেছিল। আসলে, বিধবাবিবাহের প্রতিবাদীরা দেশাচার ও শাস্ত্রাচারের দোহাই পেড়ে প্রাণপণে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। দেশের বিবেক আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তো বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা ও পাণ্ডিত্যে অভিভূত বহু সংস্কৃতপণ্ডিতও শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'বিধবাবিবাহ' আইন পাস করে তৎকালীন ভারত সরকার বিদ্যাসাগরের সংস্কার-আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'বিধবা-বিবাহ' প্রচলনের ন্যায় বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিনি পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে, গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে ঐ বিষয়েও আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় সমাজসংস্কার-বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তথাপি তাঁর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা বলা সমীচীন হবে না। একথা ঠিক 'বিধবাবিবাহ' আইন পাস করেও সঙ্গে সঙ্গে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়নি। কিন্তু এও ঠিক 'বিধবাবিবাহ'-আন্দোলন নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি জানিয়ে এদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনকে অনেকটাই ত্বরান্বিত করছিল। তাছাড়া, অনেক কাল পরে তাঁর জীবন-সায়াহ্নে 'সহবাস-সম্মতি' আইন প্রণয়ন করে সরকার তাঁর বাল্য-বিবাহরোধ আন্দোলনকে যে মূল্য দিয়েছিলেন তার কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

লক্ষ্য করবার বিষয় বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলন মুখ্যত ছিল নারীমুক্তি-আন্দোলন। মানবের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নারী-সমাজকে ন্যায্য অধিকার দিয়ে, বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে নতুন দেশ গঠনের পথ প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। নারীর উন্নতি ব্যতীত সমাজের যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয় ও জাতীয় জাগরণও সুদূরপরাহত হতে বাধ্য এ সত্য বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন। তাই স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারের প্রাথমিক চেষ্টার পথ ধরেই তিনি ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে নারীসমাজের মধ্যে তিনি একদিকে আত্মচেতনা-সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছিলেন, অপরদিকে তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের সৃষ্টি করে যুগযুগান্তের প্রথাবদ্ধতার গণ্ডী থেকে মুক্ত করে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন মানুষ হিসাবে তাদের বাঁচবার পথ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা বাস্তব কারণেই সম্পূর্ণ সফল হয়নি ; কিন্তু শতাব্দীর প্রান্তে এসে আজ নারীমুক্তির স্বপ্ন যখন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, তখন কেউ যদি বলেন এ যেন বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টারই বিলম্বিত সার্থকতা, তা হলে তাঁকে অস্বীকার করা খুব সহজ হয় না। বস্তুত বিদ্যাসাগরকে একালে বাঙলা-দেশের নারী-মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বললেই যথার্থ বলা হয়। তাঁর আন্দোলন মুখ্যত এদেশের আধুনিক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছে, গৌণত হিন্দু-সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কে কিছুটা ভারসাম্য আনয়ন করে উনিশ ও বিশ শতকের হিন্দু-সমাজের বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে একথা বোধ হয় দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

যে হিউম্যানিস্ট কর্মাদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার-মূলক নানা জনহিতকর কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, সে একই আদর্শের প্রেরণায় তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন, ইতিপূর্বে একাধিক বার তা' উল্লেখ করেছি। বস্তুত সামাজিক মানুষের কল্যাণচিন্তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এদেশের হতভাগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হতে, বাংলার নিজস্ব আধুনিক সাহিত্যের জন্যে উপযুক্ত বনেদ রচনা করতে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তিনি

সমকালীন শ্রীছন্দহীন গদ্য-ভাষাকে সংহত ও সুবিন্যস্ত রূপদান করেছিলেন, তাকে সব রকম ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি বলিষ্ঠ মাধ্যমরূপে গড়ে তুলেছিলেন। বাঙালীর ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে নতুন সাহিত্য গড়ে তোলা যে একান্ত অপরিহার্য ছিল একথা তিনি যেমনটি বুঝেছিলেন, এমনটি সেকালে আর কেউ বোঝেননি। তিনি শুধু তার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি; কিভাবে তা গড়ে তোলা সম্ভব সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে কতকগুলি মৌল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার বাস্তবায়নের জন্যেও বিলক্ষণ সাধনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সাধনারই ফলশ্রুতি হল আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

আধুনিক সাহিত্যিক গদ্য ভাষার জাতকর্ম থেকে শুরু করে এতে যৌবনের শক্তি, লাবণ্য ও মাধুর্য সঞ্চারের যাবতীয় কাজই তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। নিছক সংস্কারের zeal থাকলেই যে এরূপ দুরূহ কার্য সমাধা করা সম্ভব নয়, একথা অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও বোধ হয় বুঝতে পারবেন। সংস্কারক রামমোহনের ব্যর্থতা এ সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়। প্রয়োজনের তাগিদে লেখনী চালনা করতে গিয়ে রামমোহন বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রূপটি খুঁজে বের করবার কম চেষ্টা করেননি। তিনি বড়জোর কাজ চালানোর উপযোগী একটা ভঙ্গী দাঁড় করিয়েছিলেন; কিন্তু খুব বেশীদূর এগোতে পারেননি। তাঁর পূর্বে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার স্বাভাবিক শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে বাংলাভাষার মুক্তির যথার্থ পথটির সন্ধান পেয়েছিলেন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ভাষাভঙ্গী নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কিন্তু আদর্শ রূপটি সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে না পেরে দ্বিধান্বিতভাবে বিভিন্ন ভঙ্গীর মধ্যে পদচারণা করেছেন, কখনও তা দুরূহ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুকরণে পর্যবসিত হয়েছে, কখনও বা তৎসম শব্দের সুপ্রয়োগে কিছুটা শ্রী, সৌন্দর্য-গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছে, কখনও বা তা গল্পের ভাষার মত লঘু হয়ে উঠেছে। তবু উপযুক্ত যুগচেতনার অভাব ও পরিবেশের ঠাণ্ডা বিরূপতাহেতু নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ক্রমপরিশীলিত না হওয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনা সাফল্যের

তোরণে এসেই থেমে গিয়েছিল। রামমোহন স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যুঞ্জয়ের পথে চলার গরজ বোধ করেননি। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের পূর্বে আর কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যই অর্জিত হয়নি সাহিত্যিক গদ্যভাষার বিকাশ ক্ষেত্রে। অতএব বিদ্যাসাগরপ্রকৃত পক্ষে বাংলা গদ্যের আদি শিল্পীর কাজ করেছেন। সকল সমালোচকই মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করেছেন, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যভাষা সৃষ্টির কৃতিত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য।[৬]

একব্রতীর সাধনায় অর্জিত তাঁর এই কৃতিত্বকে বর্ণনা করিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক যুদ্ধকলাকৌশলনিপুণ সেনাপতির সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন যে, সেনাবাহিনীকে সুসংহত, সুবিন্যস্ত করে সুপরিচালিত করতে পারলেই যেমন যুদ্ধজয় সম্ভব, বিদ্যাসাগর ঠিক তেমনি একজন সেনাপতির ন্যায় বাংলা গদ্যের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করে তাকে সহজ গতি ও কর্মকুশলতা দান করে মানবীয় ভাব প্রকাশের সকল বাধা জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৭] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্পর্কে আজ আর কোন দ্বিমত নেই। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি ১৮৫১-৫২ সালের দিকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা কালে আমাদের শিক্ষার সঙ্কট মোচনের জন্যে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশকে একটি অবশ্য পূরণীয় শর্ত হিসাবে ধরে নিয়ে, তিনি সরকারের কাছে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের যে খসড়া রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তা শুধু তাঁর শিক্ষাদর্শের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে না, বাংলার জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের যথার্থ পন্থাটি নির্দেশে তাঁর নির্ভুল শিল্পদৃষ্টির পরিচয়টিকেও উজ্জ্বল করে তোলে। বলা বাহুল্য এই শিল্পদৃষ্টি ছিল বলেই তিনি ভাষা-সাহিত্যের সারস্বত সাধনায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আমরা এখানে পূর্বোক্ত রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরছি ঃ

৬। Dr. S. K. DE—Bengali Literature in the Nineteenth Century Pp. 627—628 [Second Edition]

৭। রবীন্দ্রনাথ—চরিত্র পূজা, বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১। বাংলাদেশে শিক্ষাকার্য তদারকের দায়িত্ব যাদের উপর বর্তেছে তাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত পরিপূর্ণ আধুনিক জ্ঞানালোক-সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যারা ইউরোপীয় উৎস থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে তাকে চমৎকার প্রকাশক্ষম বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অপারগ তাদের পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

৩। সংস্কৃতে ভাল জ্ঞান না থাক্‌লে কখনই চমৎকার প্রকাশক্ষম বাক্‌রীতিগত বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ বাংলা রচনাশৈলী আয়ত্তে আসতে পারে না। আর ঐ কারণেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

৪। অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করছে যে কেবল ইংরেজী বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিরা সুন্দর ইডিয়ম সমৃদ্ধ বাংলায় নিজেদের ভাব প্রকাশে নিতান্তই অক্ষম। তারা ইংরেজিয়ানার প্রভাবে এতই আবিষ্ট যে বর্তমান অবস্থায় তাদের পক্ষে, সংস্কৃত বিদ্যার গৌণ-চর্চাজনিত প্রলেপ সত্ত্বেও, সমস্ত ভাবনাকে ইডিয়মসমৃদ্ধ, সুন্দর বাংলায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

৫। তাই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজী সাহিত্যে সুশিক্ষিত করে তোলা যায়, তা হলে তারাই সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও সার্থক অবদান যোগাতে সমর্থ হবে।[৮]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসধারার সংযোগ ঘটিয়ে নব্য বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাতে বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবনের ক্ষমতাই শুধু স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, নব নির্মাণক্ষম তাঁর শিল্পীমনের পরিচয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত ইংরেজী ও সংস্কৃত বিদ্যার যৌথ পরিশীলনের মাধ্যমেই তিনি বাংলা

৮। বিনয় ঘোষ প্রণীত বিদ্যাসাগর ও বাঙলা সমাজ (৩য় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত NOTES ON THE SANSCRIT COLLEGE' দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৪৩৪—৩৯)

ভাষার মুক্তিপথের সন্ধান করেছিলেন, এবং কার্যত সেই পথে অগ্রসর হয়ে নব্য বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতেরও সূচনা করেছিলেন। এসব কথা মনে রাখলে, পাঠ্য পুস্তক রচয়িতা, অনুবাদক ও সামাজিক সংস্কার কর্মব্যপদেশে মসিযুদ্ধে লিপ্ত বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তা সম্পর্কে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকার কথা নয়। যখন দেখি ভাষাকে অবলীলাক্রমে বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরিচালিত করেও তিনি শিশুমনের 'জল পড়া পাতা নড়া'র অপূর্ব হৃৎস্পন্দন আবিষ্কার করতে সমর্থ, যখন দেখি বিরোধীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত তাঁর লেখনীমুখে মানবিক আবেগ ও কারুণ্য নিঃসৃত হচ্ছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনুষ্যত্বহীনতায় ব্যথিত হয়ে ব্যঙ্গকৌতুকে ফেটে পড়ছেন—শুধু হৃদয়জ্বালা প্রশমন করতে, তখন বুঝি এ মন সাধারণ মন নয়, এ মন শিল্পীর মন। আবার যখন দেখি হিন্দীর ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত উপকরণকে রসবুভুক্ষু মানুষের গল্পরস-পিপাসা মিটানোর কাজে লাগাতে পারার আনন্দে তাঁর ভাষা প্রাথমিক জড়তাসত্ত্বেও নবমুক্তির আবেগে অধীর হয়ে উঠেছে, যখন দেখি 'শকুন্তলার' জীবননাট্যে সাংসারিক প্রেমের অনিত্যতার জ্বালার মধ্যেও স্বর্গের হাতছানি লক্ষ্য করে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যান, ভাষার মধ্যে যখন আবেগাতিশয্যে দ্রবীভূত হৃদয়ের ওঠানামা অনুভব করা যায়, তখন তাকে কি আর নিছক অনুবাদক বলে মনে করা যায়? শিল্পী-হৃদয়নিষিক্ত ভাষার গুণে তা মৌলিক সৃষ্টির অসামান্য মহিমা লাভ করেছে। 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাসে'ও এই ক্রীড়াশীল শিল্পীমনের স্পষ্ট সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখি, বিষয়প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখেই সীতার বনবাসের ভাষা যেন জলভারনম্র মেঘের মত গম্ভীর, বর্ষণোন্মত তার বুকে স্ফুরিত হচ্ছে বিদ্যুতের জ্বালা: আবার সেই ভাষাই বিষয়ের লঘুতাগুণে 'ভ্রান্তিবিলাসে' অনেকটাই কৌতুকরসে উচ্ছ্বসিত। 'ভ্রান্তিবিলাসে'র ভাষায় বিষয়ানুসারে আরও কিছুটা লঘুতার প্রয়োজন হয়তো ছিল, কিন্তু তাই বলে বিদ্যাসাগরের শিল্পীমনের ক্রীড়াচঞ্চল রূপটি সেখানে অনুপস্থিত, এমন কথা অরসিক ছাড়া কেউ বলবেন না। মোটকথা স্রষ্টার ব্যক্তিচারিত্র্যের সঞ্চরণ ঘটিয়ে বিষয়ের

নবনির্মাণ যদি শিল্প হয়, তাহলে বিদ্যাসাগরের এসব গ্রন্থই যে শিল্প-কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে বাংলা গদ্যভাষার নবনির্মাণে এবং 'ভাবের বাহনরূপে রস-সৃষ্টিতে তার সার্থক ব্যবহারে'। ভাল গদ্যের যা কিছু অর্থব্যক্তি, প্রসাদগুণ, ওজস্বিতা, গাঢ়বন্ধতা, কোমলতা, উদারতা, মাধুর্য, শ্লিষ্টতা, গতিশীলতা, সৌষম্য ইত্যাদি অধিকাংশ গুণই বিদ্যাসাগরের রচনায় দৃষ্ট হয়। শুধু 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাসের' মত গ্রন্থে নয়, সামাজিক সমস্যা প্রতিপাদন-মূলক গদ্য রচনায়, বিশেষত 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ক পুস্তকের আখ্যায় তা সহজলভ্য। প্রায় সর্বত্রই তিনি রচনায় প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তার গতির মধ্যে 'অনতিলক্ষ্য ছন্দ-স্রোত' রক্ষা করে এবং যথাসম্ভব 'সরল ও সুশিষ্ট শব্দ নির্বাচন করে, ভাষাকে যতদূর সম্ভব গাঢ়বদ্ধ, গম্ভীর ও গতিশীল' করার চেষ্টা পেয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়ই বলতে হয় 'কোন পণ্ডিত বা বৈয়াকরণের পক্ষে এই রচনা কলা-নৈপুণ্য দেখানো সম্ভব নয়, যথার্থ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব'।[৯] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও অনুবাদকরূপে চিহ্নিত করে, 'মৌলিক রচনার স্রষ্টা নন' (যদিও তাঁর এ অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয়) বলে বড় শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি জানাতে অসম্মত হয়েছিলেন অনেকটা বিভ্রান্তিবশে। কিন্তু ভাষার শিল্পকর্মও যে বিষয়ের শিল্পকর্মের মত একটা বিশিষ্ট জিনিস, সে কথা বঙ্কিমের চেয়ে আর বেশী কে জানতেন? ভাষার 'শিল্পগুণের কথা যাঁরাই বুঝেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, প্রত্যেক ভাষারই দুটি প্রকাশের দিক আছে—'একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে—আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রস-সৃষ্টিতে।' বিদ্যাসাগরের রচনায় এই দুটি দিকেরই শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আসলে তিনি বাংলা ভাষার 'প্রকৃতিগত অভিরুচিটিকে' বুঝতে পেরেছিলেন, তাই শিল্পীজনোচিত বেদনাপথ' ধরেই

৯। বিনয় ঘোষ 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৩২৮—২৯।

তাঁর ভাষার শিল্পকর্ম অগ্রসর হয়েছিল। যথার্থ শিল্পীর ন্যায়ই বাংলা ভাষার নবমূর্তি নির্মাণের সময় এর নিজস্ব মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তিনি কোন বহিরাগত উপাদানকে মূল্য দেননি। শব্দচয়নে শিল্পবোধের সুষ্ঠু সমর্থন ছিল বলেই দেখতে পাই 'তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলি বাংলা ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনটিই অপ্রচলিত হয়ে যায়নি—তাঁর দান বাংলা ভাষার প্রাণপদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে। কিছুই ব্যর্থ হয়নি'।[১০] বাংলা গদ্যের অধুনাবিবর্তিত রূপের মধ্যে তাই আজও সাগরী গদ্যের সুবাস অনুভব করা যায়।

এর পরও কথা থেকে যায়। ক্লাসিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে তিনি 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে যে দুটি নারীপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন, তা কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতির ছায়ামাত্র নয়—একথা রসিক পাঠকগণ স্বীকার করবেন। শিল্পীচিত্তের আবেগ ও অনুভূতির স্পন্দন নারী-প্রতিমার মধ্যে এতই স্পষ্ট যে তাদের কোনক্রমেই মূলের নিছক প্রতিরূপ বলে আখ্যায়িত করা চলে না। বস্তুত বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'সীতা' তাঁর চোখের সামনের চিরদুঃখিনী, অবমানিতা বঙ্গনারীরই যেন ভাব-প্রতিমা। 'ভ্রান্তিবিলাসে' তিনি শেক্সপীয়ারের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের রসানুভূতি-জনিত আনন্দকেই তো ব্যক্ত করেছেন। এমনকি 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ক পুস্তকেও দেখি, মানবতার একাংশের দুঃখ-বেদনা-দর্শনে উন্মথিত সংবেদনশীল শিল্পীচিত্তের আবেগ-অনুভূতি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। তারপর 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' নামক শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ অপূর্ব গদ্যকাব্যে, স্বরচিত অসমাপ্ত জীবনীতে অকপট সত্যভাষণের ও আত্মদর্শনের দুর্লভ বোধির প্রকাশে ও বেনামীতে রচিত ব্যঙ্গরচনাতে পরিহাস-রসিকতার মধ্যে দিয়ে হৃদয়দ্বার অবারিত করে দিয়েও তিনি রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি কখনই প্রায় এক ভাববৃত্তে অবস্থান করেননি। জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষা যেমন ক্রমশ বেশী

১০। বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরে প্রবেশ উৎসব। রবীন্দ্রনাথের বাণী। মেদিনীপুর, ১৩৪৬।

গতিশীল হয়ে উঠেছে, তাঁর বিষয় পরিক্রমার ক্ষেত্রও নিয়ত প্রসারিত হয়েছে। তবে এটা ঠিক, সামাজিক মানুষের বেদনার ক্ষতস্থল খুঁজে বের করে তার ব্যথা-বেদনা উপশমের বাস্তবপন্থা অন্বেষায়ই কেটে গিয়েছে যাঁর গোটা জীবন, তাঁর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সাধনার অবকাশ খুব বেশী ছিল না। তাঁর জীবনের ন্যায় তাঁর সাহিত্য-প্রয়াসের একটা বড় অংশ এই সামাজিক দায় মেটাতেই উৎসর্গিত হয়েছে। স্বভাবতই তাঁর শিল্পপ্রতিভা ব্যাপকতর স্ফূর্তির পথ ধরে মৌলিক সৃষ্টির নিরঙ্কুশ কল্পনার জগতে প্রসারিত হয়নি। কিন্তু এও সত্য যে মৌলিক সৃষ্টিকল্পনার রামধনুচ্ছটা তাঁর সীমাবদ্ধ সাহিত্যকর্মের মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর নিজে তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বড় কোন দাবি রেখে যাননি। তিনি 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রচেষ্টাকেই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলে' ঘোষণা করে, আপন 'সমাজ-সংস্কারক' পরিচয়টিকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষা সংস্কার ও অন্যবিধ সংস্কার-মূলক কাজের ব্যাপকতা তাঁর ঐ পরিচয়টিকে নিঃসন্দেহে সত্যতর করে তুলেছে। নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা, সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে রচিত বাদ-প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গমূলক রচনার পিছনেও কাজ করেছে এই সংস্কারক মন। আবার ঐ সংস্কারক মনই জাতীয় মানসের যথাযথ বিকাশের প্রয়োজনে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাংলা গদ্যভাষার নব-নির্মাণে ও নতুন বাংলা সাহিত্যের ভিত্ রচনায় ব্রতী হতে। কিন্তু গদ্যভাষা নির্মাণ ও ভাবের বাহনরূপে তার সাহায্যে রসসৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁর সংস্কারক সত্তার অবচেতনে ক্রিয়াশীল শিল্পীসত্তা জেগে উঠেছিল বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। সংস্কারের প্রয়োজনের গণ্ডী ছেড়ে স্বভাবের তাগিদেই তো বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রেও মুক্তি খুঁজে ফিরেছিল। আর তারই ফলশ্রুতিরূপে আমরা পেয়েছি হীরকোজ্জ্বল সাহিত্যিক গদ্য-ভাষা ও তারই ছটায় প্রোজ্জ্বল ভাব ও রসের একটি ক্ষেত্র। সংস্কারক বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এ আমাদের উপরি পাওনা। জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার শিকার এ দেশের ক্ষীণপ্রাণ মানুষগুলোকে তিনি সংস্কারতিক্ত বটিকা সেবন করিয়ে শুধু নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেই ক্ষান্ত হননি;

ভাবলোক থেকে আহরিত অমৃতরস সিঞ্চন করে, তাদের বন্ধ্যা হৃদয়ভূমিতে ভাবের কুসুম ফুটিয়ে তিনি তাদের পক্ষে জীবনের বঞ্চনা বেদনার জ্বালাকে অনেকটাই সহনীয় করে তুলেছিলেন। হিউম্যানিস্ট জীবনাদর্শের পূজারীর কাছে এর চেয়ে কাঙ্ক্ষনীয় কর্ম আর কি হতে পারে।

সাহিত্য-সমালোচক বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বিদ্যাসাগর যে একজন স্থিতধী রসজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচকও ছিলেন, এ খবর আজকের অনেক সাহিত্য-পাঠকই হয়তো রাখেন না। অথচ সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অপিচ, রসগ্রাহী সমালোচনার অবতারণা করে তিনি যে সেকালের সুধীসমাজের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। সত্য বটে, মাত্র একবারের জন্যই তিনি সমালোচক হিসাবে লেখনী ধারণ করেছিলেন; তারপর ঐ বিষয়ে আর কোন উদ্যম প্রকাশ করেননি। কিন্তু ঐ প্রথম ও একতম উদ্যমেই তিনি সাহিত্য-সমালোচনা-কর্মে যে বিরল মনীষা ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তাঁর সমালোচক-প্রতিভার ঋদ্ধির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে নানা সংস্কারমূলক কর্মের প্রতীপস্রোতে তিনি এ ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছিলেন বলেই যে তাঁর এই প্রাথমিক সাহিত্য-সমালোচনা প্রয়াস মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, এমন কথা চিন্তা করা মোটেই বিজ্ঞোচিত হবে না। বরং ভবিষ্যৎ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অন্যতম দিক-নির্দেশক হিসেবে এ প্রয়াস যে বিশেষ মূল্যবান ছিল তা সকল ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতবোধসম্পন্ন পাঠকই স্বীকার করবেন। বিদ্যাসাগরের অব্যবহিত পূর্বে ইংরেজিতে হরচন্দ্র ঘোষ এবং বাংলায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতা বিষয়ে বিতর্কমূলক সমালোচনার সূচনা করলেও, বিদ্যাসাগরই যে বাংলায় প্রথম নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ-ভিত্তিক ও উন্নত রসরুচির সমর্থনপুষ্ট সাহিত্যসমালোচনা-কর্মের প্রবর্তন করেন, একথা

আজ অসংশয়েই বলা চলে। তাঁর 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ সমালোচনা-কর্মের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের সামনেই উপস্থিত রয়েছে। কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করলেই এবিষয়ে নিজের সকল জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পেতে পারেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। স্বভাবতই সমালোচনা-কর্মের জন্যে ক্ষেত্র হিসাবে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকেই নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় সমালোচনাকালে তিনি 'অলঙ্কারশাস্ত্রীদের পুচ্ছাগ্রভাগ ধারণ করে পূর্বসুরীদের খনিত পথে যাত্রা করার প্রয়োজন বোধ করেননি।' সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও তিনি এদেশের 'রক্ষণশীল ও অযৌক্তিক পুরাতন পাণ্ডিত্যের' চেয়ে পাশ্চাত্য দেশের অপেক্ষাকৃত উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোভঙ্গীর প্রতিই অনুরক্তি দেখিয়েছেন বেশী। সাহিত্য-বিচারকালে তাই দেখি, তিনি মাঝে মাঝেই এদেশী সাহিত্যশাস্ত্রীদের পুরাতনের প্রতি অন্ধ মোহ ও বিচারজ্ঞানবিমূঢ়তাকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই আপন স্বাধীন বিচারশক্তি প্রয়োগ করেছেন। তবে একথা প্রথমাবধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের লেখক ও তাঁদের সাহিত্যকৃতির পরিচয়-সম্বলিত রচনার প্রেরণা বিদ্যাসাগর লাভ করেছিলেন উইলিয়ম জোন্স্, ম্যাকসমূলর, উইলসন প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পাশ্চাত্য মনীষীদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার দৃষ্টান্ত থেকে। আর ঐ জন্যই বোধ হয় বিদ্যাসাগরের সমালোচনা-কর্ম পণ্ডিতী টীকার নীরসতায় পর্যবসিত হয়নি। অবশ্য আমাদের এই বক্তব্য থেকে কারও যদি এই ধারণা হয় যে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নতুন এক সমালোচনা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই যথার্থ হবে না। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য সব সময় রক্ষা করার গরজ বোধ করেননি বটে; তাই বলে তা সর্বথা ত্যাজ্য এমন কথা বলার মত মূঢ়তাও তিনি প্রদর্শন করেননি। অলঙ্কারশাস্ত্রীদের প্রণীত অনেক সূত্রই তিনি সাহিত্য-বিচারে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু ঐ সকলের প্রযুক্তি-ব্যাপারে প্রায়শ স্বাধীনতা নিয়েছেন। পুরাতন সংস্কৃত পণ্ডিতদের বহু বিচার-

বিভ্রান্তির তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উন্নততর রসবোধের প্রশংসা করেছেন। মোট কথা বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য সমালোচনার তীক্ষ্ণধার যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে আলঙ্কারিক সমালোচনা-পদ্ধতির সংস্কারের দাবি নিয়েই যেন উপস্থিত হয়েছেন তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক ক্ষুদ্র কলেবর আলোচনাগ্রন্থে। 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থটি ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তৎকালীন কলকাতার বিদ্বজ্জনসভা 'বীটন সোসাইটি'তে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতারই পরিবর্ধিত রূপ। সভায় আলোচনার জন্যে নিরূপিত স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সুষ্ঠু পরিক্রমা সম্ভব ছিল না বলেই, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান কাব্য, নাটক ও উপাখ্যানগুলোর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এতে তাই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের যেমন স্বীকৃতি নেই, তেমনি নেই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-সমালোচনার উদ্যম। তবু গ্রন্থটি পাঠ করলে রসিক পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে সুপণ্ডিত সমালোচক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্যের একটি ঐতিহাসিক তথ্য ও বিচার-বিশ্লেষণ-ভিত্তিক রেখাচিত্র এতে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। 'বীটন সোসাইটি'তে প্রবন্ধাকারে পঠিত এ গ্রন্থের বক্তব্যের মান যে সবিশেষ উন্নত ছিল এবং তা যে উপস্থিত বিদগ্ধ শ্রোতাদের রসচেতনাকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে ঐ সালেরই ১২ই মার্চের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি ছোট খবর থেকে। 'প্রভাকর' লিখেছিলেন—

> বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বস্তুত 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'-রূপে চিহ্নিত বিদ্যাসাগরের এই সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনাটি নানা কারণে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। প্রথমত, বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে এলেও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কনের এটিই প্রথম প্রচেষ্টা: দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহ সম্পর্কে বাঙালী সংস্কৃত-সেবী পণ্ডিতের প্রথম স্বাধীন অভিমত ও সিদ্ধান্ত-সম্বলিত রচনাও এটি। তৃতীয়ত, অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ হলেও এটিই সংস্কৃত সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থের মর্যাদার অধিকারী। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসাবেও এটি একটি আদর্শস্থানীয় রচনা বলে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' বিদ্যাসাগরের সমালোচক-প্রতিভার কতটা সার্থক পরিচয় বহন করে, তা সম্যকরূপে জানতে ও বুঝতে হলে গ্রন্থটির আভ্যন্তর পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার কাজ অত্যাবশ্যক বলেই বিবেচিত হবে। এই কথা স্মরণ রেখেই আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি। গ্রন্থের নামের সাথে সঙ্গতি রেখেই বিদ্যাসাগর প্রথমে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আপন বক্তব্য প্রকাশ করে, পরে সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র নিয়ে কিছুটা বিস্তৃততর আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাংশে তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রকাশক্ষমতা, এর আন্তর-ঐশ্বর্য, এতে ব্যবহৃত শব্দঘটিত কৌশল এবং এর বিকাশে বৈয়াকরণদের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে শব্দঘটিত কৌশলের দৃষ্টান্ত যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সরল মধুর রচনার অংশ-বিশেষও উদ্ধৃত করেছেন। অতঃপর সংস্কৃত যে কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত ভাষা নয়, এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি এর উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে দেশীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে তিনি

মোটামুটি ম্যাক্সমুলর প্রচারিত 'সংস্কৃত সকল ভাষার জননী তুল্য' এই মতবাদকেই সমর্থন জানিয়েছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং বৃহত্তর অংশে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কৃত রচনার শ্রেণীবিচার করেছেন ও পরে সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহযোগে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ রচনা ও রচয়িতা সম্পর্কে আপনার বিচারনির্ভর মতামত প্রকাশ করেছেন। পরিশিষ্টে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন এবং আমাদের দেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখে আক্ষেপ করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে বিদ্যাসাগর এই ক্ষুদ্রকলেবর গ্রন্থে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেননি, বা করা উচিত বলেও বিবেচনা করেননি। তিনি পৌরাণিক বা ক্লাসিক যুগ থেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দের রচনাকাল পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান সম্পদের কথাই আলোচনা করেছেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। পৌরাণিক বা ক্লাসিক যুগের কাব্য-নাট্য-উপাখ্যানাদির সংক্ষিপ্ত পরিক্রমার মধ্যেই তিনি তাঁর আলোচনাকে সীমায়িত রেখেছেন।

আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্যে গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অংশই প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে। এই অংশে বিদ্যাসাগর সমালোচক ও, কতকটা, ঐতিহাসিকের যুগ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সাহিত্যের রূপ ও বিষয় বিশ্লেষণে তাঁর ভূমিকা অনেকটাই সমালোচকের, লেখকের যথাযথ পরিচয় ও আবির্ভাবকাল নিরূপণ প্রয়াসে তাঁর ভূমিকা অনেকটাই ঐতিহাসিকের। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকের ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্য-বিচারে তিনি অগ্রসর হয়েছেন অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত পথ ধরেই, যদিচ পরে প্রয়োজন মত যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী সাহিত্যকে 'কাব্য' পদবাচ্য রূপে গ্রহণ করে তাকে তিনি 'শ্রব্য' ও 'দৃশ্য' এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। শ্রব্যকাব্যের গদ্য, পদ্য ও গদ্য-পদ্যময় রূপের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। পদ্যময় কাব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি 'মহাকাব্য', 'খণ্ডকাব্য'

ও 'কোষকাব্য'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। গদ্যময় কাব্য হিসাবে কথা ও আখ্যায়িকা-জাতীয় রচনার কথা এবং গদ্য-পদ্যময় কাব্যরূপে চম্পু-জাতীয় রচনার কথা বলেছেন। পরে ভিন্নতর প্রসঙ্গে নীতি-উপদেশ-সম্বলিত উপাখ্যান-জাতীয় রচনাকে কাব্যরূপে চিহ্নিত করার অযৌক্তিকতা নির্দেশ করে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রের ত্রুটি ও অপূর্ণতার দিকটি অবশ্য তুলে ধরেছেন। 'দৃশ্যকাব্য' পর্যায়ের সাহিত্য বলতে তিনি, আমাদের মতই, সর্বত্র নাটককেই বুঝেছেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের শ্রেণী নির্দেশ করার পর বিদ্যাসাগর মহাকাব্যাদি-ক্রমে প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার সংজ্ঞা নির্দেশ করে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তাঁদেব রচনার মূল্যমান নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রতিটি শ্রেষ্ঠ রচনার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নির্দেশ করে, তাঁর সাহিত্যিক গুণ নির্দেশ করা ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে তুলনামূলক দৃষ্টান্তের অবতারণা করে আলোচনাকে সরস ও সারগর্ভ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। নিরপেক্ষ মন নিয়ে প্রতিটি গ্রন্থের গুণ যেমন নির্দেশ করেছেন, তেমনি নির্মমভাবে উল্লেখ করেছেন তার ত্রুটির কথা। মতামত প্রকাশে তিনি প্রায়শই অনন্যনির্ভর, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বসূরীর মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেও তিনি অকুণ্ঠিত। তাঁর আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কিত দেশী বিদেশী যাবতীয় সমালোচনার সাথে তিনি কম-বেশী পরিচিত ছিলেন, তবে কারও প্রতিই তিনি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেননি।

এবার দেখা যাক বিদ্যাসাগর কি ভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যকর্মের সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমেই তিনি মহাকাব্য-জাতীয় রচনাগুলোর কথা বলেছেন। অলঙ্কাব-শাস্ত্রোক্ত মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করে তিনি যথাক্রমে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব', ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়', মাঘের 'শিশুপালবধ', শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত', ভট্টনামক কবির 'ভট্টি কাব্য', কবিরাজ পণ্ডিতের 'রাঘবপাণ্ডবীয়' এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের কথা আলোচনা করেছেন। প্রতিটি আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু লক্ষ্যভেদী। 'রঘুবংশ' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাস-প্রণীত

রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ'। বিদ্যাসাগরের মতে কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক-রচয়িতা'। যে গুণে কালিদাসের এইরূপ উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্য তা হচ্ছে তাঁর 'আলৌকিক কবিত্বশক্তি, বর্ণনা-নৈপুণ্য, অত্যুক্তিবিহীনতা, আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারমণ্ডিত কাব্য রচনার ক্ষমতা'। বিদ্যাসাগর একথাও উল্লেখ করেছেন, সংস্কৃত ভাষায় রঘুবংশে প্রদত্ত বর্ণনার ন্যায় 'এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত হৃদয়গ্রাহিনী বর্ণনা' আর দেখতে পাওয়া যায় না। উপমা-ব্যবহারের যাদু স্মষ্টির অপরূপ ক্ষমতাও যে কালিদাসের কাব্যের অন্যতম আকর্ষণের কারণ, তাও উল্লেখ করতে তিনি বিস্মৃত হননি। অতঃপর 'রঘুবংশ' কাব্যের সংক্ষিপ্ত বিষয় বিশ্লেষণান্তে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য ''রঘুবংশ''কে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিচারজ্ঞানবিমূঢ় পণ্ডিতদের প্রতি প্রযুক্ত যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ উক্তিটিতে নিহিত আছে তা বিদ্যাসাগরের স্বাধীন মত প্রকাশের সাহসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। 'কুমারসম্ভব' অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য বলে বিবেচিত হলেও এর কাহিনীর অসম্পূর্ণতার কথা এবং এতে পার্বতী ও হরের প্রেমলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে অশ্লীলতা দোষ দেখা দিয়েছে তা উল্লেখ করতেও সমালোচক বিদ্যাসাগর পশ্চাৎপদ হননি। প্রসঙ্গত তিনি 'কুমারসম্ভব' ও 'শিবপুরাণের' কাহিনীর সাদৃশ্যের কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি 'যোগবাশিষ্ঠ' ও 'কুমারসম্ভবের' শ্লোকের ঐক্য দেখে দুইয়ের সম্ভাব্য সম্পর্কেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'—এর পরেই বিদ্যাসাগরের মতে ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের স্থান 'উৎকর্ষ ও প্রাথম্য' অনুসারেই বটে। ভারবির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি উভয়ের ভাষা ও রচনাপ্রণালীর তুলনা করে বলেছেন, 'ভারবির রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয় 'কিরাতার্জুনীয়'-কর্তা ভারবি কালিদাসের উত্তরকালে এবং

মাঘ শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহু পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।' কবির কাল নির্ণয়ের এ-পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক। অতঃপর বিদ্যাসাগর 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লেখ করে ভারবির কবিপ্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'কবিত্বশক্তিতে ভারবি কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন…কিন্তু তিনি একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।' ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের পরে পরেই সন্নিবেশিত হয়েছে মাঘের 'শিশুপালবধ' কাব্যের সমালোচনা। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার আদি দৃষ্টান্ত হিসাবে এই আলোচনাটির উল্লেখ করা চলে। বিদ্যাসাগর ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' গ্রন্থের সঙ্গে 'শিশুপালবধ' কাব্যের বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে 'শিশুপালবধ' 'কিরাতার্জুনীয়'র প্রতিরূপ কাব্য, তাকে আদর্শ করেই রচিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থের কাহিনী-পরিকল্পনা, ঘটনাবিন্যাস এবং ভাষালঙ্কার-ব্যবহারে সৌসাদৃশ্য এতই স্পষ্ট যে সমালোচকের সিদ্ধান্তকে মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না। বিদ্যাসাগর মাঘের কবিত্বশক্তিকে তাই বলে খুব ন্যূন হিসেবে নির্দেশ করেননি। তিনি তাঁর কবিত্বশক্তি ও অদ্ভুত বর্ণনাশক্তির প্রশংসা করেও বলেছেন যে তা যথেষ্ট 'পরিপক্ব' নয়। বিশেষত কালিদাস ও ভারবির তুলনায় তাঁর রচনাকে নিকৃষ্ট বলতেই হয়। মাঘের সবচাইতে বড় ত্রুটি বহুবিস্তৃত বর্ণনা সন্নিবেশের লোভ। এই জন্যে তাঁর কাব্যের কলেবর অনাবশ্যক রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিদ্যাসাগর মনে করেন। তাঁর বিবেচনায় মাঘের কাব্যের বিংশতি সর্গের মধ্যে নয়টি সর্গই অপ্রাসঙ্গিক। এত ত্রুটিতে পূর্ণ হলেও অনেক সংস্কৃত পণ্ডিতের বিবেচনায় মাঘের 'শিশুপালবধ'ই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলে গণ্য হয়েছে। বিদ্যাসাগর ঐ সকল বিচারবিমূঢ় পণ্ডিতের প্রতি বিরক্তি গোপন রাখতে পারেননি। কিছুটা তীব্র ভাষায়ই তাঁদের মূঢ়তার নিন্দা করেছেন।

'শিশুপালবধ' কাব্যের পরেই শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' কাব্যের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। 'অত্যুক্তিতে পূর্ণ,' 'মাধুর্যবর্জিত' 'লালিত্যহীন', 'সারল্যশূন্য' ও 'অপরিপক্ব' এ কাব্য সম্পর্কে তিনি প্রারম্ভেই অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন। উৎকট উপমা ব্যবহার ও অনুপ্রাস-বাহুল্যে পীড়িত এ কাব্য সম্পর্কে নৈয়ায়িক

পণ্ডিতদের বিচারভ্রান্তি ঘটলেও বিদ্যাসাগর প্রায় অভ্রান্ত বিচারশক্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। তবে 'নৈষধচরিত' একেবারে গুণবিবর্জিত এমন কথা বিদ্যাসাগর বলেননি। তাঁর মতে "নৈষধচরিতে' এমন উৎকৃষ্ট অংশ আছে যাহাতে খুশী হওয়া যায়, আবার অন্য অংশ দেখিলে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়।' নলরাজার চরিত্র ও কাহিনী অবলম্বনে রচিত বৃহদাকার এই কাব্য রচনাগুণে যে বিশেষ উচ্চমানের নয়, একথা বিদ্যাসাগর অকপটেই বলেছেন। পণ্ডিতী বিচারজ্ঞান-বিমূঢ়তার উপর এখানেও তিনি অনেকটাই যেন খড়গহস্ত। সমালোচনা-কর্মে তাঁর ন্যায়দর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পরবর্তী ভট্টিকাব্য-সম্পর্কিত আলোচনায়ও পরিস্ফুট দেখতে পাচ্ছি। ভট্টিকাব্য-রচয়িতার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি টীকাকার জয়মঙ্গল ও ভরত মল্লিকের বিরোধী মতবাদের উল্লেখ করে গ্রন্থশেষের কবির আত্মপরিচয়মূলক বক্তব্যের আলোকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে ভট্টিকাব্য-প্রণেতা টীকাকার জয়মঙ্গল-কথিত ভট্টনামক কবিই বটেন, ভারত মল্লিক প্রোক্ত ভর্তৃহরি নন। 'ভট্টিকাব্য' সম্পর্কে তাঁর সুস্থির সিদ্ধান্ত এই যে 'ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। কারণ, ব্যাকরণের উদাহরণ-প্রদর্শন গ্রন্থকর্তার উদ্দেশ্য ছিল, কাব্যশক্তি প্রদর্শন নয়। তবে ভট্টির কাব্যশক্তির প্রতি তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শরদ্বর্ণনা কবিত্বগুণে যে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, একথা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি।

মহাকাব্য পর্যায়ে সর্বশেষ আলোচিত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে কবিরাজ পণ্ডিত বিরচিত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' এবং জয়দেব-বিরচিত 'গীতগোবিন্দ'। প্রথমোক্ত গ্রন্থ-সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেছেন, এটি এক নতুন প্রণালীর মহাকাব্য। দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকসমৃদ্ধ এই কাব্য-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এইরূপ এক শ্লোকে অর্থদ্বয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্তবর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।' বিরল-প্রচারিত এই কাব্যে শব্দের অর্থগত কলাকৌশল প্রয়োগে কবির যত দক্ষতাই প্রকাশ পাক না কেন, কবিত্বশক্তি কিন্তু আশানুরূপ প্রকাশ হয়নি। কাব্যের লেখক 'কবিরাজ

পণ্ডিত' লেখকের নাম নয়, উপাধি মাত্র, তা বিদ্যাসাগর স্পষ্ট করেই বলেছেন। জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের উৎসাহে লিখিত সংবাদের ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন তুলেছেন মধ্যদেশ থেকে সোমপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত এই কামদেব ও আদিশূর কি একই ব্যক্তি? বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের মীমাংসা তখনও হয়নি, আজও হয়নি। জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এর আলোচনার মধ্য দিয়েই মহাকাব্য জাতীয় রচনার পরিচয় উদ্‌ঘাটন কাজের সমাপ্তি টেনেছেন বিদ্যাসাগর। রাধাকৃষ্ণলীলাশ্রয়ী ভক্তিরসসম্পৃক্ত এই কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে কিংবদন্তীর উল্লেখ করে তিনি আলোচনাটিকে অনেকটা সরসতা দান করেছেন। গ্রন্থটির যাবতীয় গুণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত এরূপ ললিতপদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।' তিনি আরও বলেছেন, 'গীতগোবিন্দের রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদরূপ মনোহারিণী'। 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতাকে তিনি বাংলাদেশের তাবৎ সংস্কৃত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। তবে সত্যের অনুরোধেই তিনি একথাটিও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে জয়দেব কবি হিসেবে কালিদাস, ভবভূতি ইত্যাদি অপেক্ষা ন্যূন বটেন। লক্ষ্য করার বিষয়, আধুনিক সমালোচকের মত তিনি জয়দেবের কাব্যের অশ্লীলতার কথা একবারও উল্লেখ করেননি। অথচ তিনিই না 'কুমারসম্ভবে'র আলোচনা প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র অশ্লীলতা সম্পর্কে বার বার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন? আসলে জয়দেবকে তিনি একজন ভক্ত-বৈষ্ণবকবি রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে 'জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে পরম দেবতা রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।' জয়দেবের ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের প্রকাশ 'গীতগোবিন্দ' ভক্তিরসনিষেকে পূত হয়ে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল, তাই রাধাকৃষ্ণের লীলায় দেহরাগের আত্যন্তিক প্রকাশও তাঁর মনে কোন ক্ষোভ সঞ্চার করেনি। বিদ্যাসাগরের মত যুক্তিবাদী সমালোচকের

পক্ষেও এটা কি করে সম্ভব হল, তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। তা হলে কি বাংলার জলমাটি থেকে নিঃসৃত ভক্তিরস তাঁকেও কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল? হয়তো তাই, হয়তো নয়।

মহাকাব্য প্রসঙ্গের পরেই খণ্ডকব্যের করা আলোচনা কথা হয়েছে। প্রথমে খণ্ডকাব্যের সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর যথাক্রমে কালিদাসের 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার' ও 'নলোদয়' কাব্যত্রয় এবং ময়ূরভট্টের 'সূর্যশতক' কাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। 'মেঘদূত' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য 'সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্ব্বোৎকৃষ্ট' আজও বিনা প্রতিবাদেই গৃহীত হচ্ছে। মেঘদূতের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই যেন তিনি বলেছেন, 'মেঘদূত ক্ষুদ্র কাব্য বটে। কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের আলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।' 'মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষীর বিরহ গাথার সংক্ষিপ্ত বর্ণনান্তে বিদ্যাসাগর যে মন্তব্য করেছেন তাতে এই বক্তব্যই আরও পরিস্কার রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং মেঘদূত কাব্যের চমৎকারিত্ব কোথায় তা পরিস্ফুট হয়েছে। মন্তব্যটি এইরূপ—'কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষ-পত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত।' এতৎসত্ত্বেও 'মেঘদূত' পাঠকমহলে আশানুরূপ সমাদর পায়নি তার কারণ, বিদ্যাসাগরের মতে এর 'রচনা অন্যান্য কাব্যের তুলনায় কিঞ্চিৎ দুরূহ'। অনুবাদের কল্যাণে একালে কাব্যরসিকমহলে মেঘদূতের বিপুল সমাদর থেকে বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

কালিদাসের অন্যতর খণ্ডকাব্য 'ঋতুসংহার' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেন, 'কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় কিছুটা ন্যূন হইলেও যে সমস্ত গুণ থাকাতে রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কার বিবর্জিত

ও সহৃদয় পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সেই সমস্ত গুণের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।' অথচ অনেকে ঋতুসংহারকে নিকৃষ্ট কাব্য বলে চিহ্নিত করে থাকেন। বিদ্যাসাগরের মতে 'ঋতুসংহার' কাব্যের মাধুর্য আস্বাদনে অপারগ পণ্ডিতশ্রেণীর গতানুগতিক সাহিত্যরুচিই এর জন্যে দায়ী। তিনি আরও বলেছেন যে, 'রূপক উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়', তাই আগাগোড়া স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে মণ্ডিত এই কাব্যের চমৎকারিত্ব তাদের 'তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম' হয়নি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির ও বসন্ত এই ছয় ঋতুর বর্ণনাসমৃদ্ধ 'ঋতুসংহার' কাব্য তাই অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। অথচ একাব্যে কবিত্বের কোথাও বিশেষ অভাব ঘটেনি। ঋতুবর্ণনায় সর্বত্র সমান সাফল্যের পরিচয় দিতে না পারলেও গ্রীষ্মবর্ণনায় যে কবি যথেষ্ট মনোহারিত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন, বিদ্যাসাগর তার জন্যে অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে তিনি আলঙ্কারিকদের বিচার-বিভ্রান্তিতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন এবং নতুন করে ঋতুসংহারের মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কালিদাস প্রণীত তৃতীয় খণ্ডকাব্য 'নলোদয়' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর কিন্তু কোন প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেননি। কিংবদন্তী এই যে, ঘটকর্পরের গর্ব খর্ব করার জন্যে কালিদাস আগাগোড়া যমকালঙ্কারে এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন ঘটকর্পর দ্বাবিংশতি যমকালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে কাব্য লিখে গর্বভরে ঘোষণা করেছিলেন যে অন্য কারও পক্ষে এরূপ কাব্য রচনা সম্ভব নয়। ঘটকর্পরের দর্পচূর্ণ করার অভিপ্রায়ে রচিত এই কাব্যে কবি কালিদাসের আন্তর প্রেরণার একান্ত অসদ্ভাব বলেই যে কাব্যসৃষ্টি হিসেবে এটি ব্যর্থ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এমনিতেই আগোড়া যমকালঙ্কার প্রাধান্য-যুক্ত কাব্য তেমন শ্রুতিসুখকর ও মধুর হতে পারে না। 'নলোদয়'-ও যে হতে পারেনি তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে। 'নলোদয়ে'র নির্মম সমালোচনা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে বিদ্যাসাগর কালিদাসের অন্ধ অনুরাগী মাত্র ছিলেন না, ছিলেন একজন রুচিশীল, বিদগ্ধ ও রসিক পাঠক।

খণ্ডকাব্য পর্যায়ে বিদ্যাসাগরের সর্বশেষ আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে ময়ূরভট্ট প্রণীত 'সূর্যশতক'। একশত শ্লোকে রচিত এই কাব্যে বিদ্যাসাগর কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। তাঁর রচনা-প্রণালী সম্পর্কে বলেছেন, রচনা অতি প্রগাঢ় ও অতি সুন্দর। তবে সমালোচকের অভিযোগ এই যে, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে প্রযুক্ত বলে এই কাব্যে ময়ূরভট্টের সৃষ্টিক্ষমতা আশানুরূপ স্ফূর্তি লাভ করেনি। 'বিষয়ান্তরে প্রয়োজিত হলে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা' তাঁর পক্ষে 'সম্ভব ছিল'—সমালোচক বিদ্যাসাগরের এই মতদৃষ্টে সাহিত্যবিচারে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতার কথা স্বভাবতই মনে আসে। রচনার পরিমাণ দিয়ে নয়, গুণগত দিক দিয়েই যে প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়, এমনি একটি মনোভাবই বিদ্যাসাগরের এসব বক্তব্য থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয় সমালোচক হিসাবে বিদ্যাসাগরের এই মনোভঙ্গী নির্ভুল ও যথার্থ।

খণ্ডকাব্যের পরে কোষকাব্য পর্যায়ে বিদ্যাসাগর কোষকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে যথাক্রমে অমরুরচিত 'অমরুশতক', শিহ্লণ-প্রণীত 'শান্তিশতক', ভর্তৃহরি-প্রণীত 'নীতিশতক', 'শৃঙ্গারশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক' এবং কবি গোবর্ধন বিরচিত 'আর্যাসপ্তশতী' প্রভৃতি ছয়খানা কোষকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন কোষগ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। অতি সংক্ষিপ্ত সে-বক্তব্য যেমন সারগর্ভ, তেমনি সরস। 'অমরুশতক'-রচয়িতার প্রশংসা করে বিদ্যাসাগর বলেছেন, 'অমরু অধিক লিখিয়া যাইতে পরেন নাই, যথার্থ বটে, কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।' আদিরসাশ্রিত এই কোষকাব্যকে কোন কোন সংস্কৃত টীকাকার শান্তরসাশ্রিত রূপে বর্ণনা করার যে হাস্যকর প্রয়াস পেয়েছেন, তাকে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ না করে পারেন নি। তাঁর মতে অমরুশতকের রচনা অতি উত্তম। তাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। সংস্কৃত যাবতীয় কোষকাব্যের মধ্যে অমরুশতকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, 'কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ

করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরু-শতকের পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে।' অমরুর রচনা বিদ্যাসাগরের চিত্ত জয় করেছিল, নতুবা এমন উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্তি তাঁর পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হত না। অমরুশতকের রচনাকাল আজও নির্ণীত হয় নি। এর রচনারীতি দৃষ্টে বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে, এ কাব্য বিশেষ প্রাচীন। শিহ্লণ-প্রণীত 'শান্তিশতক' শান্তরসাশ্রিত কোষকাব্য। অমরুর ন্যায় খ্যাতিমান না হলেও শিহ্লণ উত্তম কবি। আর তাঁর 'শান্তিশতক' ও উৎকৃষ্ট কাব্য। এ গ্রন্থে অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ, বিষয়াসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা এবং বিষয়ের অনিত্যতা প্রতিপাদন ও যদৃচ্ছালাভ, সন্তোষ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ভর্তৃহরি-বিরচিত 'নীতিশতক' সুনীতি-উপদেশমূলক রচনা, 'শৃঙ্গারশতক' আদিরসাশ্রিত এবং 'বৈরাগ্যশতক' 'শান্তিশতকে'র মতই শান্তরসাশ্রিত কাব্য। বিদ্যাসাগর ভর্তৃহরির রচনাকে উত্তম বলে নির্দেশ করেছেন এবং তাঁর কাব্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন। তবে কবি ভর্তৃহরির পরিচয় রহস্যাবৃতই রয়ে গিয়েছে। কবি ভর্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের সহোদর ভর্তৃহরি কিনা এমনি একটি প্রশ্নও বিদ্যাসাগরের মনে জেগেছে। তবে এ-প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয় বিধায়, শেষ পর্যন্ত তিনি মৌন অবলম্বন করেছেন। কবি গোবর্ধন বিরচিত 'আর্যাসপ্তশতী' এ-পর্যায়ে আলোচিত সর্বশেষ কোষকাব্য। আর্যাছন্দে কাব্যটি রচিত বলেই ঐরূপ নামকরণ হয়েছে। গোবর্ধনের কাল নির্দিষ্টরূপে জানা না গেলেও তিনি যে জয়দেবের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন তা জয়দেবের কাব্যে তাঁর উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, গোবর্ধনের রচনা সরল ও মধুর। কোষকাব্য-সম্পর্কিত বিদ্যাসাগরের এ আলোচনা থেকে আমরা আর কিছু না পেলেও অন্তত অমরু ও শিহ্লণের মতো দুইজন শক্তিমান কবির সন্ধান যে পেয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া ভর্তৃহরি ও গোবর্ধন সম্পর্কেও আমাদের কৌতুহল কিছুটা উদ্রিক্ত হয়েছে।

পদ্যকাব্যের এই নাতিবিস্তৃত সমালোচনার পরে বিদ্যাসাগর গদ্য-কাব্যের আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি কবি

বাণভট্টের 'কাদম্বরী', দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' নামক তিনটি গ্রন্থের কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতটা বিস্তৃতভাবে সম্ভব আলোচনা করেছেন। 'কাদম্বরী' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্বল্প কিছু গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'কাদম্বরী' সর্বশ্রেষ্ঠ রচনারূপে গণ্য হবার দাবি রাখে। তাঁর মতে 'কাদম্বরী' অশেষ গুণের আকর। 'কাব্যশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিতে হয়, বাণভট্ট এই গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ। তাঁহার বর্ণনাসকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়। রচনার বিশেষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দবিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্তসহ নহে।' কাদম্বরীর বিষয় নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি এতে বর্ণিত মহাশ্বেতা উপাখ্যানের রমণীয়তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। কাদম্বরীর গুণ যথেষ্ট হলেও এর ত্রুটির দিকটিও বিদ্যাসাগরের তীক্ষ্ণ সমালোচনী দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। কাদম্বরীর কোন কোন অংশের ভাষা শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাস-ঘটিত কারণে যেমন দুরূহ, তেমনি নীরস, কোথাও কোথাও এই দুরূহতার মূলে কাজ করেছে দীর্ঘসমাসঘটিত পদসমন্বিত দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার। কাদম্বরী সম্পর্কে আর একটি অভিযোগ, এ গ্রন্থের রচনার মান পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ থাকেনি। এর পূর্বভাগ, উত্তরভাগের চেয়ে সাহিত্যগুণে শ্রেষ্ঠ। এরূপ হওয়ার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ বলেন, কাদম্বরী বাণভট্টের সম্পূর্ণাঙ্গ রচনা নয়, তিনি এর পূর্বভাগ মাত্র রচনা করেছিলেন, উত্তরভাগ রচিত হয়েছিল তাঁরই পুত্র-কর্তৃক। প্রতিভার অসমতা-হেতু তাই রচনার দুই অংশে গুণগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে অনিবার্যভাবে। 'কাদম্বরী' সম্পর্কিত এ আলোচনা একদিকে যেমন অশেষ রসগ্রাহিতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি সমালোচক বিদ্যাসাগরের সূক্ষ্মদর্শিতারও পরিচায়ক। আলোচনার সর্বত্র একটি আশ্চর্য ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হয়। গদ্যকাব্য হিসাবে 'কাদম্বরীর পরেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' নামক গ্রন্থটি।' বিদ্যাসাগর এটিকে 'অত্যুত্তম গদ্যগ্রন্থ বলে নির্দেশ করেও বলেছেন যে·

এটি কাব্যাংশ তেমন উচ্চাঙ্গের নয়। 'কাদম্বরী'র সাথে তুলনায় এ-গ্রন্থ যে যথেষ্ট হীন এমন কথা তিনি একাধিক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। যেমন, 'কাদম্বরীর ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী নহে', 'নানা বিষয়ের বর্ণনা যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে', 'পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও ভীত হওয়ার মত গ্রন্থ নহে' ইত্যাদি। বস্তুত 'দশকুমারচরিতের' ত্রুটি বড় বেশী। এর নামের সঙ্গে গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর পুরোপুরি সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। বইটি প্রারম্ভে যেমন অসংলগ্নতা দোষে দুষ্ট, সমাপ্তিতেও তাই। 'দশকুমার-চরিত' নাম হলে কি হবে, এতে প্রকৃতপক্ষে আটজন কুমারের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই অসঙ্গতি দূরীকরণমানসে গ্রন্থের পূর্বপীঠিকা নামে উপক্রমণিকা অংশে দুই কুমারের বৃত্তান্ত সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু মূল গ্রন্থের রচনার সাথে উপক্রমিকাংশের রচনার বৈসাদৃশ্য এতই বেশী যে উভয় অংশ পৃথক পৃথক ব্যক্তির রচনা বলেই মনে হয়। 'দশকুমারের' পরিশিষ্ট চক্রপাণিদীক্ষিত নামক এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ-রচিত—হোরেস হেমেন উইলসনের জবানীতে বিদ্যাসাগর আমাদের এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে পরিশিষ্টের এই রচনাংশ দণ্ডীর তুলনায় নিকৃষ্ট। প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর দণ্ডীর সত্যিকার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে প্রশ্ন করেছেন, দণ্ডী কি নাম? না উপাধি? দণ্ডী সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করে তিনি প্রসঙ্গের উপসংহার টেনেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, এ আলোচনায় একটি সমালোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের সম্ভাব্য সকল জিজ্ঞাসারই তিনি সুষ্ঠু জবাব দানের চেষ্টা করেছেন। এমন বিষয়নিষ্ঠ সমালোচনা অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত গদ্যকাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে কালিদাসের সমসাময়িক কবি বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু রচিত 'বাসবদত্তা'। এটি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর রচিত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। 'কাদম্বরী'র সাথে সাদৃশ্য হেতু মনে হয় কবি বাণভট্টের পূর্বেই সুবন্ধু আবির্ভূত হয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুবন্ধুর রচনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য সত্ত্বেও কবিত্বশক্তির তাদৃশ প্রকাশ ঘটেনি বলে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে বাসবদত্তা

খুব উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ নয়, 'কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা…… সর্বাংশেই মধ্যবিধা'। এতৎসত্ত্বেও এ গ্রন্থের প্রারম্ভের শ্লোক এবং গ্রন্থমধ্যস্থ কুপিত সিংহ বর্ণনার শ্লোকদ্বয় যে অত্যন্ত মনোহর, তা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। রসিক সমালোচক বিদ্যাসাগর যে সমালোচক হিসাবে কিরূপ সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, এই দৃষ্টান্ত থেকে নিশ্চয়ই বোধগম্য হবে।

গদ্যকাব্য সম্পর্কিত আলোচনার পরে বিদ্যাসাগর অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় গদ্যপদ্যময় চম্পুকাব্য সম্পর্কে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে এমন চম্পুকাব্য সংস্কৃতে একটিও রচিত হয়নি। অনেক চম্পুকাব্যের মধ্যে তাঁর বিবেচনায় দেবরাজ-বিরচিত 'অনিরুদ্ধচরিত' সর্বোৎকৃষ্ট। এছাড়া উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে ভোজদেব-রচিত 'চম্পু রামায়ণ,' ও চিরঞ্জীব-বিরচিত 'বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণী', অনন্তভট্টপ্রণীত 'চম্পুভারত', ভানুদত্তের 'কুমারভার্গবীয়', রামানাথের 'চন্দ্রশেখরচেতোবিলাসচম্পু' ও রূপগোস্বামী-বিরচিত 'আনন্দ-বৃন্দাবনম্পু' ইত্যাদি চম্পুকাব্যের নাম উল্লেখ করেই তিনি এ প্রসঙ্গের ইতি টেনেছেন। বলা বাহুল্য চম্পুকাব্যগুলো সৃষ্টি হিসাবে অকিঞ্চিৎকর, এই বিবেচনায়ই যে বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি এদের আলোচনার সমাপ্তি টেনেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রব্যকাব্য পর্যায়ে পদ্য, গদ্য ও পদ্য-গদ্যময় নানা শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের আলোচনাশেষে বিদ্যাসাগর দৃশ্যকাব্য পর্যায়ে সংস্কৃত নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সূচনাতে যথারীতি অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নাট্যলক্ষণসমূহের কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি আদি নাট্যকার রূপে কীর্তিত ভরতমুনির অস্তিত্বেই শুধু নয়, ব্যাকরণ-দর্শন ইত্যাদি গ্রন্থরচয়িতা বলে পরিকীর্তিত সকল মুনির অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে তিনি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, শূদ্রক, বিশাখদেব, ভট্টনারায়ণ এই ছয়জনের বিশিষ্ট রচনাসমূহকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। যদিচ তিনি জানেন যে প্রায় বিরাশিখানার মতো সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে তেত্রিশখানা বিদ্যমান। অনেক নাটকের আজকাল সন্ধান না পাওয়া গেলেও

'দশরূপক' ও 'সাহিত্যদর্পণে' প্রদত্ত উদাহরণ দৃষ্টে তাদের নাম জানতে পারা গিয়েছে, যেমন 'কুন্দমালা', 'উদাত্তরাঘব', 'বালরামায়ণ' প্রভৃতি। এ সব নাটক থেকে উদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে মনে হয় ঐগুলো উৎকৃষ্ট নাটক ছিল। সে যাই হোক, বিদ্যাসাগর তাঁর নাট্যালোচনা প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ রেখেছেন পূর্বোল্লিখিত নাট্যকার-ষট্‌কের বিশিষ্ট কয়েকটি রচনার মধ্যে। প্রথমে তিনি কালিদাস-বিরচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা', 'বিক্রমোর্বশী' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাট্যত্রয় সম্পর্কে আপনার বক্তব্য পেশ করেছেন। 'শকুন্তলা' নাটকের উৎকর্ষ নির্দেশ করে প্রথমে তিনি সংক্ষেপে বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে 'শকুন্তলা'য় আলৌকিক কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে এবং 'মনুষ্য ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না।' শুধু তাই নয়, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' তাঁর বিবেচনায় 'এক আলৌকিক পদার্থ'। দেশী-বিদেশী সমালোচক-মহলে উচ্চপ্রশংসিত শকুন্তলা সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর উইলিয়ম জোন্স-কৃত কালিদাস ও সেক্সপীয়রের তুলনার কথাটি উল্লেখ করতে ভোলেননি। শুধু তাই নয়, জোন্স কৃত শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদের ফস্টর-কৃত জার্মান অনুবাদ পাঠে উচ্ছ্বসিত গ্যেটের প্রশংসাবাণীটি উদ্ধৃত করে নাটক হিসাবে শকুন্তলার উচ্চ মহিমাটিকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ফস্টর-কৃত ইংরেজী শকুন্তলার জার্মান অনুবাদ প্রসঙ্গে গ্যোটের উক্তি।

Wouldst thou the young year's
Blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is
Charmed, enraptured, feasted, fed,
Itself in one sole name combined ?
I name thee, O Sakuntala and
All at once is said.

বিদ্যাসাগরের অনুবাদে সে প্রশংসাবাণী দাঁড়িয়েছে এরূপ—

যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ

প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞানশকুন্তলা ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি। এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।*

এই অনুবাদে মূলের বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে রসসৃষ্টির অপার ক্ষমতা দেখিয়েছেন বিদ্যাসাগর। গ্যেটের এই উক্তি কালিদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধাবোধকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর মতে অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করেই যদি এত আনন্দ পাওয়া যায়, তাহলে মূল পাঠে নিশ্চয়ই সে-আনন্দের মাত্রাধিক্য ঘটতে বাধ্য। মোট কথা, কালিদাস যে এক অসাধারণ শিল্পস্রষ্টা, গ্যেটের উক্তি থেকে তারই অকপট সহজ স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে। কালিদাস-প্রেমিক বিদ্যাসাগর তাতে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি বোধ করেছেন।

'শকুন্তলা'র সমালোচনায় বিদ্যাসাগর একজন রসবাদী সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে তিনি যেভাবে ইউরোপীয় সমালোচকদের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁর মনীষা ও রসবোধ উভয়েরই পরিচয় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'শকুন্তলা'র পরবর্তী 'বিক্রমোর্বশী' সম্পর্কেও বিদ্যাসাগর আপন রসবিচারের ক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। 'শকুন্তলা'র তুলনায় 'বিক্রমোর্বশী' ন্যূন হলেও এতে কোথাও কোথাও এমন কাব্যগুণ রয়েছে যার দৃষ্টান্ত সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্যেও দুর্লভ। বিদ্যাসাগর 'বিক্রমোর্বশী' থেকে এই বিষয়ের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরে মন্তব্য করেছেন—'চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া পুরুরবা তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণনা আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর

* তুলনীয়: 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।'—রবীন্দ্রনাথ, 'শকুন্তলা,' প্রাচীন সাহিত্য।

যে কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।' বস্তুত পুরুরবা ও উর্বশীর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকে পুরুরবার বিরহবর্ণনে কালিদাস আপন অলৌকিক কবিত্বশক্তিরই বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন। 'বিক্রমোর্বশী'র পরে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর সংক্ষিপ্ত দু-একটি মন্তব্য করেই কাজ সেরেছেন। 'শকুন্তলা' ও 'বিক্রমোর্বশী'র তুলনায় এটি অপরিপক্ক রচনা বলেই, বিদ্যাসাগর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে মালবিকাগ্নিমিত্র হয়তো কালিদাসের অপরিণত শিল্প-প্রতিভার সৃষ্টি; তাই সৃষ্টি হিসাবে 'শকুন্তলা' ও 'বিক্রমোর্বশী'র পূর্বগামী। তবে এ বিষয়ে সুষ্ঠু প্রমাণাভাবে বিদ্যাসাগর বিস্তারিত আলোচনায় ক্ষান্তি দিয়েছেন।

কালিদাসের নাটকত্রয়ের আলোচনার পরই ভবভূতির 'বীরচরিত', 'উত্তরচরিত' ও 'মালতী-মাধব'-এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মতে ভবভূতি একজন অতি প্রধান কবি, তবে প্রতিভার বিচারে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পরেই কেবল তাঁকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। ভবভূতির নাটকসমূহ অতি উচ্চ প্রশংসার বস্তু এইজন্যে যে 'সংস্কৃতভাষায় যত নাটক আছে ভবভূতি-প্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ....ইঁহার নাটকের মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।' ভবভূতির রচনা এমনিতে যথেষ্ট 'হৃদয়গ্রাহিনী ও অতি চমৎকারিণী'। মধুর ও কোমল ভাবব্যঞ্জক রচনাতে তাঁর বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। তা ছাড়া, ভবভূতি উন্নত রসরুচির অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত কবিদের অনেকেই দেখতে পাই অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরসের অবতারণায় অতিমাত্রার উৎসাহী। ভবভূতি কিন্তু এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন; অনাবশ্যক স্থলে আদিরস আমদানী করে রচনাকে তিনি দূষিত করেননি। এমন কি আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধানতার সাথে তার অবতারণা করেছেন। তবে ভবভূতির রচনায় বিলক্ষণ ত্রুটি আছে, যে জন্যে ভবভূতি কাঙ্ক্ষিত

শিল্পসার্থকতা অর্জনে সমর্থ হননি। তাঁর রচনায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে দীর্ঘ সমাসঘটিত পদ ও বাক্যের অবতারণা থাকাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। তাঁর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে কথোপকথনের ভাষাতেও তিনি দীর্ঘ সমাসঘটিত বাক্য প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় আবেগকে নষ্ট করে দিয়েছেন। ভবভূতির প্রতিভার শক্তি ও সীমা এইভাবে নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর তাঁর নাট্যত্রয়ের দোষগুণ নির্দেশ করেছেন। প্রথম নাটক 'বীরচরিতে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষেপে এর বিষয় নির্দেশ করেছেন। রামচরিত্র অবলম্বনে রচিত এই নাটকে, বিদ্যাসাগরের মতে কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটলেও, নাটকীয় গুণের সম্যক বিকাশ ঘটেনি। তবে রামের বিবাহ থেকে রাবণবধের পর অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত রামচরিত্রের এই অংশ অবলম্বনে এর চেয়ে উত্তম নাটক আর রচিত হয়নি বলেও বিদ্যাসাগর অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ আলোচনা আরও মূল্যবান বলে বিবেচিত হত যদি বিদ্যাসাগর তথ্যভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্তকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেন। তার অভাবে আলোচনাটিকে অসম্পূর্ণ বলতেই হয়।

ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক হচ্ছে 'উত্তরচরিত'। এতে 'বীরচরিতাবশিষ্ট' রামচরিত্র বর্ণিত হয়েছে। ভবভূতি তাঁর 'মালতীমাধব' নাটকের জন্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলেও বিচারকের রায় কিন্তু 'উত্তরচরিতে'র পক্ষেই গিয়েছে। করুণরসাশ্রিত এই নাটকের 'বর্ণনাসকল কারুণ্য-মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পূর্ণ', এঁর 'রচনা মধুর ললিত ও প্রগাঢ়'। 'উত্তরচরিত' পাঠান্তে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত—'ফলত শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ।' 'উত্তরচরিত' সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এ আলোচনা 'বীরচরিত' সম্পর্কিত আলোচনার ন্যায়ই অতি সংক্ষিপ্ত; অতএব আমাদের পিপাসাকে তৃপ্ত করে না। তবে দুই ক্ষেত্রেই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও যে যথেষ্ট সারগর্ভ তা স্বীকার করতেই হয়। পরবর্তী নাটক 'মালতীমাধব' সম্পর্কেও সমালোচকের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। 'মালতীমাধব' কবি-ঘোষিত মহিমা লাভ করতে পারেনি বলেই সকল সমালোচকের অভিমত। আদিরসাশ্রিত এই

নাটকে ভবভূতি তাঁর রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তির একশেষ করেছেন। অথাপি সত্যের অনুরোধেই বল্‌তে হয় নাটকটি আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করেনি। বিদ্যাসাগর কালিদাসের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা, শ্রীহর্ষের বৎসরাজ ও রত্নাবলীর কাহিনীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন 'মালতীমাধবে'র কাহিনী ঐসবের মত মনোহররূপে নিবদ্ধ হয়নি। এই নাটকেও অতি দীর্ঘ সমাস-ঘটিত পদের ব্যবহার অর্থবোধে যথেষ্ট বাধা স্থষ্টি করেছে। 'বীরচরিত', 'উত্তরচরিত' ও 'মালতীমাধব'—এই নাটকত্রয়ীর গুণাগুণ বিশ্লেষণান্তে বিদ্যাসাগর এই সিদ্ধান্তেই বহাল রয়েছেন যে 'উত্তরচরিত'ই ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক; কারণ এই নাটকের রসনিষ্পত্তিতে কোথাও বিঘ্ন ঘটেনি। এর কাহিনী যেমন সুন্দরভাবে বিন্যস্ত, তেমনি এতে নাটকীয় গুণও সর্বাধিক। কবিত্বশক্তির প্রকাশে ন্যূনতা ঘটে নি কোথাও। ভবভূতি-সম্পর্কিত বিদ্যাসাগরের এই রায় কালের বিচারেও টিকে গিয়েছে বলে মনে হয়।

ভবভূতির পরে বিদ্যাসাগর 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ'-রচয়িতা শ্রীহর্ষ-দেবের নাট্যকীর্তির উপর আলোকপাত করেছেন। এ আলোচনায় বিস্তৃত বিচারবিশ্লেষণ প্রয়াস অনুপস্থিত। তবে নাটক দুইটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। 'রত্নাবলী' সংস্কৃত সাহিত্যে অতি প্রশংসিত নাটক। অনেকের মতেই আদিরসাশ্রিত এই নাটকের স্থান ঠিক কালিদাসের শকুন্তলার পরেই নির্দিষ্ট করা উচিত। বৎসরাজ ও রত্নাবলীর কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। 'নাগানন্দ' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বিশেষ কোন বক্তব্য রাখেন নি। শুধু বলেছেন, এটি রচনাদৃষ্টে অপেক্ষাকৃত নতুন বলে মনে হয়। 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ'-প্রণেতা শ্রীহর্ষদেব সম্ভবত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে ঐরূপই উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে সংশয় স্থষ্টি করেছেন টীকাকার মম্মটভট্ট। তিনি দাবি করেছেন, শ্রীহর্ষের নামে প্রচলিত ঐ রচনাগুলোর প্রকৃত স্রষ্টা ধাবক নামে কোন কবি। কিন্তু বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনায় ধাবক নামে এক কবির উল্লেখদৃষ্টে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে ধাবক অনেক

পূর্বকালের কবি। তাই মম্মটভট্টের মত ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। লেখকের গোত্র-পরিচয় নির্ধারণে বিদ্যাসাগরের এই মনোভঙ্গী যে বৈজ্ঞানিক, তাতে সন্দেহ নেই।

কালিদাস, ভবভূতি ও শ্রীহর্ষের নাট্যকীর্তি বিশ্লেষণান্তে বিদ্যাসাগর যথাক্রমে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', বিশাখদেব-প্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' এবং ভট্টনারায়ণ বিরচিত 'বেণীসংহার' নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার টেনেছেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' রচনাদৃষ্টে বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। নাটকের প্রস্তাবনার বক্তব্য উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর এর প্রণেতার যথার্থ পরিচয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 'শূদ্রক' নামে আদৌ কেউ ছিলেন কিনা সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা চলে না। সে যাই হোক 'মৃচ্ছকটিক' পণ্ডিতমহলে 'অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা', অতি সুন্দর শ্লোক' ইত্যাদির জন্যে বিশেষভাবে প্রশংসিত নাটক বলেই গণ্য। 'মৃচ্ছকটিকে'র পক্ষে আর একটি গুণের কথা হচ্ছে এই যে, এটি আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল রচনা। বিদ্যাসাগরের মতে এটি কাব্য হিসাবে উত্তম কিন্তু সর্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক নয়। প্রসংগত 'শকুন্তলা' ও 'রত্নাবলীর' তুলনায় নাটক হিসাবে এর ন্যূনতাও তিনি নির্দেশ করেছেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের পরেই এসেছে বিশাখদেব প্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গ। বলা বাহুল্য, বক্তব্য এখানেও আশ্চর্যরূপে সংক্ষিপ্ত, তবে লক্ষ্যভেদী। বিশাখদেব সম্পর্কে সমালোচক আমাদের জানিয়েছেন যে তিনি একজন সৎকবি বটেন, কিন্তু তাঁর 'রচনা প্রাঞ্জল ও ললিত নহে'। তবে তৎপ্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটিকে তিনি এক 'অত্যুত্তম নাটক' বলে নির্দেশ করেছেন। পরে সংক্ষেপে নাটকটির বিষয়-বিশ্লেষণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় সমালোচনা কোন মতেই সম্পূর্ণতা দাবি করতে পারে না। এই পর্যায়ে সর্বশেষ নাটক হচ্ছে 'কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ' অবলম্বনে রচিত বীররসাশ্রিত নাটক ভট্টনারায়ণ-প্রণীত 'বেণীসংহার'। সমালোচক জানিয়েছেন, 'কাব্যগুণে ন্যূন হলেও 'বেণীসংহার' নাটকের সমুদয় লক্ষণে অলংকৃত। এর 'রচনা মনোহারিণী নহে' তা ঠিক, কিন্তু বীর ও করুণ রসের উত্তম বর্ণনার জন্যে নাটকটি বিশিষ্টতা

দাবি করতে পারে।' 'বেণীসংহার' আলোচনান্তে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের আবিষ্কৃত, অবলুপ্ত ও অনাবিষ্কৃত নাট্যসম্পদের বিশালতা ও প্রাচুর্যের একটা ইঙ্গিত দিয়ে নাটক-প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় ছেদ টেনেছেন।

দৃশ্যকাব্য পর্যায়ে নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা সমাপ্তির সাথে সাথে প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যসম্পর্কিত জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান বিষয়ের আলোচনা শেষ হলেও, সমালোচক বিদ্যাসাগর আপন কর্তব্য শেষ জ্ঞান করেন নি। সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'কথাসরিৎসাগর'-জাতীয় নীতি-উপদেশমূলক আখ্যানজাতীয় রচনাগুলোর মূল্যায়নে উদ্যোগী হয়েছেন। বিদ্যাসাগর এ জাতীয় রচনাগুলোকে কাব্যপদবাচ্য মনে করার আলংকারিক মনোভাবকে অযৌক্তিক বলে নির্দেশ করেছেন। 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' ও 'কথাসরিৎসাগর' নীতি-উপদেশমূলক আখ্যানজাতীয় এই তিনটি গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বিশেষ কোন সাহিত্যগুণ খুঁজে পান নি। তিনি অবশ্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত বিশ্বাস করেন যে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান ইরান, আরব ও ইউরোপের নানা দেশের আখ্যানকে প্রভাবান্বিত করেছিল। 'পঞ্চতন্ত্র' যে অতি প্রাচীন রচনা, তা এর রচনাপ্রণালী দৃষ্টে বুঝা যায়। তবে 'পঞ্চতন্ত্রে'র সাহিত্যিক মূল্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন, তার বোধ হয় প্রতিবাদ চলে না। বিদ্যাসাগরের মতই সকল মনোযোগী পাঠক হয়তো 'পঞ্চতন্ত্র' সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছবেন যে 'রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য নাই, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধহয় কোনও বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।' 'হিতোপদেশ' সম্পর্কেও আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নতর হওয়ার মত কারণ ঘটে নি। বিদ্যাসাগর যথার্থ বলেছেন যে হিতোপদেশ 'পঞ্চতন্ত্রের'ই প্রতিরূপ। 'পঞ্চতন্ত্রের' দোষগুণ সবই এতে বর্তেছে। তবে 'পঞ্চতন্ত্র' অপেক্ষা এর রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ়। 'হিতোপদেশে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বক্তব্য বিষয়কে বিশদ করে তোলার জন্যে প্রমাণস্বরূপ নানা শ্লোক উদ্ধৃত করার প্রয়াস দেখা যায়। রচনা-বিচারে 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্র'

অপেক্ষা কিছুটা উন্নত হলেও, অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট বলে 'পঞ্চতন্ত্র' অপেক্ষা বেশী নিন্দিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর গ্রন্থকর্তার বিচারবুদ্ধি ও স্থূলরুচিকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানস্থলে বালকদিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আদিরসঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি করিয়া গ্রন্থকর্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন বলিতে পারা যায় না।' 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'-রচয়িতার পরিচয় সম্পর্কে যে সংশয় রয়েছে, তাও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন। পঞ্চতন্ত্র-রচয়িতা বিষ্ণুশর্মাকে অনেকে হিতোপদেশের রচয়িতা বলে মেনে নিতে চাইলেও বিদ্যাসাগর তা মেনে নিতে চান নি। তিনি লল্লুলালের মত উদ্ধৃত করে নারায়ণ পণ্ডিতকেই 'হিতো-পদেশে'র রচয়িতা মনে করতে ইচ্ছুক। তবে শেষ কথা কিছু বলেন নি। এ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য শেষ গ্রন্থটি হচ্ছে আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত সোমদেব-প্রণীত 'কথাসরিৎসাগর'। অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ এর কাহিনীসমূহ বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় 'তাদৃশ মনোহর নহে'। এ-গ্রন্থ মৌলিক রচনা নয়, 'বৃহৎকথা' নামক সংস্কৃত উপাখ্যান-গ্রন্থেরই সারসঙ্কলন মাত্র—এরূপ সন্দেহ বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণীর' উল্লেখ দৃষ্টে মনে হয় এটি কাশ্মীরের রাজা অনন্তদেবের মহিষী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্যে কবি সোমদেব কর্তৃক রচিত হয়েছিল। 'কথা সরিৎসাগর'-রচয়িতা সম্পর্কে এ-মত এখন পর্যন্ত পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য। 'কথাসরিৎসাগর' সম্পর্কে বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই উপাখ্যান-জাতীয় রচনা সম্পর্কে আলোচনার সমাপ্তি ঘটেছে এবং ঐ সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবটিও বাঞ্ছিত পূর্ণতা লাভ করেছে।

প্রস্তাবের উপসংহার টানবার পূর্বে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও দৈন্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। সংস্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রসসংক্রান্ত বর্ণনা তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ, উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক নায়িকার প্রথম দর্শন, পূর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী, যুদ্ধ, ভয়, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।"

সংস্কৃতসাহিত্যের সার্বিক রূপ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজও কেউ বড় একটা এগিয়ে আসেননি। দেশীয় বা ইউরোপীয় সমালোচকদের কেউ নতুনতর কোন বক্তব্যও আমাদের জন্যে রাখেননি। তাই বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য বলেই আমাদেরও গ্রহণীয়।

'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থ সঙ্গত কারণেই আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের একটি অতি উল্লেখযোগ্য দিক্‌নির্দেশক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। ইতিপূর্বে খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য-সমালোচনামূলক দু-একটি নিবন্ধ রচিত হলেও, তার কোনটিই বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের মত পরিপক্ক বিচারশক্তি ও পরিণত রসবোধের পরিচয় বহন করে না। সমালোচনার ভাষাও বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রথম তীক্ষ্ণ, শাণিত ও লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত বিদ্যায় পণ্ডিত হয়েও তিনি যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাঁর সমালোচনা-কর্মেও গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করার বলিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় সর্বত্র। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রসবাদী সমালোচনার প্রতি পক্ষপাত সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশকে প্রয়োজনবোধে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে। নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধি অনুসারে বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে

পৌঁছুতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন বেশী। পূর্বসূরীদের বিচার বিভ্রান্তি প্রদর্শনে তিনি যেমন নির্মম ছিলেন, তেমনি প্রকৃত রসিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামতের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সেই জন্যেই বিদ্যাসাগরের সকল মানসিক প্রচেষ্টায় একটা আশ্চর্য ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমালোচনা-কর্মেও তার ব্যতিক্রম দেখি না। সংস্কৃত সাহিত্যসমালোচনায় বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বেশী সাফল্য ঘটেছে কালিদাস-প্রতিভার মহিমা আবিষ্কারে। প্রকৃতপক্ষে কালিদাসকে আধুনিক যুগে নতুন মহিমায় বাঙালীর সামনে উপস্থিত করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তার পথ প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। রসপ্রমাতা বিদ্যাসাগর কালিদাসকে দুদিক থেকেই নিবিড়-ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য মনীষীদের সংস্কৃত-চর্চার বিপুল উদ্যমের সাথে পরিচিত হয়ে। কালিদাসের মুগ্ধ পাঠক বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বেরও শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার। কালিদাস সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইলিয়ম জোন্স, মহাকবি গ্যেটে প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসাবাণী বিদ্যাসাগরের কালিদাস-সম্পর্কিত প্রত্যয়কে যথেষ্টই পরিপুষ্ট করেছিল। বস্তুত কালিদাস সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এতই গভীর ছিল যে বিশ্বের অন্য কোন সাহিত্যিকের তুলনায় তাঁকে ন্যূন বলে মানতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মধুসূদনের দৃষ্টিতে মিলটন ছিলেন এক স্বর্গীয় প্রতিভা, তাঁর তুলনা নেই, বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে কালিদাসও তাই। তাঁর বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য তিনি বিনা প্রতিবাদে শুনতে রাজী ছিলেন না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালিদাস ও শেক্সপীয়র-প্রসঙ্গে আলোচনাকালে কৃষ্ণকমলবাবু হেমচন্দ্রের শেক্সপীয়র-প্রশস্তিমূলক কবিতার বিখ্যাত পংক্তি 'ভারতের কালিদাস. জগতের তুমি' উদ্ধৃত করে শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দিলে বিদ্যাসাগর রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'হেমবাবুর একথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত

সংস্কৃত জানে না।' অনেকের মতে এটা বিদ্যাসাগরের পক্ষে বড় বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু এ তো ঠিক, বিদ্যাসাগর মিথ্যা স্তোকবাক্য বা প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করবার মত লোক নন। সুগভীর পাণ্ডিত্য ও রস-বোধের অধিকারী বিদ্যাসাগর আপন বিচারশক্তিতে অসাধারণ আস্থাশীল ছিলেন। তাই কোন বিষয় বিবেচনার পর একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা থেকে তাঁকে নড়ান একপ্রকার অসম্ভব ছিল। বিশেষত যুক্তিতে তাঁকে পরাস্ত করা সহজ ছিল না। কালিদাস সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত যে আজও শ্রদ্ধেয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে, প্রবন্ধে ও আলোচনায় তা একাধিক বার প্রতিপন্ন করেছেন। কালিদাস ছাড়া ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের দিক্‌পালদের সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের মতামত প্রায় অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। মোট কথা, সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এই বিচার বিশ্লেষণ-প্রয়াস যতই সংক্ষিপ্ত হোক, তা যে এর শক্তি ও সীমা-নির্ধারণে যথেষ্টই সার্থক হয়েছিল, একথা স্বীকার না করে পারা যায় না। *

* ভিন্নতরভাবে উল্লেখ করা না থাকলে বুঝতে হবে সকল উদ্ধৃতি বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব' থেকে নেওয়া হয়েছে।

মীর মোশাররফ হোসেন ও তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের চর্চায় যে কয়েকজন মুসলিম সাহিত্য-সাধক অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন নিঃসন্দেহে সর্বাধিক খ্যাতিমান। 'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতা হিসাবে বাঙালী পাঠক মানসে তাঁর প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদী। মীর সাহেবের অন্যান্য রচনার খবর সাধারণ পাঠক বড় একটা রাখেন না। শিক্ষিত সমাজও এ বিষয়ে খুব বেশী অবহিত নন। ইদানিং ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহী গবেষকদের প্রচেষ্টায় তাঁর অন্যান্য রচনা সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং কয়েকটি গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে মীর সাহেবের বহু রচনার সঙ্গে পাঠক-সমাজ নতুন করে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহিত্য-কীর্তি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। বস্তুত দীর্ঘকাল পাঠকের দৃষ্টির-আড়ালে পড়ে থাকা এসব গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের ফলে, মীরের অসম্পূর্ণ সাহিত্যিক পরিচয় এবার অনেকটা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং আমরাও মীর সাহেবকে ব্যাপকতর, গভীরতরভাবে জানবার সুযোগ লাভ করেছি। সাম্প্রতিক কালে পুনঃপ্রকাশিত মীর সাহেবের এমনি একটি গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর প্রথম রচনা বলে কথিত 'রত্নবতী'। শতাধিক বর্ষ আগে, ১৮৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিত এ-গ্রন্থটি বহুকাল বাঙালী পাঠকের দৃষ্টির বাইরে ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত 'মীর মোশাররফ হোসেন' শীর্ষক ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশিত সামান্য তথ্য ছাড়া দীর্ঘকাল এদেশের সুধী-সমাজ

এ-গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি। 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' রচয়িতারাও এ-বিষয়ে প্রায় নীরব থেকেছেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান বিরচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থটি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার একটি তথ্যভূয়িষ্ঠ দলিল হলেও, ঐ গ্রন্থেও মীর সাহেবের এই প্রথম রচনা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি। মাঝখান থেকে মীরের রচিত গ্রন্থ-তালিকায় একে উপন্যাস-রূপে চিহ্নিত করে মহা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণেও[১] অবশ্য ঐ বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্যে রত্নবতীর উপন্যাস অভিধাটি বর্জন করা হয়েছে।

সে যাই হোক, রত্নবতী সম্পর্কে আজ আর তথ্যের অপ্রতুলতা নেই, তাই বিচার-বিভ্রান্তিরও বিশেষ অবকাশ নেই। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, ডঃ আনিসুজ্জামান ও ডঃ মোহম্মদ আবদুল আউয়াল প্রভৃতি গবেষকের সৌজন্যে আমরা গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয়-জ্ঞাপক তথ্যের অধিকারী হয়েছি। কাজী আবদুল মান্নান তাঁর 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা'[২] গ্রন্থটিতে 'রত্নবতী' সম্পর্কে তথ্যগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আনিসুজ্জামান তাঁর বিখ্যাত গবেষণা-গ্রন্থ 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য'[৩]-এ কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। সর্বশেষ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল 'রত্নবতী' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের[৪] ব্যবস্থা করে আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। এঁদের

১। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৮ পৃঃ ৭৫।

২। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯ ; রত্নবতী সম্পর্কিত আলোচনা-১৩৮ থেকে ১৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ডঃ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' প্রথম সঃ ১৯৬৪ ; রত্নবতী সম্পর্কিত আলোচনা ২২২-২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। মীর মোশাররফ হোসেন, 'রত্নবতী' মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত নতুন সংস্করণ।

মধ্যে 'রত্নবতী'র সামগ্রিক পরিচয় ও বাঙলা গদ্যের মুসলিম সাধনায় এর তাৎপর্য সম্পর্কে একমাত্র কাজী সাহেবই পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। আনিসুজ্জামান সাহেব বিষয়-পরিচয়-সহ এর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের চেষ্টা পেয়েছেন। মোহম্মদ আবদুল আউয়ালও এক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের বিবেচনায় এঁরা প্রত্যেকেই 'রত্নবতী' সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে সাহায্য করলেও, গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাপ্ত সকল তথ্যের সদ্ব্যবহার করে এর সম্পর্কে সুষ্ঠু-বিচার ভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলতে ততটা মনোযোগী হননি। 'রত্নবতী' সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার প্রচেষ্টা তাই অবান্তর বলে বিবেচিত হবে না বলে মনে করি। তবে এ আলোচনা অগ্রপথিকদের বক্তব্যকে পূর্ণ-স্বীকৃতি দিয়েই কেবল চলতে পারে, তা স্বীকার্য। তাই আমরা প্রথমে 'রত্নবতী' সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে, সে সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রকাশ করব এবং পরিশেষে আমাদের নিজস্ব বক্তব্য রাখব।

প্রথমেই গ্রন্থটি সম্পর্কে কাজী আবদুল মান্নান সাহেবের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। মান্নান সাহেব তাঁর 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' পুস্তকে 'রত্নবতী সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন' এই বলে,

> "১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'কে নিয়েই আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত গল্পসাহিত্যের সূত্রপাত হয়। লেখক অবশ্য গ্রন্থটিকে 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন।"[৫]

তারপর তিনি বইটির মুদ্রণ সংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং তার সমর্থনে 'রত্নবতী'র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার একটি মুদ্রিত প্রতিলিপি উপস্থাপিত করেছেন। তা' থেকে আমরা জানতে পারি, বইটি

৫। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃঃ ১৩৮।

কলকাতার ১৪৯ নং মাণিকতলা স্ট্রীটস্থ 'নূতন বাঙ্গলা যন্ত্র' নামক মুদ্রণালয় থেকে সংবৎ ১৯২৬—এ প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদে লেখকের নাম 'শ্রী মীর মোশাররফ হোসেন' রূপে মুদ্রিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গ্রন্থটির রচনা-প্রকৃতি দ্যোতক এই শ্লোকটি তাতে উৎকীর্ণ দেখতে পাই ঃ

'গাঁথিয়া কল্পনা সূত্রে নব গল্পহার।
সঁপিলাম বন্ধুগলে, নব উপহার।।

এ ছাড়া মুদ্রণের তারিখ সম্পর্কে লেখকের 'বিজ্ঞাপন' থেকে অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে মান্নান সাহেব '৩০শে শ্রাবণ, ১২৭৬' দিনটির কথাও উল্লেখ করেছেন। বইটির কলেবর সম্পর্কেও তিনি প্রামাণ্য তথ্য যুগিয়েছেন। অতঃপর তিনি দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত ৬১ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র কলেবর এই পুস্তকের কাহিনী অংশের সূত্র নির্দেশ করে কিছুটা বিস্তৃতভাবে, কোথাও বা 'রত্নাবতী' গ্রন্থের মূল রচনার অংশ বিশেষ, কোথাও বা নিজস্ব বর্ণনসূত্রের সাহায্যে কাহিনীটি পরিবেশন করেছেন। বলা বাহুল্য মান্নান সাহেব অতি সুচারুরূপে একাজ সম্পন্ন করেছেন। এরপর গ্রন্থবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে কাজী সাহেব সঙ্গতভাবেই এর ভূমিকারূপে লিখিত 'বিজ্ঞাপন' অংশ উদ্ধৃত করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে জরুরী বিধায় আমরাও এখানে তা উদ্ধৃত করছি ঃ

"রত্নবতী প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনাকার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। আজকাল অনেকানেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি। ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদূর পারিয়াছি, সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইলাম বলিতে পারি না। গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। অতএব ইহার মধ্যে শত শত দোষ বিদ্যমান থাকা সম্ভব। ভরসা করি গুণজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ সে

ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে সকলে এক একবার ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেই আমার শ্রম সফল হয়।"[৬]

ভূমিকার এ বক্তব্য থেকে যে জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা' হল এক,' 'রত্নবতী' সন্দেহাতীতভাবে মীর সাহেবের প্রথম গ্রন্থ। দুই, তিনি সমসাময়িক 'অনেকানেক' সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারের ন্যায় অনুবাদের পক্ষপাতী না হয়ে আপন স্বাধীন কল্পনাগুণে এর গল্পটি ভাষাসঙ্গতি ও নিয়মবন্ধ রক্ষা করে রচনা করেছেন। মান্নান সাহেব 'রত্নবতী'র ভূমিকার এ বক্তব্যে প্রভাবান্বিত হয়ে অনুমান করেছেন যে 'রত্নবতী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সাধুভাষায় লিখিত বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট গ্রন্থ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' [১৮৪৭], 'শকুন্তলা' [১৮৫৪], 'সীতার বনবাস' [১৮৬০], তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী [১৮৫৩] ইত্যাদি গ্রন্থ যেহেতু অনুবাদমূলক ছিল এবং যেহেতু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) এবং বঙ্কিম-চন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বিদেশী গ্রন্থের অনুসরণে রচিত হয়েছিল, তাই "সম্ভবত ঐ সব গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই' মোশাররফ হোসেন, 'তাঁর প্রথম রচনাটিকে মৌলিক কল্পনায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন।"[৭] মোশাররফের এ-মনোভঙ্গীর অন্যতর কারণ নির্দেশ করে মান্নান সাহেব বলেছেন, 'তা ছাড়া তাঁর শিক্ষা এবং পরিবেশের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সংস্কৃত বা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে গল্প রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল মনে হয় না।"[৮] মান্নান সাহেবের যুক্তি অনুসরণ করে এ সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছুতে বাধ্য যে মীর সাহেব দুটি কারণে মৌলিক কল্পনার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন, এক, তিনি অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। যেহেতু তাঁর আগেই অনেক গ্রন্থকার সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করে ফেলেছেন। দুই, সংস্কৃত বা ইংরেজী বিদ্যার সঙ্গে পরিচয়ের স্বল্পতা ও তাঁর সমাজ প্রতিবেশের ভিন্নতার জন্যে তাঁর পক্ষে ভিন্নভাষার সম্পদাশ্রয়ে গল্প রচনা সম্ভব ছিল না।

৬। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুলিম সাধনা', পৃঃ ১৪৩-৪৪।

৭। ঐ ঐ পৃঃ ১৪৪।

৮। ঐ ঐ ঐ

'রত্নবতী' গ্রন্থের কাহিনী নির্মাণে মোশাররফ হোসেনের মৌলিকতা প্রতিপন্ন করার পক্ষে এ সব যুক্তি যে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, তা মান্নান সাহেব প্রায় পরমুহূর্তেই যেন নিজের অজ্ঞাতেই, স্বীকার করে নিয়েছেন যখন নিজ যুক্তিধারা অনুসরণ করে তিনি বলেন, "ফলে, দেশে প্রচলিত কাহিনীকে আশ্রয় করেই রত্নবতীর গল্প সৃষ্টি হয়েছে।"[১] মান্নান সাহেবের সমগ্র যুক্তি-ধারার নির্গলিত অর্থ দাঁড়াল এই যে অনুবাদকর্মে বাস্তব কারণেই তাঁর মনে অনীহা জেগেছিল, তা ছাড়া তিনি ভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বড় একটা পরিচিত ছিলেন না। তাই ভিন্নভাষা ও সাহিত্যের দ্বারস্থ না হয়ে তিনি দেশজ রূপকথার ভাণ্ডার থেকে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করে যথাসাধ্য নিজ কল্পনাবলে 'রত্নবতী'র কাহিনী নির্মাণ করেছেন।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, 'রত্নবতী'র কাহিনীকে দেশজ গল্পভাণ্ডার থেকে গৃহীত উপাদান সহযোগে সৃষ্টি করা হয়েছে বলার পরও কি এর মৌলিকতার দাবী অক্ষুণ্ণ থাকে? থাকলে, ঐ মৌলিকতা কি ধরণের তা অবশ্যই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। মান্নান সাহেব তা করেননি। আসলে যে যুক্তি পরম্পরায় তিনি মৌলিকতার দাবী প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন সেগুলো কিছুটা যে পরস্পরবিরোধী তা মান্নান সাহেব খেয়াল করেননি। ইংরেজী ও সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে পরিচয়ের স্বল্পতা হেতু যেখানে ভিন্নভাষার রসভাণ্ডার থেকে উপকরণ নিয়ে গল্পরচনার ক্ষমতা মীর সাহেবের ছিল না, তখন ইচ্ছা থাকলেও তিনি অনুবাদ কর্মে সার্থকতা অর্জন করতে পারতেন না। এরূপ সিদ্ধান্ত কেহ গ্রহণ করলে তাকে কি দোষ দেওয়া চলে? তারপর অনুবাদের পক্ষপাতী হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটিও এখানে অবান্তর, কারণ মোশাররফের গল্পের কাহিনী যখন দেশে প্রচলিত কাহিনীর আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে বলে স্বীকার করা হয়েছে, তখন তিনিও তো অনুবাদকের মত কিছুটা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। সে যাই হোক, রত্নবতী গ্রাম্য রূপকথার প্যাটার্নে বাঁধা সাধুভাষায় রচিত একটি আখ্যায়িকা মাত্র, কোন মৌলিক কল্পনার ফসল নয় বলেই আমাদের মনে হয়। তবে এ কথা মেনে নিতে কোন

১। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃঃ ১৪৪।

আপত্তি থাকতে পারে না যে গল্পের ঘটনা, অবস্থা ও চরিত্রগুলোকে তিনি কিছুটা স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা যে কোন নিপুণ গল্পকথকই পুরাতন গল্প বলার সময় করে থাকেন।

এমন একটি দেশজ গল্পকাহিনীর বলয়াশ্রয়ী রচনার পক্ষে মৌলিক কল্পনার দাবী উত্থাপন করে কাজী সাহেব যখন বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মৌলিকত্ব সম্পর্কে কথা তোলেন, তখন আমরা একটু বিস্ময় বোধ না করে পারি না। সত্যবটে বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর তর্করত্ন সংস্কৃত, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষা থেকে অনুবাদের পথকে শ্রেয় করেছিলেন (যদিও বিদ্যাসাগরের কোন রচনাই যথার্থ অনুবাদ নয়, মূলাশ্রয়ী গদ্য আখ্যায়িকা মাত্র), কিন্তু ভূদেব অথবা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সে অভিযোগ অচল। তাঁরা দেশী-বিদেশী ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস পঠন-পাঠন লব্ধ জ্ঞানকে সার্থকভাবে নিজেদের সৃষ্টি কর্মে প্রয়োগ করেছিলেন মাত্র। মীর সাহেব শিল্পচেতনায় তাঁদের সমানধর্মা ছিলেন না। বাস্তব কারণেই ঐরূপ হতে পারেননি। মীর সাহেবের কৃতিত্ব এখানে যে শিক্ষা-দীক্ষার সীমাবদ্ধতা, সমাজ-প্রতিবেশের বিরূপতা সত্ত্বেও তিনিই প্রথম মুসলমান লেখক যিনি ব্যর্থতা ভয়ে হতোদ্যম না হয়ে অতি উত্তম সাধু গদ্যভঙ্গীতে একটি সুন্দর রূপকথা-জাতীয় কাহিনী রচনা করে লেখক জীবনের প্রায় সূচনাতেই সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। 'রত্নবতী' গ্রন্থের ভূমিকায় মোশাররফ হোসেন তাঁর প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াস সম্পর্কে যে সরল বক্তব্য রেখেছিলেন তা নিয়ে তাই এত বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ ছিল না। আমাদের বিবেচনায় 'রত্নবতী'র লেখকের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে এতে অনুসৃত বিশুদ্ধ সাধু গদ্য-ভাষাভঙ্গীতে, বর্ণনীয় বিষয়ের মৌলিকতায় নয়।

'রত্নবতী'র কাহিনী পরিকল্পনায় মৌলিকত্বের প্রশ্নটি তুলে মান্নান সাহেব নিজে যেমন বিচার-বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছেন, তেমনি আর এক বিভ্রান্তির দিকে পাঠকদের ঠেলে দিয়েছেন, যখন এর আঙ্গিক ও বিষয় প্রকৃতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে দিয়ে তিনি বলেন,

আধুনিক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি 'রত্নবতী' তা নয়। এতে রূপকথার কাহিনী জাতীয় একটি গল্প বলা হয়েছে। তবে, এর মধ্যে লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসার হয়তো কিছু প্রতিফলন ঘটেছে।[১০]

'রত্নবতী' রূপকথা জাতীয় রচনা, একথা তো পূর্বেই একাধিকবার বলেছেন। আর কেউ যে একে 'আধুনিক উপন্যাস' বলে দাবী করেছেন, তা আমাদের জানা নেই। তাহলে এরকম প্রতিবাদমূলক উক্তির অবকাশ কোথায়? আশ্চর্যের বিষয়, সে অবকাশ নেই স্বীকার করেও তিনি পরমুহূর্তেই এর মধ্যে লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটেছে বলে একটি দ্বিধান্বিত মন্তব্য যোগ করেছেন। 'রত্নবতী'র মত নিছক রূপকথা জাতীয় গ্রন্থে অন্যান্য রূপকথার মতোই নীতি শিক্ষা বা উপদেশ দানের একটা অনতিলক্ষ্য প্রয়াস হয়তো লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে রূপকথার মধ্যে একুশ বছর বয়স্ক নবীন লেখকের জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিফলন লক্ষ্য করার প্রচেষ্টা নিতান্তই অসঙ্গত ও হাস্যকর বলে বোধ হয়। অথচ মান্নান সাহেব দূরান্বয়ী কল্পনার আশ্রয়ে এই অতি অসঙ্গত, উদ্ভট ধারণাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে কি প্রাণপণ চেষ্টাই না করেছেন![১১] তিনি আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন, রূপকথার নায়ক "সুকুমার ও সুমন্তের বিতর্কের মধ্যে তরুণ শিল্পী হতো তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার জবাব খুঁজেছেন!"[১২] অহেতুক নতুন কথা বলার এ-প্রয়াস পরিহার করলে লেখক নিজের উপর যথেষ্ট সুবিচার করতে পারতেন বলেই আমরা মনে করি! তবু মনে প্রশ্ন জাগে 'রত্নবতী'র পণ্ডিত-সমালোচক এমন মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হলেন কেমন করে। তবে কি তিনি 'রত্নবতী'র প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় নামের সঙ্গে যুক্ত 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' অভিধাটি দেখে চিন্তা-দ্বৈধে পড়ে নিজের জন্য এ বিড়ম্বনা ডেকে এনেছেন? হয়তো তাই, হয়তো নয়।

১০। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃঃ ১৪৫।

১১। ঐ ঐ ঐ

১২। ঐ ঐ ঐ

মান্নান সাহেব 'রত্নবতী'র ভাষা-প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বইটিতে ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত ভাষা'।[১৩] এমত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তবে ভাষার ব্যাপারে বঙ্কিমের কাছে মোশাররফের ঋণের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে লেখকের যুক্তিও যথার্থ বলে মনে হয় না। মোশাররফ হোসেন তাঁর শিল্পীজীবনের কোন পর্বে আদৌ বঙ্কিম-প্রভাব মুক্ত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে। বঙ্কিম ও মোশাররফ হোসেনের সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হলেও, দুই অসমপ্রতিভার তুলনা অনেকটাই তাৎপর্যহীন বলে মনে হয়। সে যাই হোক, বাঙলা গদ্যের সমকালীন বিকাশধারার দিকে লক্ষ্য রেখে মান্নান সাহেব, মীর মোশাররফ হোসেনের জন্য যে কৃতিত্ব দাবী করেছেন, তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে প্রথম গ্রন্থেই মীর সাহেব 'বলিষ্ঠ এবং সুললিত ভাষা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন'। তাঁর পূর্বে কোন মুসলমান গদ্য লেখক ভাষার ঐ শিল্পসম্মত রূপ তৈরীতে সার্থকতা লাভ করেন নি। সঙ্গতভাবেই তাঁকে তাই বাংলা গদ্যের প্রথম মুসলমান গদ্যশিল্পী বলে আখ্যায়িত করা যায়। শুধু তাই নয়, 'রত্নবতী' গ্রন্থে মীর সাহেব সাধু গদ্য ভাষায় সাহিত্য রচনার যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তা আধুনিক বাংলা গদ্যের মুসলমান শিল্পীদের দিক নির্দেশে যথেষ্ট সহায়তা করেছে, তা মানতেই হয়। তবে আলোচনার উপসংহারে তিনি 'রত্নবতী' গ্রন্থের গল্প কথন ভঙ্গীর পক্ষে আধুনিকতার যে দাবী করেছেন, তা স্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবী রাখে। আর 'রত্নবতী'র কোন কোন চরিত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাও সুপ্রযুক্ত নয় বলেই আমরা মনে করি।

'রত্নবতী' সম্পর্কে ডঃ আনিসুজ্জামানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, অসম্পূর্ণ হলেও, নানা কারণে মূল্যবান। ডঃ মান্নানের আলোচনার তুলনায় এটি যেমন স্বল্প পরিসর তেমনি প্রায় সর্বপ্রকার বিচার-বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত। এটিকে পূর্ববর্তীর পরিপূরক অথচ স্বতন্ত্র প্রকৃতির আলোচনারূপে গ্রহণ করা

১৩। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃঃ ১৪৫।

উচিত। বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ না ধরে আনিসুজ্জামান প্রথম থেকে আপন সমালোচক-চৈতন্যকে জাগ্রত রেখে গ্রন্থটির সত্য মূল্য নিরূপণের চেষ্টা পেয়েছেন। প্রথমেই রচনা হিসেবে "অকিঞ্চিৎকর"[১৪] রূপে নির্দেশ করে তিনি রূপকথা জাতীয় এর উপাখ্যানের প্লট ও ভাষার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ রচনার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শনের জন্যেই বোধ হয় অতি সংক্ষেপে এর কাহিনীর সারসংকলন করেছেন। কাহিনীতে পুঁথির জগতের অতিপ্রাকৃতিক উপাদানের প্রাধান্য ও প্রভাবের কথা তিনি দৃষ্টান্ত সহযোগে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এক জায়গায় তিনিও মনে হয় বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। মান্নান সাহেবের ন্যায় তিনিও যখন 'রত্নবতী'কে রূপকথা জাতীয় উপাখ্যান বলে চিহ্নিত করেও মন্তব্য করেন, "নাম পত্রে" কৌতুকাবহ উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত হলেও উপন্যাসের লক্ষণ এতে নেই" অথবা "কাল ও স্থানগত পটভূমি বলেও রচনাটিতে কিছু পাই না—যা কিনা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য"[১৫] তখন সেই বিভ্রান্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ডঃ মান্নানের ন্যায় তিনিও যে 'রত্নবতী' নামের সঙ্গে যুক্ত "কৌতুকাবহ উপন্যাস" অভিধাটি দেখে বিভ্রান্ত হয়েই আলোচনায় অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, তা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধাই হয় না। অথচ 'রত্নবতী'র নামের সঙ্গে এ অভিধাটি অসঙ্গত ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে একথা আমরা বলতে পারি না। রত্নবতীর কাহিনীটি সত্যিই এক কৌতুকাবহ উপন্যাস অর্থাৎ কল্পকাহিনী। যে অর্থে আরব্য রজনীর বিখ্যাত গল্পগুলো 'আরব্য উপন্যাস'-রূপে চিহ্নিত, সে অর্থেই বটে। তাছাড়া রূপকথা জাতীয় রচনাকে উপন্যাস-রূপে চিহ্নিত করার রেওয়াজ একালে না থাকলেও, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে যে ছিল, তার প্রমাণ অপ্রতুল নয়। তাই আমাদের বিবেচনায় 'রত্নবতী' গ্রন্থের চারিত্র্য বিচারে এ বিভ্রান্তি অনিবার্য ছিল না।

'রত্নবতী' ডঃ সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের সমালোচনা মূলক বক্তব্য প্রায়শঃই সুসঙ্গত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ভাষা বিচারে, মনে হয়, প্রেক্ষিত

১৪। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃঃ ১৪৫।

১৫। ডঃ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' পৃঃ ২২২।

চেতনার অভাবে তিনি কিছুটা ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আলোচনার প্রায় গোড়াতেই লেখার ভাষাকে 'দুর্বল' বলে নির্দেশ করেছেন। পরে রচনা রীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রূপে এতে তৎসম শব্দের আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা এই শেষোক্ত উক্তিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করছি এবং তার সমর্থনে পাঠকের অবগতির জন্য আনিসুজ্জামান সাহেবের প্রদত্ত উদাহরণটিই এখানে তুলে দিচ্ছি :

> 'একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য সমাধানান্তর লোহিত বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইলেন।'[১৬]

এতে তৎসম শব্দের আধিক্য ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এ-ভাষাভঙ্গী যে 'সাগরী' গদ্যভঙ্গী অনুসরণের ফল তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। এ ভাষা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত সরল অনাড়ম্বর ভাষা থেকে যে অনেক দূরের বস্তু তাও স্বীকার্য। কিন্তু একে দুর্বল বলি কোন যুক্তিতে? কৃত্রিমতার অপবাদ যদি একে দিই, তাহলে বলতে হয়, বাঙলা সাধু গদ্য ভাষাটাই তো কৃত্রিম। সাহিত্যে এ-রীতির আবির্ভাবকে এককালে স্বাগত জানান হয়েছিল এবং তা যথেষ্ট ফলপ্রসূও হয়েছিল। সর্বপ্রকার আড়ষ্টতা মুক্ত ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন হয়ে বিদ্যাসাগরের হাতে এ-গদ্যভঙ্গী এমন একটা নমনীয়তা লাভ করেছিল যাতে পরবর্তীকালের শিল্পীরা ক্রমাগত পরিমার্জন ও পরিশীলনের মধ্য দিয়ে একে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য ভাবপ্রকাশক্ষম একটি বাহনে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মোশাররফ হোসেন বাঙলা সাধু গদ্যরীতির মহিমময় বিকাশের সূচনাপর্বে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ইত্যাদির কনিষ্ঠ সমসাময়িক রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যে কালে মুসলমান সমাজে সাধু বাংলা গদ্যের কথাতো দূরের কথা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার চর্চাই প্রায় গৌণ হয়ে উঠেছিল, সেকালে আধুনিক উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, মীর মোশাররফ হোসেন সাধু গদ্যভাষায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা

১৬। ডঃ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' পৃঃ ২২২।

করে যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তা সামান্য কৃতিত্ব নয়। মোশাররফের সেই কৃতিত্ব সমকালীন সুধীসমাজ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর 'রত্নবতী' গ্রন্থের বিষয়বস্তু যতই অকিঞ্চিৎকর মনে হোক না কেন, এর ভাষাভঙ্গী সর্বত্র বিশুদ্ধিতার জন্য প্রশংসিত হয়েছিল। 'রত্নবতী'র সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থের ভাষাভঙ্গীর তুলনায় এর ভাষাকে তো নিষ্প্রভ মনে হয় না! এ ভাষাভঙ্গীতে স্বকীয়তার পরিবর্তে অনুবর্তনের ছাপ স্পষ্ট, সন্দেহ নেই। কিন্তু নবীন লেখকের প্রাথমিক রচনা হিসাবে বিচার করলে এ-ভাষাভঙ্গীকে কোন মতে দুর্বল বলা চলবে না। আর মোশাররফ হোসেনও এই গদ্যভঙ্গীকে আঁকড়ে থাকেন নি চিরকাল। প্রতিভার ক্রম বিকাশ ও নিরন্তর অনুশীলন পরিশীলনের ফলে তাঁর গদ্যভঙ্গীও স্বাভাবিক বিকাশের পথে আত্মমহিমার সন্ধান খুঁজে পেয়েছিল পরবর্তীকালে। তাই 'রত্নবতীর' ভাষা সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের প্রাথমিক মন্তব্য প্রেক্ষিত চেতনা-বিরহিত-ও অযথার্থ বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

আনিসুজ্জামান সমকালীন 'ক্যালকাটা রিভিউ'-পত্রিকায় রত্নবতীর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সে আলোচনা থেকে কোন উদ্ধৃতি না দিলেও, তিনি জানিয়েছেন যে "সমালোচক বইটির প্রশংসা করেন নি, শেষে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, কোন হিন্দু লেখক মুসলমানের ছদ্মনামে এটি রচনা করেছেন।[১৭] অতঃপর তিনি মন্তব্য করেছেন, "সমালোচনার মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও শেষ বাক্যে এসে চমক না লেগে পারে না। [১৮] মুসলমান মীর মোশাররফ হোসেনের রচনাকে কোন আত্মগোপনকারী হিন্দু-লেখকের রচনা মনে করার এই হিন্দু-মানসিকতার মূল নির্দেশ করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান যথার্থ বলেছেন: "তখনো—যাকে বলা হয়, সাধু বাংলা ভাষা—সেই ভাষায় বাঙ্গালী মুসলমান লেখকেরা বিশেষ আত্মপ্রকাশ করে নি বলে এক্ষেত্রে তাঁদের প্রবেশ ছিল অপ্রত্যাশিত। তাই মোশাররফ হোসেন নামের অন্তরালে হিন্দু-লেখক আত্মগোপন করে আছেন বলে ধরে নেওয়া হল। এ মনোভাবের অপনোদন

১৭। ডঃ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' পৃঃ ২২২।
১৮। ঐ ঐ ঐ

করতে মোশাররফ হোসেন সমর্থ হয়েছিলেন—বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর এ-কীর্তি নগণ্য নয়।"[১৯] বস্তুত বাঙলা গদ্যের মুসলিম সাধনার ইতিহাসে 'রত্নবতী' নানা কারণেই একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। 'ক্যালকাটা রিভিউ'র সমালোচনায় গ্রন্থটির গুণের বিশেষ স্বীকৃতি না থাকলেও, পরোক্ষে এর ভাষা-সম্পর্কে প্রশংসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সমকালীন সমালোচনায় মুসলমান লেখকের বিশুদ্ধ বাঙলায় গ্রন্থ রচনার ক্ষমতায় অনাস্থার ভাব প্রকাশ পেলেও, যখনই কোন মুসলিম রচিত গ্রন্থের ভাষাগত সার্থকতা নজরে এসেছে, হিন্দুরচনার সঙ্গে তুলনা করে তার উচ্চপ্রশংসা করতেও অবশ্য সমালোচকের বাধেনি। 'রত্নবতী'র ঐরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। দুঃখের বিষয় একালের 'রত্নবতী'র সমালোচকগণ সে-সম্পর্কে অবহিত নন। যদি হতেন, তা হলে তাঁরা দেখতে পেতেন, রত্নবতীর সমালোচনায় তাঁদের পূর্বসূরী কিরূপ নির্ভুল প্রেক্ষিতে চেতনা ও রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। সামান্যতম অবান্তর কথা না বলে, 'রত্নবতী' গ্রন্থের ভাষা, বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গী সম্পর্কে যে সমালোচনা-মূলক বক্তব্য অন্তত একজন সমালোচক পেশ করেছিলেন, আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, তা আজও সকল বিচারের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে বলে মনে হয়। আমি বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বাঙলা গ্রন্থ সমালোচনার উদ্যোক্তা, বিখ্যাত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'[২০] ও রহস্যসন্দর্ভ'[২১] সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। রাজেন্দ্রলাল ১৯২৭ সংবৎ (১৮৭০ খ্রীঃ) এর 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রের ৫ম পর্বের,

১৯। ডঃ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' পৃঃ ২২২-২৩।

২০। ১৮৫১ সালে ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত মাসিক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। পত্রিকাটি অনিয়মিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল।

২১। ১৮৬৩ সালে 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' অভাব পূরণার্থ ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় রহস্যসন্দর্ভ নামে মাসিক পত্রটির প্রকাশনা শুরু হয়। এটিও অনিয়মিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

এই খণ্ডরূপে নির্দেশিত সংখ্যায় 'রত্নবতী' গ্রন্থের যে সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন তার প্রতি আমরা পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'রহস্য-সন্দর্ভ' আজ দুষ্প্রাপ্য; অনেকেরই হয়তো তা' পড়ে দেখার সৌভাগ্য কোনকালেই হবে না। তাই আমরা পাঠকের অবগতির জন্য নাতিদীর্ঘ সেই আলোচনার সবটাই সামনে তুলে ধরছিঃ "রত্নবতী। কৌতুকাবহ উপন্যাস। শ্রী মীর মসারফ হোসেন প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিও সমাদরের যোগ্য। ইহা একজন কৃতবিদ্য মুসলমান দ্বারা রচিত, অথচ ইহার রচনা কোন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতের বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। ফলে আমাদিগের বোধ ছিল মুসলমানেরা বাঙ্গালা লিখিতে পারেন না, এবং তাহার প্রমাণার্থে

'পহেলাতে বেছমেল্লা শুরু করি নামে আল্লাহ
সে নাম হেপ্ত শুন ২ ভাই।
আমেল ফাজেল তারে এরবিতে তরজমা করে,
মূর্খ লোকে তাহা বোঝে নাই।
শুন ভাই বেয়াদরি একারণ বাঙ্গালা করি,
লেখি আমি বুঝিবার তরে।"

ইত্যাদি "ইবলিস নামা"র ত্রিপদী মনে হইত। শ্রীযুক্ত মীর সাহেব সেই বোধের একেবারে নিরাকরণ করিয়াছেন। কি বর্ণশুদ্ধি, কি ব্যাকরণ, কি রচনাকুশলতা, সকল বিষয়েই গ্রন্থের সাধুতা হইয়াছে; উহার নাম পত্রে যাবনিক নামটি না থাকিলে আমরা অনায়াসে গ্রন্থখানি সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু দ্বারা বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতাম। বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে গ্রন্থে বর্ণবিন্যাসে সুসাধু সংস্কৃত শব্দের কুত্রাপি ভ্রম হয় নাই, অথচ গ্রন্থকারের আপন নামটি বাঙ্গালায় পরিশুদ্ধ লিখিতে পারেন নাই। যাঁহারা পারস্য ও আরব্য ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে মসারফ হোসেনের পরিবর্তে মুসর্‌রফ হুসেন লিখিলে শুদ্ধ মুসলমানী উচ্চারণের রক্ষা হইত।

সে যাহা হউক, গ্রন্থের রচনা-বিষয়ে শ্রীযুক্ত মীরসাহেব যেরূপ প্রশংসনীয়, উপন্যাস কথন বিষয়েও তিনি সেইরূপ আদরণীয়। তাঁহার রচনায় কুত্রাপি চমৎকারিতা নাই। "এক রাজার দুই স্ত্রী, দো আর সো" ইত্যাদি ঠাকুরমার গল্পের অনুকরণে সরল ভাষায় সরল প্রথায় গুজরাটাধিপের পুত্র ও তদীয় মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। ঐরূপ রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র যে কত শত সহস্র উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা ভার। পরন্তু আমাদিগের বোধে জগতের হিত সাধনার্থে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি ধনি-সন্তানেরা নিতান্ত অপদার্থ। তাহাদিগ-দ্বারা ভূমণ্ডলের একাংশও মঙ্গল সাধিত হয় নাই, অতএব তাহারা পৃথিবীতে না থাকিলেও মঙ্গল। পরন্তু গল্পের দ্যোতকার্থে তাহাদের একটি বিশেষ গুণ আছে, তাহা সহসা অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। নাটকেও নায়কতা সাধিতে তাহাদিগের তুল্য পাত্র আর নাই। বিশেষত বিবাহোন্মুখ ললনার পক্ষে রূপবান ধনবান সাহসী রাজপুত্রাপেক্ষা কোন ব্যক্তি বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে? এই প্রযুক্তই আমরা কখন কখন রাজপুত্রাদির নাম সহ্য করিয়া থাকি, এবং সেই সহিষ্ণুতাগুণে শ্রী মীর সাহেবের গল্পটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। মীর সাহেব সঙ্কল্পাবধি শেষ পর্যন্ত লোকপরম্পরা পিতামহী প্রদত্ত প্রথার অনুবর্তিতা রক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাতে আদর্শানুরূপ ফল লাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে। বাল্যকালের গল্পের শ্রবণে যেরূপ অনুরাগ ও তৃপ্তি জন্মে তাঁহার গল্প পাঠেও সেইরূপ ঘটে। অনাদর বা ক্লেশ বা অনুরাগের লাঘব হয় না। যাঁহারা আমাদিগের এ অভিমতে সম্মত না হন, তাঁহারা একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পরীক্ষা করিলে অনায়াসে আপন আপন নঞানুরাগ হইতে বিমুক্ত হইবেন।" (পৃঃ ৯৫—৯৬)

লক্ষ্য করার বিষয়, রাজেন্দ্রলাল 'রত্নবতী'র ভাষা ও রচনারীতির প্রশংসা করেছেন। তবে 'লোকপরম্পরা পিতামহী প্রদত্ত' প্রথার অনুবর্তিতা রক্ষা করে লেখক যে রূপকথা জাতীয় কাহিনী সৃষ্টি করেছেন, তাতে কোন চমৎকারিতা খুঁজে পাননি। এতৎসত্ত্বেও কথন-গুণে রূপকথা হিসাবে মীরের গল্পটি মোটামুটি সুখপাঠ্য হয়েছে বলে সমালোচক স্বীকার করেছেন। আসলে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রাদির গল্প শ্রবণে রাজেন্দ্রলালের মত বিদগ্ধ সমালো-

চকের কোন উৎসাহ ছিল না। তাঁর কাছে এই বইয়ের যা ভাল লেগেছিল তা হচ্ছে এর সাধু গদ্যভাষাভঙ্গী, যা নাকি সমকালীন মুসলমান কোন লেখকের রচনায় প্রত্যাশা করাই যেত না। বস্তুত, রাজেন্দ্রলাল যে 'ইবলিস নামা' পুঁথির ভাষার উল্লেখ করে সমকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের বাঙলা ভাষা-জ্ঞান সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন, মুসলমান সমাজ তখনও সেই আরবী-ফার্সী-হিন্দী শব্দ-বহুল প্রায়শ শিল্পশ্রীহীন মিশ্রভাষা ভঙ্গীকেই আঁকড়েছিল, বাঙলা সাধুগদ্যের নতুন রাজপথে তখনও তাদের অসঙ্কোচ পদচারণা শুরু হয়নি। মোশাররফ হোসেন সুললিত সাধু গদ্যে 'রত্নবতী' রচনা করে সর্বপ্রথম প্রমাণ করলেন সে মুসলমান লেখকও বিশুদ্ধ গদ্যে গ্রন্থ রচনার ক্ষমতা রাখেন এবং তা কোন গুণেই হিন্দুপণ্ডিত রচিত গদ্যের চেয়ে ন্যূন নাও হতে পারে। এখানেই মোশাররফের প্রধান কৃতিত্ব। তিনি প্রথম আবির্ভাবেই নিজ রচনার গুণে হিন্দু-সমাজের কাছ থেকে মুসলমান লেখকের বাঙলা রচনার ক্ষমতা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের 'রত্নবতী'—সমালোচনায়ই প্রথম অকুণ্ঠভাবে সে-স্বীকৃতি বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, এ কথা স্মর্তব্য। মোট কথা, 'রত্নবতী'র সমালোচনা করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল প্রেক্ষিত-চেতনা রক্ষা করে যে সব মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রত্যেকটি যুক্তিসহ ও নির্ভুল রসজ্ঞানের পরিচায়ক।

'রত্নবতী'র বর্ণনীয় বিষয় সমকালীন সাহিত্যরুচির বিচারে অকিঞ্চিৎকর ছিল সন্দেহ নেই। কারণ সে-সময় রূপকথার কুয়াসাচ্ছন্ন জগত থেকে বাস্তব-সমাজের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফিরেছিল অনিবার্যভাবে। 'রত্নবতী'র লেখক তখনও সে পরিবর্তনের তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেন নি। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজে আধুনিক জীবন-চেতনার উন্মেষ স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়েছিল। পুঁথির জগৎ থেকে একেবারে আধুনিক জীবনের চত্বরে প্রবেশ সম্ভব হয়নি। মোশাররফ হোসেন সাধু গদ্যে তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে রূপকথা জাতীয় আখ্যানভাগ আশ্রয় করে প্রাগ্রসর জীবন-চেতনার অভাবের পরিচয়ই দিয়েছেন। তবে এটা তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ প্রতিবেশের কথা স্মরণ রাখলে স্বাভাবিক

বলেই মনে হবে। এখানে সংক্ষেপে বলে রাখা যেতে পারে যে মোশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' প্রকাশের দু'এক বছর আগে পূর্ববঙ্গের লেখক আয়েন আলী শিকদার "বিধবা বিলাস"[২২] নামে সাধুভাষায় গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত ভঙ্গীতে যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, তাও রূপকাহিনীর সগোত্র। এরা কেউ প্রথাবদ্ধ গল্পের প্যাটার্নের আনুগত্য অস্বীকারের প্রয়াস পাননি। তবু ভাষার নবতর প্রয়োগ-নিরীক্ষার কথা চিন্তা করলে এঁরা যে শিল্প চেতনায় কিছুটা অগ্রগামিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা স্বীকার করতে হয়।

'রত্নবতী'কে সঙ্গতভাবেই মুসলিম শিল্পী বিরচিত সাধু বাঙলা গদ্যের প্রথম সার্থক গ্রন্থ বলে মনে করা যায়। এর আগে আর কোন মুসলমান লেখকই বাংলা সাধু গদ্য ভাষায় এতটা সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেননি। আয়েন আলী শিকদারের 'বিধবা-বিলাস' কিছুটা পূর্বগামী সৃষ্টি হলেও পুরোপুরি গদ্যে রচিত নয়; আর সে গদ্যও 'রত্নবতী'র ভাষার ন্যায় আড়ষ্টতামুক্ত নয়। বস্তুত 'রত্নবতী' বাঙলা গদ্যে মুসলিম সার্থকতার স্বর্ণসিঁড়ি রূপেই দেখা দিয়েছিল। ঐ সিঁড়ি বেয়েই মীর মোশাররফ হোসেন 'বিষাদ-সিন্ধু'র হর্ম্যচূড়ায় পৌঁছুতে পেরেছিলেন এবং অনুগামীদেরও উন্নত লক্ষ্যে পৌঁছুতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বাংলা গদ্যের মুসলিম সাধনার বিকাশ ধারায় 'রত্নবতী' তাই একটি দিক-নির্দেশক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য; কারণ 'রত্নবতী'র সরণি ধরেই একালের গদ্য-সাহিত্যে মুসলমানের প্রত্যয়দৃপ্ত আবির্ভাব ঘটেছে।

আমরা 'রত্নবতী' সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের উপসংহার স্বরূপ এবার সংক্ষেপে 'রত্নবতী'র আখ্যানভাগ তুলে ধরছি এবং এতে অনুসৃত গদ্য-ভাষারীতির নিদর্শন হিসেবে মূলের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। সুধী-পাঠক এ-থেকে 'রত্নবতী' সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা যেমন যাচাই করতে পারবেন, তেমনি নিজস্ব একটি ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন বলে আশা করি।

২২। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃঃ ১৩১-২৩৫। আয়েন আলী শিকদারের 'বিধবাবিলাস' গ্রন্থটির আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আখ্যান ভাগ

গুজরাট নগরের রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ছিল। একদা ধন বড়, না বিদ্যা বড়, এই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে দারুণ বিতর্ক উপস্থিত হয়। তর্কে এ প্রশ্নের মীমাংসার কোন সম্ভাবনা স্বদেশে নেই জেনে, উভয়ে এক অচেনা দেশে গিয়ে ধন ও বিদ্যা উভয়ের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে মীমাংসায় উপনীত হতে রাজী হলেন। কথানুযায়ী রাজপুত্র পশ্চিম দিকে এবং মন্ত্রিপুত্র পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন। বহু পথ পরিক্রমার পর রাজপুত্র একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে কোন বনের মধ্যে অবস্থিত এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হন। সেখানে কপি বেশধারী এক তপস্বীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাহাকে স্তুতিতে খুশী করে তাঁর কাছ থেকে একটি অভীষ্টদাত্রী অঙ্গুরীয় লাভ করেন।' তারপর ঋষির নিষেধ অমান্য করে পশ্চিম দিকে চলতে চলতে তিনি এক রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে ঐ দেশের অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী রাজকন্যা ব্রতবতী প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারবেন, তাকেই তিনি বিবাহ করবেন; যিনি সে চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হবেন তাকে আজীবন কারাভোগ করতে হবে। রাজপুত্র বিপদ জেনেও অভীষ্ট-দাত্রী অঙ্গুরীয়ের উপর ভরসা করে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে তার অভিলাষ পূরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অঙ্গুরীয়টির সাহায্যে তিনি সপ্তাহের পাঁচদিনই রাজকন্যার অভিলাষ পূরণে সমর্থ হলেন; কিন্তু ষষ্ঠ দিনে রাজকন্যা যখন তার হাতের অঙ্গুরীয়টি চাইলেন রাজপুত্র ভবিষ্যৎ জ্ঞানশূন্য হয়ে নির্বোধের মত তাই রাজকন্যাকে দিয়ে ফেলে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। ফলে সপ্তম দিনে রাজকন্যার প্রার্থনাপূরণে ব্যর্থ হয়ে সুকুমার রাজ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

এদিকে মন্ত্রিপুত্র সুমন্তও নানাদেশ ঘুরে একদিন ঐ একই সরোবরের তীরে উপস্থিত হয়ে কপিবেশী তপস্বীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁকে স্তবে তুষ্ট করে যথেচ্ছ রূপধারণের ক্ষমতা লাভ করেন। বুদ্ধিমান সুমন্ত লক্ষ্য

করেছিলেন যে সরোবরের এক প্রান্তের জলস্পর্শে তপস্বী মনুষ্যরূপ লাভ করেন, অপর প্রান্তের জলস্পর্শে তিনি কপি রূপ প্রাপ্ত হন। বিদায়কালে সুমন্ত ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ঐ দুই প্রকারের জল সংগ্রহ করেন এবং যথাসময়ে পশ্চিমাভিমুখে চলে রত্নপুরে পৌঁছে, রাজবাড়ীর পরিচারিকাদের কাছ থেকে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা জালে বদ্ধ বন্ধু সুকুমার সহ বহু রাজপুত্রের দুর্গতির কথা জানতে পান। তখনই সুমন্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে জীবন দিয়ে হলেও তিনি তাদের উদ্ধার করবেন। সুমন্ত কৌশলে রাজকন্যার স্নানের জন্য পরিচারিকারা যে জল নিয়ে যাচ্ছিল তাতে 'যে বারিস্পর্শে মনুষ্য শরীর কপি হয়' তার কিছুটা মিশিয়ে দিলেন। ফলে, রাজকন্যা স্নান করতে গিয়ে জলস্পর্শ করা মাত্রই বানরী রূপ ধারণ করে, তাকে ধরতে গিয়ে দাসীরা, এমন কি রাজমহিষীও, বানরী রূপ ধারণ করে। রাজা তাঁর পরিবারের এই দুর্গতিতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন এবং বিলাপ করতে থাকেন। তখন সুমন্ত বৃদ্ধ গণকরূপ ধারণ করে রাজার মনে এ অবস্থার প্রতিকারের ব্যাপারে ভরসা জাগান। রাজা তার শরণাপন্ন হলে তিনিই পরে সন্ন্যাসী বেশে দেখা দিয়ে পূর্বাহ্নে সুকুমার সহ সকলবন্দী রাজপুত্রের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়ে, সরোবর থেকে সংগৃহীত জলের সাহায্যে অন্তঃপুরিকাদের সকলকে মানবীরূপ দান করেন এবং সুকুমারের সঙ্গে রত্নবতীর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। সুকুমারের বাসরগৃহে সুমন্ত আত্মপ্রকাশ করলে সুকুমার সব বুঝতে পারে এবং নিজের ভুল স্বীকার করে। এদিকে সুমন্তের প্রতি খুশী হয়ে রাজা মন্ত্রিকন্যার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তারপর রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্ত কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস করে সস্ত্রীক স্বদেশে ফিরে আসেন।

'রত্নবতী'র ভাষার নিদর্শন'

ক. কিন্তু কালের কি আশ্চর্য গতি। মানুষের সৌভাগ্য শশী কখনই সমভাব থাকে না। সময়ে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজকুমার সুকুমার এবং মন্ত্রিকুমার সুমন্তের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।

[প্রথম পরিচ্ছেদ, প্রথম অনুচ্ছেদ]

খ. ইতস্তত নগরের সুচারু শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাজনন্দন সুকুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন সখে! বল দেখি, ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ? মন্ত্রিপুত্র হাস্য করিয়া বলিলেন, বন্ধো! ইহা আর জিজ্ঞাস্য কি? ধন অপেক্ষা বিদ্যা সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ।

গ. ধনীদিগের অন্তঃকরণ সর্বদাই অসুখী; কেননা, তাহারা কুসংস্কারের ক্রীতদাস। সামান্য বিষয়েই তাঁহারা উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হন। আপনি কি বিবেচনায় বিদ্যা অপেক্ষা ধনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বোধ হয় প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

[প্রথম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় অনুচ্ছেদ]

ঘ. এই ভাবিয়া তিনি একাদিক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বিংশ দিবস নানা বন উপবন ও পর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে একটি অপূর্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য অভিনব বস্তু, মানবমণ্ডলী ও নগরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দেখিলেন, সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশদ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে··· ।

[প্রথম পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ]

ঙ. সুকুমার সমস্ত রজনী চিন্তা শয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার সুকুমার মুখচ্ছবি লাবণ্যহীন হইল। নিশাপতি তাঁহারই বদন-প্রতিমা ধারণ করিয়াই যেন মনোদুঃখে লুক্কায়িত হইলেন। রাজপুত্র রাজপুত্রীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, পাখীরা যেন সেই কথা বলিয়াই কলরব করিয়া উঠিল।

[প্রথম পরিচ্ছেদ, একবিংশ অনুচ্ছেদ]

চ. পাঠক মহাশয়! রাজকুমার সুকুমার রত্নপুরের কারাগারে থাকুক, আসুন, আমরা মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের অন্বেষণ করি। তিনি কোথায়? আসুন, দেখিতে পাইবেন। স্মরণ থাকিতে পারে, মন্ত্রিতনয় পূর্ব দিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম অনুচ্ছেদ]

ছ. একটি কিঙ্করী উত্তর করিল, মহাশয় আমাদের রাজার নাম রত্নধ্বজ, তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছেন। সেইটিই আমাদের মহারাজের একমাত্র সন্ততি! রাজা ও রাণী সেই কুমারীটিকে অতিশয় ভালবাসেন। কন্যার নাম রত্নবতী।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তৃতীয় অনুচ্ছেদ]

জ. রাজা সভামণ্ডপে বসিয়া অমাত্যবর্গ সমভিব্যহারে বিচার করিতেছেন, এমন সময় চতুরা দাসী রোদন-বদনে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, ধর্ম্মাবতার! ওদিকে সর্বনাশ উপস্থিত! রাজমহিষী, রাজকন্যা এবং তাঁহার সখিগণ সকলেই বানরী হইয়াছেন। পুরী মধ্যে জনমানব নাই, কেবল বানরী দলে পরিপূর্ণ। মহারাজ! শীঘ্র চলুন, স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উদ্ধারের উপায় করিবেন।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, সপ্তম অনুচ্ছেদ]

ঝ. দৃষ্টি আর ফিরিল না। উভয়ের চিত্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয়হিল্লোল বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ু প্রতিঘাতে বেলাকে আঘাত করে, সেইরূপ তাহাদিগের দুঃখ-জলধি চিন্তাবায়ুর প্রতিঘাতে স্ফীত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পঞ্চবিংশ অনুচ্ছেদ]

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি

মানব-সমাজ বিকাশের ধারা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই একই কালে নানাস্তরের সমাজ ও সংস্কৃতি পাশাপাশি অবস্থান করছে। এই বিভিন্ন স্তরের সামাজিক বিকাশের মধ্যে উচ্চতার অসমতা কত বেশি হতে পারে, তা আমরা বুঝতে পারি, যখন দেখি এর এক প্রান্তে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আদি অকৃত্রিম জনসমাজ অপর প্রান্তে হিমালয়ের উত্তুঙ্গতা নিয়ে আধুনিককালের কৃত্রিম যন্ত্র-সমাজ। সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় যাকে বলে Folk-sophisticate polarity অর্থাৎ প্রাকৃত জনসমাজ ও যান্ত্রিক জনসমাজের মেরুর ব্যবধান, সেটাই তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত প্রাকৃত জনসমাজ ও আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সমাজ, এ দুইয়ের চারিত্র্য এতই পৃথক যে এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে বলেই মনে হয় না। একের বন্ধন জৈবিক, অপরের যান্ত্রিক, জনসংস্কৃতি এই জৈবিক জনগোষ্ঠীরই সংস্কৃতি। গোষ্ঠীভুক্ত সকলের প্রত্যক্ষ মানসিক সম্পর্ক, আত্মিক সংযোগ ও গভীর আন্তরিকতার মধ্যে নিহিত থাকে এর প্রাণরহস্য। পরিধি এর স্বভাবতই সংকীর্ণ; কিন্তু প্রাণশক্তি প্রাকৃতিক প্রস্রবণের মতন চিরপ্রবহমান। মানব বিজ্ঞানী ক্রোবার (A. L. Kroeber) এর মতে :

"The relatively small range of their culture-content the close knitness of the participation in it, the very limitation of scope, all make for a sharpness of patt-

erns in the culture, which are well-characterised, consistent and inter-related."[১]

অর্থাৎ সাংস্কৃতিক-উপকরণের অপেক্ষাকৃত স্বল্লায়ত পরিধিতে সমষ্টিগত ভাবনাবৃত্তে বিচরণশীল বলে এবং এর প্রসারণ-ক্ষেত্র নিতান্ত সংকুচিত বলেই জনসংস্কৃতির রূপ সকল দেশেই অতি সুচিহ্নিত, সুসঙ্গত ও সুসংবদ্ধ হতে দেখা যায়। কথাটা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম দেখি না। এখানে তার আদি অকৃত্রিম রূপ নানা কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। যন্ত্রযুগের প্রবর্তনার পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসংস্কৃতির চারিত্র্যও অক্ষুণ্ণ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যন্ত্র-লালিত নাগরিক-সভ্যতার তরঙ্গাভিঘাতে সে-সবদেশের গ্রামীণ-জীবন বিধ্বস্ত হতেই, গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারাটি আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল। বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি এ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি তার দীর্ঘকাল পরেও। কারণ এদেশে যন্ত্রযুগের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে, উনিশ শতকের প্রায় অন্তিম লগ্নে। তারপর যন্ত্রযুগের প্রবর্তনায় যে নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাও বহুদিন নিছক নগর-কেন্দ্রিকই থেকে গিয়েছিল। তার তরঙ্গাভিঘাত এত মৃদু গতিতে গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিল যে গ্রামীণ জনসংস্কৃতির ধারাটিকে সহসা কলুষিত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য ভিন্নতর কিছু কারণও এর পিছনে কাজ করেছিল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশের আনুকূল্যে সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'জাতি-বর্ণ-ধর্ম চক্রগত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তবন্ধন' বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, তা এতই দৃঢ়মূল ছিল যে বাইরের কোন আঘাত বা আকর্ষণ তাকে সহসা কেন্দ্রচ্যুত করতে পারেনি। বহির্বিশ্বের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ-বিরহিত ছিল বলে এক ধরনের কূপমণ্ডূকতা তার স্বভাবগত হয়ে পড়েছিল। এই কূপমণ্ডূকতা, যা এক ধরনের প্রচণ্ড সংরক্ষণশীলতা, তাকে চিরকাল কেন্দ্রাভিমুখী করে রেখেছিল,

---

১। A. L. Kroeber : Anthropology, Second Indian Reprint, 1972. P. 282.

কেন্দ্রাতিগ হতে দেয়নি। বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির দীর্ঘস্থায়িত্বের মূলে কাজ করেছে এমনি নানা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ। তাই তো দেখি বিশ-শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকেও এতে কোন মারাত্মক ভাঙন দেখা দেয়নি। তবে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে বহু অপেক্ষিত পরিবর্তন-সম্ভাবনাকে আর রোধ করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্র ধরে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভ জাতীয় মনে সঞ্চারিত হয়েছিল তাই পরবর্তী দশক-গুলোতে অস্থির পরিবর্তন-কামনায় রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়েছিল আমাদের সামাজিক অচলায়তনের উপর। ফলে অচল, অনড় গ্রাম্য-সমাজ-কাঠামোর ভিত নড়ে উঠেছিল। কালের ইঙ্গিতেই যেন যন্ত্রযুগের দোসর 'নবযুগের নগরের ভূত' ও 'কারখানার ব্রহ্মদৈত্য' গ্রাম বাংলার কাঁধে ভর করতে শুরু করল। ফলে বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির ধারাটি আর নিষ্কলুষ রইল না, তা ক্রম-বিশীর্ণ হয়ে আপন মহিমা হারাতে বস্‌ল। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এসে আমরা যখন দেখি এর উৎস শুষ্কপ্রায়, তখন তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না, কারণ, বিলম্বিত হলেও, যন্ত্রযুগের ব্যাপক প্রসারের এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণাম।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন এমন এক কালে, যখন বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি ছিল অতিমাত্রায় প্রাণবন্ত, সর্বগ্রাসী যান্ত্রিক নাগরিক সভ্যতা তখনও তেমন তৎপর হয়ে ওঠেনি, তার বৈভব কেড়ে নেওয়ার জন্য। গ্রামলক্ষ্মীর কাছ থেকে তার ঐশ্বর্য অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল, আর সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হন নি তিনি। যৌবনে কার্যব্যপদেশে কলকাতার 'ইষ্টকাকীর্ণ পরিবেশের বাইরে, বাংলাদেশের পাবনা, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলার পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক সফরকালে তিনি দেশের জনসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। বহুদিন পল্লীর সাদামাটা মানুষগুলোর মধ্যে বাস করে, তাদের জীবনগঙ্গায় অবগাহন করে তিনি এর অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এ পরিচয় কবির শিল্পীজীবনের পক্ষে এক মহা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল পরবর্তীকালে। পল্লীর উদার মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ

রুদ্ধশ্বাস শহুরে পরিবেশ থেকে বাইরে এনে তাঁকে দিয়েছিল মুক্তির এক নতুন স্বাদ। পল্লীমানুষের ধ্যান, চিন্তা, অনুভব ও কর্মের জগতে তিনি পেলেন তাঁর শিল্পী-আত্মার জারক রস। মোটকথা গ্রামীণ জীবন তথা জনসংস্কৃতির সাথে এই অন্তরঙ্গ যোগ রবীন্দ্রসাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক জীবনমুক্তির পথকে নিশ্চিতরূপে প্রশস্ত করেছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভা আজীবন পুষ্টি খুঁজে পেয়েছে এই জনসংস্কৃতির কাছ থেকে, শক্তি সঞ্চয় করেছে এর রসধারা থেকে। রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে বিচিত্র বর্ণালির সঞ্চারণে এর ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা রসিক-সমালোচকগণ নির্ভুলভাবেই নির্দেশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

বস্তুত জনসংস্কৃতির পথ ধরেই বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দর মহলে প্রবেশ করার তাগিদ রবীন্দ্রনাথ বোধ করেছিলেন তাঁর শিল্প-সাহিত্যসাধনার প্রায় উষা লগ্নেই। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে: যেকালে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই ছিলেন ইংরেজী-অভিমানী, মাতৃভাষার প্রতি বিরূপ এবং কতক পরিমাণে স্বজাতিদ্রোহীও বটে, ইউরোপীয় স্বাদেশিকতার মৌখিক বুলি কপ্চানোর মধ্যেই পর্যবসিত ছিল যাদের দেশপ্রেম, সমাজ পারিপার্শ্বিকের থেকে প্রায় তাদের অন্তর্গত হয়েও রবীন্দ্রনাথ কেমন করে গণ্ডী কাটিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দর মহলে প্রবেশের তাগিদ আদৌ বোধ করতে পারলেন? এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর: রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি-প্রেম, যে প্রেমের জন্ম হয়েছিল জনসমাজের মনে প্রবেশ লাভ করার শিল্পীসুলভ এক মানবিক আকাঙ্ক্ষা থেকে, সেই স্বজাতি-প্রেমই কবিকে দিয়েছিল এই আন্তর-প্রেরণা। বস্তুত জনসংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের উৎস ঐ স্বজাতি-প্রীতি। রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রীতির উন্মেষে, যে ঠাকুর পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন, সে পরিবারের দান ছিল অপরিসীম। এই সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন:

"তখন শিক্ষিত লোকেরা দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।"[২]

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: জীবনস্মৃতি, বিঃ সং, ১৩৬৩।

এই উক্তি থেকে এ-সত্য স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে যে পারিবারিক প্রভাবে আশৈশব রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগ বোধ করেছিলেন, তাই তাঁকে স্বদেশ ও স্বজাতির কথাও ভাবতে শিখিয়েছিল। ঐজন্যই তিনি 'ইংরেজী-বাগীশ' বাঙালীর রচিত সাহিত্যের 'সুয়োরাণী' অপেক্ষা প্রকৃত দেশজ ভাব ও ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যের 'দুয়োরাণী'-কেই বেশি আপনার করে চিন্‌তে পেরেছিলেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে 'হিন্দুমেলা, সংগঠনের মধ্য দিয়েও এক ধরনের স্বাদেশিক চেতনা দেখা দিয়েছিল। অনেকটা তারই প্রেরণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন বাংলাদেশের ক্রমবিলীয়মান জনসংস্কৃতির লুপ্তরত্নোদ্ধারের কাজে। তারপর, অষ্টাদশ শতকে সুইডেনে লোকসংস্কৃতি চর্চার যে নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছিল ক্রমঃপরিপুষ্টির ধারায় তার ঢেউ উনিশ শতকেই ইংলণ্ড হয়ে আমাদের দেশেও পৌঁছয়। রবীন্দ্রনাথের মনে তারও কথঞ্চিৎ প্রভাব কাজ করলে, বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবে তার পূর্বে থেকেই ঠাকুর পরিবারে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার যে একটা উদার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তাই যে রবীন্দ্রনাথের জনসংস্কৃতি চর্চার মূলে বড় রকমের প্রেরণা যুগিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এখন দেখা যাক, বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির প্রতি কবির আগ্রহ, তাঁর অনুভব ও কর্মে কতটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একথা অবশ্যই বলা বাহুল্য যে 'প্রাকৃত জনের ভাব ও ভাষার, কীর্তি ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভের ব্যাকুলতা'ই তাঁকে জনসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এ আকর্ষণ যে একটা সাময়িক আবেগমাত্র ছিল না, তা এক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক কর্মোদ্যোগ থেকেই বুঝা যায়। তিনি দীর্ঘকাল ধরে একদিকে পুরাতাত্ত্বিক ও মানব-বিজ্ঞানীর ন্যায় বাংলার জনসংস্কৃতির নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন, তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের প্রয়াস পেয়েছেন, অপর দিকে ছড়া, ব্রতকথা, গ্রাম্যগাথা ও গানের ভাব-ভাষার অনায়াস ব্যঞ্জনা মাধুর্য ও সারল্য, ছন্দ ও সুরের অপরূপ সঙ্গতি, তার দেশীয় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় সত্তাকে নতুন যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির পাথেয় রূপে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে-সাহিত্য-সঙ্গীতে জাত

লোকশিল্পীর যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায় তার উৎস এইখানে। প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, জনসংস্কৃতি চর্চার এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। বাড়ীতে দাদাদের সস্নেহ সহযোগিতা তো পেয়েছেনই, বাইরেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, জসীমউদ্‌দীন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতি অনুরাগীদের বিভিন্ন সময়ে সহযাত্রী ও সাথীরূপে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় যেমন অনেকে এই পথে এসেছিলেন, অনেকে আবার হৃদয়ের আগ্রহেই কাজে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের কারো কারো সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছিলেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মত দার্শনিককে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আকৃষ্ট করেছেন। মনে হয়, লোকশিল্পের প্রতি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ব্যাপক আগ্রহের মূলেও কাজ করেছিল রবীন্দ্রনাথেরই প্রেরণা।

এই হিসেবে কিন্তু জনসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে এককব্রতী বলা চলে। অধিকাংশ জনসংস্কৃতি-অনুরাগীর কর্ম-প্রচেষ্টা যেখানে লোক-সাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ ও সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ, সেখানে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ মানব বিজ্ঞানীর ন্যায় তার মধ্য দিয়েও জাতির সত্যিকার ইতিহাস অনুসন্ধানে তৎপর, সাহিত্য-রসিকের মত তার রসমাধুর্য-বিশ্লেষণে উৎসাহী, তার ভাষা ও ছন্দের, ভাব ও রসের প্রয়োগে নবযুগের বাংলা-সাহিত্যকে আরও সমুন্নতি ও ব্যাপ্তি দানে প্রয়াসী। সত্যের অনুরোধেই তাই বল্‌তে হয়, জনসংস্কৃতির চর্চায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে তুলনাহীন।

ঠিক কবে থেকে রবীন্দ্রনাথ জনসংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন, তা বলা কঠিন। তবে যতদূর জানা যায়, ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'সংগীত সংগ্রহ' নামে বাউল গানের একটি সংকলন গ্রন্থের সমালোচনার মধ্য দিয়েই এক্ষেত্রে তাঁকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। বাউল গানের এই সমালোচনা-প্রচেষ্টা থেকে, এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে

পূর্বাহ্ণেই তাঁর কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি ছিল। "বাউলের গানগুলি তার উপর সোনার ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিল।" [৩] শ্রীবিনয় ঘোষ এই সংগ্রহের

আমি কে তাই আমি জান্‌লেম না,
আমি আমি করি, কিন্তু আমি আমার ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি—

গানটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, "গানটি রবীন্দ্র-চিন্তার বিশ্বমুখী অভিযানে নিভৃত নাবিকের কাজ করেছে।" উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত এই বাউল গানগুলোর মধ্য দিয়ে এক রহস্যময় জগতের দ্বার খুলে গিয়েছিল তাঁর কাছে। তিনি পেয়েছিলেন অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশের স্বর্ণসিঁড়ির সন্ধান। তাই অচিরেই যখন,

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে—

গানটির মধ্যে উপনিষদের 'অন্তরতর যদয়মাত্ম' বাণীকে বাউলের মুখে 'মনের মানুষ' বলে শুনলেন, তখন সে অভিজ্ঞতা অপরূপ হয়ে বেজে উঠেছিল তাঁর প্রাণে। অনন্তের সাথে মিলন ব্যাকুল সমগ্র মানবতার কান্নাই যেন ব্যঞ্জিত হয়ে ফিরছিল গানটির সহজ সরল সুরে। কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

"অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুন্‌লুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাকেই সকলের চেয়ে না জান্‌বার বেদনা-অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু—তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে।" [৪]

৩। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড, বিনয়ঘোষ রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোক সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ পৃঃ ৬৮ দ্রষ্টব্য।

৪। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন: হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা।

বস্তুত বাউল গানের সরণি ধরে অগ্রসর হয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-ব্যাপী অধ্যাত্ম উৎকণ্ঠার অনেক সন্তোষজনক সমাধান সূত্র আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন, তথা ধর্মচিন্তায় বাউল প্রভাবের সূত্রপাত এখানেই হয়। এই বাউল গানের মধ্য দিয়েই তিনি জন-হৃৎপদ্মে বিরাজমান গ্রাম্যসাহিত্যের ঐশ্বর্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন।

মোটকথা বাউল-সঙ্গীতের সাথে প্রাথমিক পরিচয় ব্যপদেশেই, বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার বাসনা কবিচিত্তে জাগে। এরপর থেকেই আমরা কবিকে লোকসাহিত্যের নানা নিদর্শন সংগ্রহ ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে দেখি। ১৩০১ সালে 'সাধনা' পত্রিকায় দুই পর্যায়ে 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' সম্পর্কে একটি অতি সরস নিবন্ধ প্রকাশ করেন; প্রবন্ধের শেষে তিনি ৮১ টি ছড়ার একটি সংগ্রহ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ১৩০১-২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তাঁর 'মেয়েলী ছড়া'র সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ১৩০২ সালে সাধনাতে প্রকাশিত হয় শ্রীকেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত' লুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনারূপে লিখিত কবিসঙ্গীত নামে আর একটি প্রবন্ধ, তারপর 'গ্রাম্য সাহিত্য শীর্ষক আরও একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এসব ছাড়া ১৩২২ সালের প্রবাসী'তে হারামণি বিভাগে তাঁর সংগৃহীত কুড়িটি লালনের গান প্রকাশিত হয়েছিল। সংগ্রহ ও সমালোচনা ছাড়া এই সময়ে তিনি জাতীর চিত্তে লোকসাহিত্যের রসধারা সঞ্চারিত করে জাতিকে আপন যথার্থ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। লোকসাহিত্য সংগ্রহ কাজে অপরকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি একজন মানববিজ্ঞানীর ন্যায় জনসংস্কৃতির সাথে একালের শিক্ষিত জনগণের নিবিড় পরিচয় সাধনের জন্য জাতিবিদ্যা ও নৃবিদ্যা চর্চার আবশ্যকতার কথা তিনিই প্রথম দেশবাসীকে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৩১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন,

তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'মেয়েলি ব্রত' ও দীনেন্দ্রকুমার রায় অঙ্কিত বাংলার পালাপার্বণের উজ্জ্বল চিত্রগুলো রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের উৎসাহ দিতে তিনি যেমন কার্পণ্য বোধ করেন নি, তেমনি দ্বিধা করেন নি লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজে অঘোরনাথের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ একজন মহৎ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির মত এক্ষেত্রে আপনার যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

লোকসাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সমালোচনাতেই যে রবীন্দ্রনাথের জনসংস্কৃতিচর্চা সীমায়িত থাকে নি, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। রবীন্দ্রনাথ এটা ভাল করেই জানতেন যে সকল সুসমৃদ্ধ জনসংস্কৃতিরই যেমন একটি ভাবগত ভিত্তি আছে—যার পরিচয় পাওয়া যায় লোকসাহিত্যে, তেমনি আছে একটা বস্তুগত ভিত্তি—যা লোকশিল্পীর নানাবিধ শিল্পকর্মে সদা প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির এই দিকটি সম্পর্কেও যে সক্রিয় চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্ট সংবাদ পাই কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার প্রদত্ত বিবরণ থেকে। সে ১৯১৫-১৬ সালের কথা। শিলাইদহের পদ্মাবক্ষে কবির সাথে কিছুদিন কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। প্রসঙ্গক্রমে একদিন কবি তাঁকে কিছু লোকশিল্পের সংগ্রহ দেখিয়ে নাকি বলেছিলেন:

"আমি কিছুদিন যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি; বাংলার নিজস্ব আর্ট আইডিয়া ক্রমেই বিদেশী প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পর আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি"।[৫] মোহিতলাল তারপর লিখেছেন:

"চাহিয়া দেখিলাম এক জায়গায় কয়েকটি মাটির ঘরের মডেল, তাহাদের খড়ের চালের বিবিধ ষ্টাইল লক্ষণীয়; বুঝিলাম, কবি এ ঘর ছাওয়ার

৫। মোহিতলাল মজুমদার: রবি-প্রদক্ষিণ, ১৩৫৬; 'গঙ্গাবক্ষে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায় পৃঃ ১৭৪-৫ দ্রষ্টব্য।

মধ্যেই যে শিল্পচাতুর্য আছে তাহাই বাঙালীর নিজস্ব বলিয়া গৌরব বোধ করেন। পাশেই কতকগুলি কাঁথা রহিয়াছে, তাহাদের সেই সূচীকর্ম সত্যই মহার্ঘ্য বলিয়া মনে হয়। স্মরণ হইতেছে, কতকগুলি শিকাও বোধ হয় ছিল, রজ্জুশিল্পের নিদর্শন বলিয়া তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—মোটা ব্রাউন পেপারের একটি তবক, সেগুলিতে আলিপনার নানা নক্‌সা অতি সরল স্থূলরেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলির প্রতি কবির মমতা যেন কিছু অধিক ; ইহাই বাংলার প্রকৃতিরূপা গৃহলক্ষ্মীদের স্বহস্তরচিত কারুসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাহাদের পরিকল্পনায় ফুল, লতা, পাতা, পাখী ও নানা নিত্যপরিচিত রূপাবলীর যে সুষমা-বিন্যাস, তাহাই সত্যকার শিল্পীমনের পরিচায়ক। সবচেয়ে মুগ্ধকর তাহাদের সেই অতি সরল ও সাবলীল রেখাঙ্কন—যেন শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ একেবারে মন হইতে অঙ্গুলিপ্রান্তে পৌঁছিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আলপনা শিল্পকে ধরিয়া রাখিবার এই কৌশলটিও অভিনব বলিয়া মনে হইল—কবিপ্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ যেন তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।”[৬]

মোহিতলাল প্রদত্ত এ বিবরণ থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লোক-সাহিত্যের ন্যায় লোক-শিল্পকর্মের নিদর্শন বা নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারেও কবির উদ্যমের অভাব ঘটেনি। তিনি নিজে যেমন এ-সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, অন্যকেও তেমনি একাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত কবির চিঠির বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনারত ডঃ দাশগুপ্তকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, চাটগাঁ অঞ্চলের মেয়েলি শিল্পের নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করতে, বিশেষ করে আল্‌পনা, শিকে, কাঁথা, কুড়ে ঘরের ফটো বা মডেল, মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজের নিদর্শন সংগ্রহের জন্য। ২৩ বছর বয়স থেকে ৫৪—

৬। মোহিতলাল মজুমদার : রবি প্রদক্ষিণ, ১৩৫৬ ; 'গঙ্গাবক্ষে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়, পৃঃ ১৭৪—৫ দ্রষ্টব্য।

৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবে তিনি জনসংস্কৃতির বিচিত্র সৃষ্টিক্রিয়ার নিদর্শন সংগ্রহ করে, এর প্রতি আপনার তীব্র আকর্ষণ ও মমত্ববোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।

লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ এবং সে-সবের যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির সাথে যে নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন, তা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি-চেতনাকে অনেকটাই পরিপুষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যে বাংলাদেশের প্রাণের সাথে যে নিগূঢ় যোগের অনুভব লক্ষ্য করা যায়, বস্তুত; তাঁর মূলে কাজ করেছে বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির সাথে তাঁর ব্যাপক ও গভীর পরিচয়ের সূত্রটি। লোকসাহিত্যে বিম্বিত অনায়াস, স্বচ্ছন্দ গতি লোকজীবনের ছবি কবিকে বস্তুভার-মুক্ত জীবনের স্বস্তি ও মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে, লোককবির সহজ, সরল ও অকপট অধ্যাত্ম-ভাবনা, অধ্যাত্ম-জীবনে শ্রদ্ধাশীল কবিকে শাস্ত্রাচারের গণ্ডির বাইরে মানব-সত্যকে সহজভাবে উপলব্ধি করার পথ দেখিয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসীম-সঞ্চারী অনুভবের গূঢ়তায় লোকসঙ্গীতের অন্তর্গূঢ় ভাবানুভূতির ছায়াপাত ঘটেছে। লোকসঙ্গীতের সুরধারার মূর্চ্ছনাও তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শোনা যায়। লোককাব্যের ছন্দ, লোকসঙ্গীতের রাগরাগিণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও ছন্দে নতুন তরঙ্গদোলা সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত লোকশিল্পীর রেখাঙ্কন নৈপুণ্য কবির চিত্রকলার আঙ্গিকের প্রেরণা যুগিয়েছে। শুধু কি তাই, লোকসাহিত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত বাংলাভাষার শব্দলোকে প্রবেশ করে 'খাঁটি বাংলাভাষার যাদুকর স্রষ্টা' হতে পেরেছেন। এছাড়া লোকায়ত সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই তিনি এদেশের লোকসমাজের প্রকৃত ইতিহাস জানতে শিখেছিলেন, একজন মানব বিজ্ঞানীর ন্যায়। রবীন্দ্রসাহিত্য যে বাংলাদেশের প্রাণের জিনিস হয়ে উঠতে পেরেছে, তা লোকজীবনের সাথে কবির গভীর ও ব্যাপক সংযোগের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির অনেক প্রবাহই এসে রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারায় মিলেছে সন্দেহ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছে, বোধ হয়, বাংলাদেশের বাউল কবিরা। সর্ববন্ধনহীন,

সংস্কার, প্রথা ও আচারের দাসত্ব হতে মুক্ত বাউল সাধকদের অধ্যাত্ম সাধনা, মানবতাবাদী অধ্যাত্ম রসপিপাসু রবীন্দ্রনাথের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে বাউল প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। 'লোকমানসের প্রতিমূর্তি' বাউলের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁর কাব্য-সঙ্গীত, গল্প-উপন্যাস ও দার্শনিক প্রবন্ধের 'বিচিত্র ভাবরসের তরঙ্গশীর্ষে' বার বার। বাউল কবি তাঁর ধর্ম-দর্শন চিন্তার দিগদর্শনীতে অনেকটাই যেন পথ নির্দেশকের কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন 'মানবধর্ম, যার মূলকথা' infinite defined in humanity', তার সহজ ব্যাখ্যা বাউল কবির 'মনের মানুষে'র অনুধ্যানে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তাই তো বাউল তাঁর আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। আর এই জন্যই বোধ হয় তাঁর সাহিত্যকর্মের যত্রতত্র এই বাউলকে উপস্থিত দেখতে পাই। 'গোরা' উপন্যাসে দেখতে পাই 'কাজের শহর কঠিন হৃদয়' কলকাতার রাস্তার ধারে আলখাল্লা-পরা বাউল উপস্থিত; তার কণ্ঠে অন্তর ব্যাকুলকরা গান ঃ

খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং 'ফাল্গুনীর' অন্ধ বাউলও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগী ও অন্ধ বাউলের নৃত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের জীবনের আনন্দের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। এই বাউলের স্মৃতিই মন্থন করে তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

"আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

'কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে··· ···'

কথাটা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।"[৭]

৭। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঃ হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,), রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা।

আমার শিলাইদহের গঙ্গার তীরে বাউল সাধকদের একতারা হাতে চলার দৃশ্য অমর হয়ে আছে কবির কবিতায়—

"কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে।
যে নদীর নেই কোন দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেল্‌তে।
দেখেছি এক তারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।"

বাউল দর্শনের যে জিনিসটা কবির সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তা হচ্ছে তাদের "'সমস্ত সামাজিক সংস্কার, বিধিনিষেধ, প্রথা, রীতিনীতির বাইরে একান্ত সহজ ভাবে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের জন্য ব্যাকুলতা।"[৮] রবীন্দ্র দর্শনের মূল কথাও তাই। রবীন্দ্রনাথ পুলকিত হয়েছিলেন বাউল-চিন্তার সঙ্গে নিজস্ব দর্শনের ঘনিষ্ঠ মিল দেখে। তিনি আরও পুলকিত বোধ করেছিলেন এই ভেবে যে, জ্ঞানের কঠোর তপস্যার 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা্যয়া' পথে চলে উপনিষদের কবি যে সত্যে পৌঁছেছেন, বাউল কবিরা হৃদয়ের পথে অনায়াসে সেখানে গিয়ে পোঁছেন। বেদ-উপনিষদ না পড়েও তাই তারা ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পেরেছেন। বাংলাদেশের লোকায়ত ধর্মদর্শন এই বাউল দর্শন, লোকজীবনসমুত্থিত বলেই রবীন্দ্রনাথ একে 'The philosophy of the people '[৯] বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই লোকায়ত দর্শনের কাছে তাঁর ঋণ তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Religion of Man' শিরোনামায় প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতা-মালায়।[১০] বাউলের "মনের মানুষ"ই যে পরবর্তী

৮। শ্রীবিনয় ঘোষ: 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৯। Rabindranath's Address; INDIAN PHILOSOPHICAL CONGRESS, 1925.

১০। 'The Religion of Man', London, 1931, P 110.

কালে কবির কাব্যে রূপান্তরিত হয়ে জীবনদেবতারূপে দেখা দিয়েছিল, তার ইঙ্গিতও কবি ঐ বক্তৃতায় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মদর্শনের ব্যাখ্যায় অন্যত্রও বাউল গানের কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটি ছাড়া, 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলী ও অন্যত্র বাউল সঙ্গীতের পৌনঃপুনিক উদ্ধৃতি তার প্রমাণ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বাংলাদেশের লোকায়ত সাহিত্যের মর্মমূল থেকে গৃহীত বললে অসঙ্গত হবে না।

বাংলা লোকসাহিত্যের সম্পদের মধ্যে এই বাউল গানই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার উপর যেমন বেশী প্রভাব ফেলেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মেও বাউল গানের প্রভাবই বেশী কার্যকরী হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে তাঁর রচিত সঙ্গীতেই এ প্রভাবের বেশী স্ফূর্তি লক্ষ্য করি। এ সম্পর্কে কবি স্বয়ং বলেছেন :

> "আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রূপরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে"।[১১]

তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য পল্লীসঙ্গীতের সাথেও নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। 'গ্রাম্যসঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধে, ধর্ম-দর্শন-চিন্তামূলক কোন কোন নিবন্ধে সে-সবের পরিচয় মিলবে। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী রবীন্দ্রসঙ্গীতে লোকগীতির প্রভাব বিচার করতে গিয়ে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চলের সর্বশ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের প্রভাব ও পরিচয় হয়তো পাওয়া যাবে না, তবে বাউলসঙ্গীত ছাড়া আরও কয়েক শ্রেণীর লোকগীতির প্রভাব তাতে লক্ষ্য করা যায়। তার মতে বাউল গানের পরে সারির গানের প্রভাবই রবীন্দ্রসঙ্গীতে বেশী লক্ষ্য করা যায় আর এ দু'ধরনের গান প্রায় একান্তভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। অন্যান্য যে-সব লোকসঙ্গীতের প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে দেখা যায়, যেমন-রামপ্রসাদী, কীর্তন ইত্যাদি, এদের বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব সম্পদ বলা

১১। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা।

চলে না, যদিও এদের উপর তার দাবি উপেক্ষণীয় নয়। কারণ শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার ধারা বয়ে এসব গানও প্রায় সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের প্রাণের জিনিস হয়ে উঠেছে। তবে বাউল ও সারিগানের প্রভাব যেখানেই দেখা দিয়েছে, সেখানেই বাংলাদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধরা পড়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে বাউল সঙ্গীতের ভাব ও সুরের যেমন রেশ পাওয়া যায়, অনেক সঙ্গীতে আবার সুরটুকুই শুধু ফুটে উঠেছে, বক্তব্যে কবির সম্পূর্ণ নিজস্বতা দেখা দিয়েছে। কোথাও বাউল সুর ভিন্ন সুরের মিশ্রণে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। বাউল সুরে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সঙ্গীত হচ্ছে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ও আমার দেশের মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস্', 'আমার সোনার বাংলা', 'মেঘের কোলে কোলে', 'মালা হতে খসে পড়া', 'আমি যখন ছিলাম অন্ধ', 'পাগ্‌লা হওয়ার বাদল দিনে', 'ডাকব না ডাকব না', 'হে আকাশ-বিহারী নীরদ-বাহন জল', 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', 'আমি তখন ছিলেম মগন', 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে', 'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া' ইত্যাদি।

বাউল গানের পিঠেই আসে সারিগানের কথা। সারিগান শ্রমজীবী মানুষের সমবেত সঙ্গীত। এই পর্যায়ে পড়ে বিশেষ করে 'নৌকা বাইচের গান'। বাংলাদেশের জলপথে বোটে পরিক্রমারত থাকা কালে রবীন্দ্রনাথ এ গানের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। এ গানের প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মাঝিদের সারিগান মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপ্‌সা করে দেয় অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিদে সেইজন্য অত্যন্ত সহজে মনের আঙিনায় আঁচল পেতে বসে"।[১২] সারিগান রবীন্দ্রনাথকে যে অনেকটাই আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ পাই একাধিক গানের মধ্যে 'সারিগান' কথাটির উল্লেখ দেখে, যেমন—

ঐ দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার
সারি গান উঠিল অম্বরে'।

১২। 'সঙ্গীত' রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪ খণ্ড।

অথবা, 'তারি সুদূর সারিগানে
বিদায় স্মৃতি জাগায় প্রাণে।'

অথবা, 'তাই তোমারি সারিগানে
সেই আঁখি তার মনে প্রাণে
আকাশ ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।"

এবার সারিগানের সুরে রচিত কয়েকটি অতি পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা উল্লেখ করা যাক—যেমন, 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব', 'বসন্তে কি শুধু ফোটা ফুলের মেলা', 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়' ইত্যাদি।

আগেই বলেছি এই দুই প্রকারের গানের প্রভাব ছাড়াও অন্যান্য কয়েকপ্রকার লোকগীতির সুরের কিছু প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে দৃষ্ট হয়। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনায় তার পরিচয় দান আবশ্যিক নয় বিবেচনায় আমরা এ-প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানছি।

লোকসাহিত্যেরে অন্যান্য সম্পদের মধ্যে ছড়াগুলো রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষত ছড়ার ছন্দ, যাকে রবীন্দ্রনাথ 'প্রাকৃত বাংলার ছন্দ' বলেও চিহ্নিত করেছেন, তার নৃত্যচপল ভঙ্গিমাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব আকাঙ্ক্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য সম্পর্কে 'ছন্দ' নামক গ্রন্থে তিনি বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। 'স্বরবৃত্ত নামে আখ্যাত এই ছন্দে প্রায় গোটা একটা কাব্যরচনা করে তিনি আমাদের এর মাধুর্য আস্বাদনে সাহায্য করেছেন। 'ক্ষণিকা' কাব্যে এর সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলবে। ছড়ার ভাষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতিদিনের ঘরোয়া বুলিকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, সাধ্যমত তিনি তাঁর রচনায় সে ভাষাকে মর্যাদা দানের চেষ্টাও করেছেন। মোটকথা লোকভাষা ও লোকছন্দ রবীন্দ্রকাব্যের বহিরঙ্গ গঠনে অনেকটাই সুফলপ্রসূ হয়েছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়েই লোকসাহিত্যের রসলোকের বার্তা আমাদের হাতে এসে পোঁছেছে। 'লোক-সাহিত্য'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের রসভাষ্যস্রষ্টার সম্পূর্ণ গৌরব নিয়েই উপস্থিত রয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটনের পক্ষে এ সবই প্রয়োজনীয় তথ্য।

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে এ সত্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রপ্রতিভার লালন ও পরিপুষ্টিতে বেদ-উপনিষদ ও পুরাণ-লালিত ভারতীয় ঐতিহ্যের অবদান যতটাই থাক না কেন, বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির অবদানও বড় কম নয়। এ সংস্কৃতির সাথে নিবিড় পরিচয় তাঁকে লোকমানসের গভীরে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী করেছিল। এর বলেই তিনি স্বদেশেরর জনচিত্তের অন্তঃস্থলে ডুব দিয়ে সংস্কৃতির যে মণিমাণিক্য কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তাকে আপন প্রতিভার যাদুস্পর্শে রূপান্তরিত করে স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে আদরণীয় করে তুলতে পেরেছেন। বাংলাদেশের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের অনড় প্রতিষ্ঠার রহস্য নিহিত রয়েছে এইখানটিতে।

রবীন্দ্রনাথঃ প্রবন্ধ-সাহিত্য

সাহিত্যের আসরে প্রবন্ধের স্থান ঠিক কোথায়, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ অবশ্যই আছে। কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোট গল্পের পাশে প্রবন্ধ ঠিক যেন খাপ খায় না। কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প যেখানে জীবনের রস নিঙড়িয়ে নিয়ে মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে, প্রবন্ধ সেখান থেকে যেন বেশ একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের বহির্বাটিতে বুদ্ধি ও চিন্তার মূলধন নিয়ে কারবার করছে প্রবন্ধ। মনের স্থান যদিবা সেখানে আছে, কিন্তু হৃদয়বোধের প্রবেশাধিকার সেখানে বড় একটা ঘটে না। আর যদি ঘটেই যায়, তাকে দৈবই হয়তো বলতে হবে। আসলে ওটা রীতি নয়। তাই কোন কোন রসিক শিল্পীর মতে প্রবন্ধ 'loose sally of the mind'—সোজা কথায় 'বাজে কথা'। মানে ওর কারবারে তেমন কোন লাভ নেই। কবি জর্জ ক্র্যাব (Crabbe) তো বলেই বসেছেন: 'প্রবন্ধ তাঁরাই লিখে থাকেন যাঁদের না আছে মনীষা, না আছে আপনার অনুসন্ধিৎসাকে অনুসরণ করার প্রবণতা।' তবু প্রবন্ধ অনেকেই লিখে থাকেন দেখে তিনি বলেছেন, সাধারণ পাঠক এর বৈচিত্র্য ও কৃত্রিম আড়ম্বরে বেশী আনন্দ পায় বলেই একদল লোক সহজ পন্থা হিসাবে একে বেছে নিয়েছেন। ক্র্যাবের উক্তির সারবত্তা সম্পর্কে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। প্রথমত প্রবন্ধকার মাত্রই মনীষা বা প্রতিভা বর্জিত নন; আর প্রবন্ধ মাত্রই 'superficiality-'র প্রকাশ নয়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ পাঠককে সস্তা আনন্দ দানের কোন প্রশ্নই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ওঠে না। কারণ সাধারণ পাঠক মূলত প্রবন্ধ পড়েন না। তবে ক্র্যাব যথার্থই লক্ষ্য করেছেন: 'The essay is the most popular mode of writing'; কিন্তু তার কারণ-বিশ্লেষণে

তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বলেই মনে হয়। 'Most popular mode of writing' বলেই প্রবন্ধ লেখা খুব সহজ কাজ নয় কিন্তু। সাঁৎ বভ (Saint Beuve) বলেছেন—প্রবন্ধ হচ্ছে-Most difficult as well as delightful form of literature-সবচেয়ে কঠিন অথচ বেশ আনন্দদায়ক সাহিত্যকর্ম। অবশ্য এখানেও কিছুটা আতিশয্য ঘটেছে। তবু প্রবন্ধের সাহিত্য মূল্যকে তিনি বেশ উঁচুতে তুলে ধরেছেন। আর ডঃ জনসনের—'loose sally of the mind' কথাটা একটা causual remark হলেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'বাজে কথা' তো তাই যা বাস্তব প্রয়োজন সীমায় পড়ে না—আর সেই অপ্রয়োজনের কথা নিয়েই তো সাহিত্যের কারবার। এক অর্থে সকল সাহিত্যই তো 'বাজে কথার' কারবারী। তবে হাঁ 'বাজে কথা'কে সাহিত্যিকরা ভাষার যাদু প্রয়োগে এমন মনোহারী করে তুলতে পারেন যে, তা অনায়াসে আমাদের মন ও হৃদয়ের বেশ একটা জায়গা দখল করে নেয়। প্রবন্ধকারের রচনায় সে যাদু বড় একটা দেখা যায় না। তাই তাঁকে তেমন সুনজরে দেখা হয় না।

আসল কথা, প্রবন্ধের সঙ্গে অন্য সাহিত্যের প্রকৃতিগত পার্থক্যই প্রবন্ধ সম্পর্কে ভুল ধারণার মূলীভূত কারণ। প্রবন্ধে জীবনকে দেখা হয় নিতান্ত কাছে থেকে—কোন রঙ চড়াতে গেলে, তা হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক—সহজেই পাঠকের চোখে ধরা পড়ে যায়। তা ছাড়া প্রবন্ধের বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই থেকে যায় একটা প্রাত্যহিকতা। একে তার যথার্থ স্বরূপে তুলে ধরতে মাত্রাতিরিক্ত কল্পনা শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না; বরং তা করতে গেলেই ঘটে বিভ্রাট। প্রাত্যহিক জীবনে আজকের অপেক্ষাকৃত আত্মসচেতন মানুষ যে নানা সমস্যা জনিত ভাবনার দোলা অনুভব করে, তা নিয়ে উঠতে বসতে খেতে তারা আলাপ করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিচার করে, তার সমাধান সন্ধান করে। প্রবন্ধকার যদি তা নিয়ে লিখতে চান তবে তাঁকেও তাই যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিতে হয়। তিনি যদি বলিষ্ঠ ভাষা প্রয়োগে বক্তব্য বিষয় সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, পাঠক তাতে অবশ্যই আনন্দ

পারে। এ ক্ষেত্রে অলীক বা অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নেওয়াটা নিশ্চয় নিরাপদ নয়। শুধু জীবনের বাইরের কথাই নয়, মানুষের মনে বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবধারার যে দ্বন্দ্ব ঘটে তাকেও প্রবন্ধকার সহানুভূতি সহকারে বিচার করে তার জট মোচনে সাহায্য করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধকার নিজের অনুভূতির প্রয়োগও করে থাকেন। প্রবন্ধকারের কাজ তাই আধুনিক আত্মসচেতন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র চিন্তা, কর্মধারার পরিচয় তুলে ধরা। আমাদের জীবন ধারায় যেমন বৈচিত্র্যের অন্ত নেই, প্রবন্ধেরও বিষয়ের অন্ত নেই। হিসেব করে মানুষ কথা বলে না, আবশ্যক কথার সঙ্গে অনেক অনেক অনাবশ্যক কথা বলে, হয়তো কাজের কথাটাকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্যই। প্রবন্ধকারের কাজ তাই আমাদের সমগ্র জীবন বৃত্তের মধ্যেই প্রসারিত। জীবনকে নিঙড়িয়ে তার রসটুকু নিয়েই প্রবন্ধকার খুশী নন—তাঁর কারবার আস্ত জীবনটাকে নিয়ে। তাই প্রবন্ধের আলোচনায় 'trivials'-ও এসে যায়। আর ঐ কারণেই প্রবন্ধের বেশবিন্যাসে বেশী কৌলিন্যের ছাপ সম্ভব নয়!

প্রবন্ধ এ যুগে সাহিত্যের আসরে বেশ একটা বড় জায়গা জুড়ে বসেছে। আনন্দ দানের সাদামাটা রাস্তাটাই প্রবন্ধ বেছে নিয়েছে। বিষয়বস্তু তার যত সামান্যই হোক, প্রকাশভঙ্গীর গুণে যে তা বেশ মনোজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, তার সাক্ষ্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর রয়েছে। তবে প্রবন্ধের আঙ্গিক এখনও কোন বিশিষ্ট একটি রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। লেখকের ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি ও মানস প্রবণতা অনুসারে এর রূপ বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এমন কোন বিষয় নেই যা প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। মূলত বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত এই দুটো শ্রেণীতে ফেলে বিচার করা হলেও সকল প্রবন্ধরই মূলগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, লেখকের মত, চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের খেলা এতে ফুটে উঠে বিষয়কে অবলম্বন করে। তাই সব প্রবন্ধ মূলত লেখকের ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত। এ সম্পর্কে W. Hudson যথার্থই বলেছেন: The central fact of the true essay, indeed,

is the direct play of the author's mind and character upon the matter of his discourse. লেখকের এই 'matter of discourse' কি যে না হতে পারে, তাই ভেবে দেখবার বিষয়। এ সম্পর্কে Robert Lynd-এর মন্তব্যটি বেশ উপভোগ্য : "Sometimes it is nearly a sermon, sometimes it is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography or a piece of nonsense. It may be satirical or vitoparative or sentimental. It may deal with any subject, from the day of judgement to a pair of scissor" মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, প্রবন্ধের বিষয় অন্তহীন। আর তাতে মানুষের বিচিত্র মানসিকতার পরিচয়া ফুটে উঠে খুবই স্পষ্টভাবে। যে লেখক একে যত সার্থকভাবে, যত সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেন তিনি তত সার্থক প্রবন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রপিপাসু মন, সাহিত্যের বাঁধান রাস্তায় পরিক্রমণ করেই তৃপ্তি পায়নি। তাই তিনি প্রবন্ধের 'যথেচ্ছ' পথেও এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। একে চূড়ান্তভাবে কবি মনের অধিকারী, তাতে আবার এ যুগের বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মসচেতন শিল্পী-প্রতিভা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আশ্চর্য রকমের আবেগমুক্ত এই প্রতিভা যেমন বুদ্ধিদীপ্ত, তেমনি জ্ঞানে সমুজ্জ্বল। কবি ধর্মের স্বাভাবিক প্রেরণায় তিনি বিষয় বস্তুর গাম্ভীর্যকে আত্মগত ভাবরসে স্নিগ্ধ করে পাঠকের চার দিকে এক সুন্দর, শান্ত ভাবমণ্ডল যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি বিষয় বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি, বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে আমাদের চিন্তা বুদ্ধি পৌঁছতে পারে না, সেখানে তিনি অন্তরানুভূতির দোলা সৃষ্টি করে তার বার্তা আমাদের অন্তরের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর অনেক প্রবন্ধই এজন্যে রীতিমত কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানেও প্রকাশের সংযম লক্ষণীয়। গীতিকবি-উচিত আত্মভাবনার প্রকাশ প্রায় সর্বত্রই থাকলেও, তা কখনই তাঁর বিবয় চেতনাকে আচ্ছন্ন করে প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। হৃদয়ের স্পর্শ তাঁর প্রবন্ধে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তি ও

ভাবৈশ্বর্যের সূক্ষ্মতাই বেশী পরিলক্ষিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ হই। কিন্তু তাঁর চিন্তার নাগাল অনেক সময়ই পাই না। সে জন্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার গুণমুগ্ধ পাঠক যতই থাকুন, তাঁর প্রবন্ধের রসগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা খুবই কম। অথচ সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হয় যে, যাঁরা শুধু কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর, রচনার মাধ্যমে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা তাঁর শিল্পী-সত্তার কতকটা পরিচয় পেলেও, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি। যে রবীন্দ্রনাথ দেশে, কালে, সমাজে বিধৃত আর পাঁচ জন মানুষেরই অন্তর্গত, সেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তাঁর রচনার কোথাও যদি পাওয়া যায়, তবে তা' তাঁর ঐ প্রবন্ধসমূহের মধ্যে। ভাল করে চিন্তা করে দেখলে অবশ্য সেখানেও রসিক কবি শিল্পীকে অনেকটা আবিষ্কার করা যাবে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, শিল্পী সত্তার মহত্ত্ব ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের জন্য তাঁর প্রবন্ধসমূহ অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহকে বলা যেতে পারে তাঁর মানস-সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক বস্তু। এতে কত বিচিত্র পথে কত শত ধারায় যে তিনি আপনার অন্তরের ঐশ্বর্যকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তা সংক্ষেপে বলা সহজ নয়। কখনও সাহিত্যের রস বিশ্লেষণে, কখনও ভাষার মৃদু কম্পন আবিষ্কারে, কখনও নিগূঢ় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে, কখনও স্বদেশ ও সমাজের সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনে, কখনও বিজ্ঞানের রহস্য ব্যাখ্যানে, কখনও বা আপনার ব্যক্তিত্বের অনুভবে, কখনও বা মানবতার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টায়, কখনও বা নিছক আত্মগত ভাষণে তাঁর লেখনী ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। কোথাও তত্ত্বের আধিক্য, কোথাও তথ্যনিষ্ঠা, কোথাও সূক্ষ্ম অনুভূতি, কোথাও বা যুক্তিনিষ্ঠার প্রাধান্য ঘটেছে। মোট কথা, আধুনিক যুগের আত্মসচেতন বাঙালী মানসের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমূহে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে এ কালের আত্মসচেতন বাঙালী আপনার মনের বিচিত্র আকৃতিকেই রূপায়িত হতে দেখেছে—এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য এ কথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য

সাহিত্য কর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখতে গেলে, এগুলোকে যথার্থ বোঝা যাবে না। কারণ, স্বরূপত দেখা যায়, তাঁর অনেক প্রবন্ধ ভাব ও চিন্তাসূত্রে সমকালীন কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্পের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। তাই তাঁর প্রবন্ধের যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য তাঁর অন্যান্য রচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগসাধন প্রয়োজন। আবার তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্পের মূল্যায়ন ও যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য প্রবন্ধের দ্বারস্থ হতে হয় অনেক ক্ষেত্রেই। মোট কথা, দুইয়ে মিলেই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয়। কবি রবীন্দ্রনাথ সব কিছুর মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেছেন—অথচ সে যোগ শুধু ভাবের যোগ নয়, বুদ্ধি, চিন্তা ও মননশীলতার যোগও বটে।

আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমূহকে কয়েকটি শ্রেণীতে ফেলে বিচার করা চলতে পারে। তাতে করে তাঁর প্রবন্ধের পরিমণ্ডল কত বিশাল ও বিচিত্র, তা বুঝতে যেমন সাহায্য হবে, তেমনি তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য গতিশীলতাকে (dynamism) বুঝা যাবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যও আমাদের নজরে আসে। কোথাও তিনি লঘু হালকা চালে কথা বলে রচনাকে রম্য করে তুলেছেন—সেখানে শুদ্ধ যুক্তির অবতারণা না করে, তিনি উপমার পর উপমা, দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তথ্য ও যুক্তি নিষ্ঠার পরিচয় দিলেও ওটাকেই সার করে নেননি। উপমা, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাকে প্রাঞ্জল করে তুলতে ত্রুটি করেননি। কোথাও কথোপকথনের ঘরোয়া আমেজ সৃষ্টি করে, রূপকের মাধ্যমে আলোচ্য গুরু গম্ভীর বিষয়কেও রমণীয় ও প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। আবার কোথাও চিঠি-পত্রের কথা বলার ভঙ্গীতে কাজ সেরেছেন। বিতর্কমূলক বিষয় উপস্থাপনে তাকে দেখি অতিমাত্রায় আত্মনিষ্ঠ। অথচ আপনার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি সুষ্ঠু যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করতে ত্রুটি করেননি। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য কোথাও ভাষা ও ভাবের অসংযম ঘটতে দেননি। আপনার বক্তব্য বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম বিষয় আলোচনায় তিনি শাস্ত্রানুশাসনের চেয়ে নিজের চিত্তবৃত্তিকে বড় স্থান দিয়েছেন। আপন অন্তরের আলোকে তার মাধুর্য ও তাৎপর্য

বিশ্লেষণে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর বিজ্ঞান আলোচনায় তথ্য নিষ্ঠা ও যুক্তির সঙ্গে সরস প্রকাশ ভঙ্গীর আশ্চর্য মিলন ঘটেছে। স্বদেশ, স্বজাতি ও মানবতার নানা সমস্যার বিচার ও তার সমাধানের কথা বলতে গিয়ে তিনি এক সুউচ্চ আদর্শবাদের দ্বারা চালিত হয়েছেন। এ সব ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি সর্ব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারে; কিন্তু তাঁর উদার মুক্ত সর্ব সঙ্কীর্ণতাবর্জিত প্রাণের পরিচয়টি তাতে বিধৃত, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। সাহিত্য আলোচনায় তিনি আপনার স্বভাবজাত রসবোধের আশ্রয় নিয়েছেন এবং প্রায়ই রচনার গভীরে প্রবেশ করে তার মাধুর্য উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টার কথা বিবৃত করেছেন অনুপম কাব্যময় ভাষায়। ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর কৌতুহলী মন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এবং ভাষা ও ছন্দ যে কেমন করে যাদুময় হয়ে উঠতে পারে, তার রহস্য আবিষ্কারে অনেক ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছেন।

এবার প্রবন্ধসমূহের বিষয়প্রসঙ্গে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পরিমাণ ও পরিধি খুবই ব্যাপক। বিষয়ানুসারে সাজাতে চেষ্টা করলে প্রায় নয়টি শ্রেণীতে এদের বিন্যস্ত করা চলে; (১) ভাষা ও সাহিত্য, (২) শিক্ষা, (৩) স্বদেশ, সমাজ ও রাজনীতি, (৪) ধর্ম, (৫) বিজ্ঞান, (৬) জীবন কথা, (৭) লিরিকধর্মী রচনা, (৮) ডায়েরী ও পত্র জাতীয় রচনা, (৯) বিবিধ। এ শ্রেণী বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত কি না তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। তবে এ ধরনের শ্রেণী বিভাগ রচনাগুলোর মূল্য অনুধাবনে যেমন সহায়ক, তেমনি রচনার বিষয় বৈচিত্র্যের ধারণা দিতেও যথেষ্ট সাহায্য করে।

প্রথমেই ভাষা ও সাহিত্য পর্যায়ের প্রবন্ধগুলোর কথা আলোচনা করা যাক। এই পর্যায়ের রচনাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'লোক সাহিত্য' 'ছন্দ', 'বাংলা ভাষার পরিচয়', শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে। 'প্রাচীন সাহিত্য', গ্রন্থে তিনি কালিদাস প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় কবিদের কাব্য বিচার করেছেন। এতে তিনি সংস্কৃত কাব্যাদির সৌন্দর্য আলোচনা করেছেন। 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা', 'কাব্যে উপেক্ষিতা', প্রভৃতি প্রবন্ধ এ-গ্রন্থের সম্পদ। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত', কাব্য রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় চিরন্তন বিরহ-

সৌন্দর্যের বাণীমূর্তি লাভ করেছে। 'শকুন্তলায় তিনি প্রেমের স্বর্গ ও মর্ত্যকে এক করে দেখিয়েছেন। আর 'কাব্যে উপেক্ষিতা' উর্মিলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, পত্রলেখাদের তিনি বিস্মৃতির রাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনে নতুন মহিমা দান করেছেন! 'আধুনিক সাহিত্যে' তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্য কর্মের আলোচনা করেছেন। এ সকল আলোচনায় তিনি সুতীক্ষ্ণ রস-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। 'লোক সাহিত্য', গ্রন্থে তিনি কবি গান, ছেলেভুলানো ছড়া, গ্রাম্য সাহিত্য সম্পর্কে রসজ্ঞের মন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি যুগপৎ রসবিদগ্ধ পাঠক ও গবেষক। 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' বই তিনটিতে তিনি সমালোচনার মূল নীতি ও কর্তব্য নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি সাহিত্য সৌন্দর্যের বিচিত্র দিকের কথাও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তা স্বজন ধর্মী—সমালোচ্য গ্রন্থ বা কাব্য গ্রহণ করে তিনি তার স্বরূপ বা সৌন্দর্য ব্যাখ্যানের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আপনার ভাল লাগা, মন্দ লাগা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনার বর্ণে তাকে অনুরঞ্জিত করে এক নবতর সৃষ্টির দিকেই নিজেকে নিবদ্ধ করেন। তিনি সাহিত্য সমালোচনায় Synthetic, আবার Creative-ও বটেন। 'বাংলা ভাষার পরিচয়' ও 'শব্দ তত্ত্ব' সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা ভাষাবিদ রবীন্দ্রনাথকে পাই। বাঙলা ভাষার অন্তরের ঐশ্বর্য আবিষ্কারের সাধনা এতে পরিস্ফুট। বাঙলা ছন্দ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও গভীর জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করছে 'ছন্দ' বইটি। বইটিতে ছন্দ নিয়ে বিপুল পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রমাণ মেলে। শুধু তাই নয়, বাঙলা কবিতার প্রকাশ ভঙ্গী কত বিচিত্র হতে পারে তাও এই বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত প্রচেষ্টা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না।

তার পরে আসে শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর কথা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তার ফলাফল বিধৃত হয়েছে 'শিক্ষা', 'শিক্ষার ধারা', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', 'বিশ্বভারতী', 'শান্তি নিকেতন', 'ব্রহ্ম চর্যাশ্রম' প্রভৃতি রচনায়। এ পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদী

মনের ছাপ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট ধারণার কথা। শিক্ষার আদর্শ মাত্র আলোচনা করে তিনি ক্ষান্ত হন নি। শিক্ষার ব্যবহারিকতা ও বাস্তবতা সম্পর্কেও তাঁর সচেতনার ছাপ এতে রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে বিদেশী শাসকের স্বার্থের প্রয়োজনে প্রবর্তিত শিক্ষাবিধির অপপ্রয়োগে দেশের কি ক্ষতি হয়েছে বা সাধারণভাবে শিক্ষার অপপ্রয়োগে ছাত্রসমাজ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাও তিনি আলোচনা করেছেন। আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন এবং তার সমাধান কোথায় তাও নির্দেশ করেছেন। 'শিক্ষার হেরফের'; শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষা সমস্যা' ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি আমাদের প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটিসমূহ নির্দেশ করে, তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে অভিনন্দিত করতে পারেন নি। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বরণ করার জন্য দেশবাসীকে বলিষ্ঠ আহবান জানিয়েছেন। এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আদর্শের প্রেরণায় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এখানে তিনি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের আদর্শে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাঁর এই সমস্ত কার্য ও চিন্তার ছাপ তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষার যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তা ছিল যথার্থই হিন্দুদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ। সুতরাং একে সার্বজনীন শিক্ষার আদর্শ বলা চলে না। তবু তাঁর এই শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টা তাঁর জাতীয় কল্যাণের আগ্রহই সুচিত করে। তিনি যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কি পরিমাণ চিন্তা করতেন তা এ থেকে বুঝতে পারি। তাছাড়া আমাদের শিক্ষার ব্যাধি সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা আশ্চর্যরকমে সত্য—তবে তার প্রতিকারের যে পন্থা তিনি নির্দেশ করেছেন, তা হয়ত সর্বদা যথার্থ নয়।

স্বদেশ, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত অনেক প্রবন্ধও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এগুলোতে তাঁর দেশপ্রেম, সমাজ চিন্তা ও রাজনৈতিক

ধ্যানধারণার পরিচয় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কিরূপ আশ্চর্য সমাজ-সচেতন শিল্পী তাঁর স্বাক্ষর বহন করে এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি। তাঁর স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে—'স্বদেশ', 'কালান্তর', 'সমাজ', 'রাজাপ্রজা', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'সভ্যতার সংকট', প্রভৃতি বইতে। এ সব রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদী মনের স্বাক্ষর স্পষ্ট। তাই দেখা যাবে আধুনিক বাস্তববাদী চিন্তা-নায়কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামতের পার্থক্য প্রায়শই খুব বেশী। কিন্তু একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকের চেয়েই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পেরেছেন, এটা দেখতে পাই। বিশেষ করে 'স্বদেশী অসহযোগ আন্দলন', হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', 'শাসক-শাসিত সম্পর্ক', 'আধুনিক সভ্যতা'র গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর অনেক কথাই ঋষিবাক্যের তুল্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। জাতীয়তার সংকীর্ণ চেতনাকে তিনি প্রসন্ন মনে কোনো দিনই গ্রহণ করতে পারেন নি। এক বৃহত্তর মানবতার ধারণা তাঁকে উদ্বোধিত করেছে। দেশপ্রেম তাঁর ছিল, সে 'দেশপ্রেম অন্ধ দেশপ্রেম নয়—দেশপ্রেমের নামে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ সৃষ্টিকে তিনি সমর্থন করেন নি কোন দিন। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনি বিভিন্ন জাতির মিলনের ইতিহাস হিসেবে দেখেছেন—সেখানে বিরোধের স্বীকৃতি নেই। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতির কারণ বিশ্লেষণে তিনি উভয় সমাজের জীবনদৃষ্টির পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং এ সমস্যা সৃষ্টিতে হিন্দুদের দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক কথা নির্ভীকভাবে বলেছেন। তিনি মুসলমানের বিশিষ্ট সমাজ-সত্তাকে স্বীকার করেছেন এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ব্যতীত উন্নত হিন্দু-সমাজের সাথে তাদের বিরোধ যে মেটা সম্ভব নয় তা মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ, অনুদারতা প্রভৃতি দোষ জাতীয় জীবনে প্রবেশ করে কিভাবে তাকে জীর্ণ করে ফেলছে তার কথা বলেছেন। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তিনি সঙ্কীর্ণ ন্যাশনালিজমের অভিশাপে পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম দুর্গতির কথা সর্বসমক্ষে প্রচার করেছেন। 'কালান্তর' গ্রন্থে আমাদের জাতীয় জীবনের নানা সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত হিন্দু-মুসলিম

বিরোধ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শগত অনৈক্য ও ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তীব্র আন্দোলন ও ঐ পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ শাসকদের মনোভাব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে বড় একটা নামেন নি। তাই ব্যবহারিক জ্ঞানের চেয়ে তাত্বিক জ্ঞানই এ ক্ষেত্রে তাঁর বেশী দেখা যায়। মোটকথা, সমসাময়িক দেশ ও কালের নানা সমস্যা সম্পর্কে কবির সদাজাগ্রত দৃষ্টির পরিচয় মেলে এই প্রবন্ধগুলিতে।

ধর্মমূলক ভাবনিষ্ঠ রচনার পরিমাণও রবীন্দ্রনাথের কম নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধকে অনেকেই ঔপনিষদিক একত্ববাদের পরিপোষক বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কথাটা ঠিক। তবে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের শাস্ত্রবাক্যকেই সার করে বসেন নি। তাকে আপন অন্তরানুভূতির সংমিশ্রণে একান্তভাবেই নিজস্ব করে নিয়েছিলেন। সর্ব ভেদমুক্ত উদার ঐক্যের আদর্শই তাঁর ধর্মবোধের মূল কথা। তাঁর 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন' (১ম ও ২য় ভাগ), 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থ ও ধর্ম সম্পর্কীয় অন্যান্য বক্তৃতা পড়লেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের তিনি যে সকল উপদেশ দিয়েছেন তাতে তিনি আপন ধর্মপদ্ধতির কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। কবি যেন আচার্যের উচ্চাসনে না বসে, ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গদের মধ্যে বসে ঐ কথাগুলো বলেছেন বলে মনে হয়। আসল কথা, ধর্ম চেতনা তাঁর কাছে জীবনের অন্যান্য অনুভূতি থেকে পৃথক কোন এক চেতনা ছিল না। জীবনের মূল প্রেরণাকে তিনি ধর্মচেতনা রূপে, পরমব্রহ্ম রূপে, জীবন-দেবতা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে তিনি এ জীবনদেবতার প্রভাবের কথা বার বার স্বীকার করেছেন। আলোচ্য রচনাগুলিতে কবি এই ধর্মবোধের যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যানের চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। এই ধর্ম প্রেরণার উৎস কোথায় তাও তিনি বলতে চেয়েছেন। বক্তব্যভঙ্গির মধ্যে যে তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়, তা থেকে মনে হয়, তাঁর ধর্মবোধ বিশিষ্ট মানসিক উপলব্ধিজাত। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রত্যেকটি বক্তৃতা কবির উপলব্ধির গভীরতার চিহ্ন বহন করছে। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটিতে কবি

তাঁর অন্তর-জীবনের অভিব্যক্তির কথা আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁর ঈশ্বরকে তিনি উপলব্ধি করেছেন সব মানুষের অন্তরাশ্রিত সর্বাতিশায়ী এক শক্তিরূপে—যে শক্তি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ সত্য দর্শনের নয়, এ কবি চিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। তাঁর নিজেরই কথায়—"The idea of th: humanity of our God or the divinity of Man the Eternal is the main subject of this book—This thought of God has grown in my mind not throgh any process of philosophical reasoning—it suddenly flashed—with a direct vision."[১] বাস্তবিক পক্ষে তাঁর ধর্মবোধ যে এক চরম মানসোপলব্ধির ফল, এটা স্বীকার করতে হয়। অন্তরের অন্তস্তলে যে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন, বাইরের জগতে তারই বিচিত্র বিকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন। চিরন্তন মানব সত্যের মধ্যে ঈশ্বরকে ও আমাদের ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে মানবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঋষি, রবীন্দ্রনাথ সাধক।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি হলেও, তাঁর মধ্যে একটি বিজ্ঞানতান্ত্রিক সমালোচক মন ছিল। তাই দেখতে পাই তিনি বিজ্ঞান সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে বাংলায় লেখার প্রেরণা খুব সম্ভবত তিনি বন্ধু জগদীশ বসুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতুহলের পরিচয় তাঁর 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি অনেক কবিতায়ও ধরা পড়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' একটি অপূর্ব গ্রন্থ। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছে এই গ্রন্থটি। আজ পর্যন্তও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থের মধ্যে এ বইটি একটি শ্রেষ্ঠ বই। প্রতিভার অসাধ্য কিছুই নেই—কথাটি এই বই পড়ে বার বার মনে হয়।

আত্মকথা ও জীবনীমূলক প্রবন্ধ রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। 'আত্ম-পরিচয়', 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', 'চারিত্রপূজা',

১। Rabindranath Tagore ; The Religion of Man. P. 15

'ভারত-পথিক রামমোহন', 'মহাত্মাগান্ধী' প্রভৃতি গ্রন্থ পুরোপুরি জীবনী সাহিত্য হয়ে উঠেনি। কারণ লেখক কোথাও আঁটঘাট বেঁধে শৈশব থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কারও সমগ্র জীবন বিশ্লেষণ করতে বসেননি—নিজেরও নয়, অন্যেরও নয়। নিজের জীবনের কথা লিখতে গিয়ে তিনি একথা ভুলে যান নি যে, জীবনের ছোট বড় তুচ্ছ বিরাট সমস্ত ঘটনা প্রবাহের তুল্যমূল্য দিয়ে জীবনী লেখা দুঃসাধ্য। তাই এই পথে না গিয়ে নিতান্ত ঘরোয়া কথার ভঙ্গিতে নিজের অজস্র স্মৃতির টুকরা যখন যেমন ধরা দিয়েছে তেমনি প্রকাশ করেছেন—পাণ্ডিত্য নয় অন্তরঙ্গতার ছাপই এগুলোতে বেশী। 'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়' তিনি বয়স্কদের কাছেই বিবৃত করেছেন। কিন্তু ছেলেবেলার কথা শিশুদের জন্য সরস ভাষার গল্পের ন্যায় উপভোগ্য করে বলেছেন। 'চারিত্র-পূজা', 'ভারত-পথিক রামমোহন', 'মহাত্মা গান্ধী' প্রভৃতি বইতেও রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে। 'চারিত্রপূজায়' বিদ্যাসাগরচরিত্র বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। বিদ্যাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য এমন করে আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। রামমোহন ও মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র বিশ্লেষণেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ভারত পথিক রামমোহনকে তিনি আধুনিকতার পথিকৃত হিসেবে যে ভাবে দেখিয়েছেন তা তাঁর গভীর চারিত্রিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

'লিরিক কাব্যধর্মী' প্রবন্ধ রচনায় প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের কবি সত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। এগুলিতে তিনি তাঁর কাব্যিক উপলব্ধিকে চিত্তাকর্ষক ভাবে পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। কখনও গল্পের রূপকে, কখনও সহজ বর্ণনার মাধ্যমে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। 'লিপিকা'র রচনাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 'লিপিকা'র ভাষা স্বচ্ছ, সহজ, ভাব তির্যক—সর্বত্র গূঢ় হৃদয়ানুভূতির অনুরঞ্জন লক্ষ্য করা যায়। 'লিপিকা'র কথাগুলো কবি যেন ভাবতন্ময় অবস্থা থেকে বলেছেন বলে মনে হয়। এ যেন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে মনের কথা বলার প্রয়াস। 'পায়ে চলার পথ', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'মেঘদূত' প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পরিমাণ ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচনা হচ্ছে পত্র-সাহিত্য এবং ডায়েরী জাতীয় রচনা। ব্যক্তিগত অনেক চিঠিকে এ পর্যায়ে ফেলানো না গেলেও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে পত্র বা ডায়েরী লেখার ছলে এমন সব কথা সুন্দর করে বলেছেন যে, তা যে কোন ভাল প্রবন্ধে স্থান পেতে পারে। এগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পারস্যে', 'জাপানযাত্রী', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'পথের সঞ্চয়', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'ছিন্নপত্র', 'পথের প্রান্তে', 'চিঠিপত্র' (১, ২, ৩, ৪,) ইত্যাদি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনাগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে যে এই চিঠি ও ডায়েরীর মধ্যদিয়ে কবি আমাদের সামনে যতটা ধরা দিয়েছেন আর কোথাও তেমন ভাবে ধরা দেন নি। এ সকল চিঠিপত্র ও ডায়েরী রবীন্দ্র-জীবনের বহু অনালোচিত অধ্যায়কে উন্মোচন করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা, তাঁর চিন্তাধারা, সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে তাঁর যোগাযোগ এবং সে সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ-মন্তব্য, নিজের মরমী সাহিত্য সম্পর্কে স্বকৃত ব্যাখ্যা এ সব কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হতাম—যদি লেখক এত অজস্র চিঠিপত্র না লিখতেন, এ বিচিত্র ডায়েরী না রাখতেন। সাহিত্য ও সমাজের কত বিভিন্ন দিক নিয়েই না তিনি আলোচনা করেছেন—সে আলোচনায় প্রকৃতিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, ছন্দোবিজ্ঞান, এবংআরও কত অজস্র জটিল জিনিসই না সরস করে তুলেছেন![২] তা ছাড়া বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে অর্জিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের নরনারীদের জীবনের কত অভিজ্ঞতার কথাই না তাঁর এই জাতীয় রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। জাপানের শিল্প-আন্দোলন, রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর সমাজ উন্নয়ন কার্য সম্পর্কে তিনি সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্য ও সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে অনেক মনোজ্ঞ আলোচনা তাঁর পত্রগুলিতে ছড়িয়ে আছে।

২। নীলরতন সেন : রচনাসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৫০।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি রয়েছে যাদের পূর্বোক্ত বিশেষ কোন শ্রেণীতে ফেলে বিচার করা দুঃসাধ্য। এ প্রবন্ধগুলিকে আমরা বিবিধ পর্যায়ে ফেলতে চাই। 'পঞ্চভূত' 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এই পর্যায়ের গ্রন্থ। রূপকাশ্রয়ী 'পঞ্চভূতে'র লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনার এক নতুন দিগন্ত। জগত সৃষ্টির উপাদান—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি উপাদানকে পঞ্চ চরিত্রের মনুষের প্রতীক রূপে দাঁড় করিয়ে কবি নিজে সে আসরে যোগ দিয়ে বিচিত্র জীবন সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বৈঠকী ধরনের এ 'আলোচনার মধ্যে সরস টিপ্পনী আছে, গভীর তত্ত্ব আছে, কল্পনা বিলাস আছে, প্রেম ও দীপ্তি আছে। স্রষ্টার নিস্পৃহ দেখার চোখ আছে।[৩] 'পঞ্চভূতে'র, 'কাব্যের তাৎপর্য,' 'কৌতুকহাস্য,' 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা', প্রভৃতি এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সব কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর একটা চেষ্টা প্রবন্ধগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। তারপর 'বিচিত্র প্রবন্ধের' কথা। এ বইয়ের রচনাগুলো ব্যক্তিগত প্রবন্ধ পর্যায়ের। এতে কখনও গুরুতর বিষয়কে হালকা কখনও আপাত তুচ্ছ বিষয়কে বড়, কখনও বা সামান্য বিষয়কে অসামান্য করে লঘুভঙ্গির সাহায্যে সরস করে বিবৃত করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় নিজেই বলেছেন —বিচিত্র প্রবন্ধের গৌরব বিষয়বস্তুতে নয়, রচনার রসসম্ভোগে। এ গ্রন্থের 'সরোজিনী প্রয়াণে', 'ছোট নাগপুর', 'রুদ্ধগৃহ', প্রভৃতি রচনায় বিষয়বস্তু সামান্য—কবিসুলভ মনের স্বগত গুঞ্জরণই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার 'পর নিন্দা' 'মন্দির' 'রঙ্গমঞ্চ' 'ছবির অঙ্গ' 'সোনার কাঠি' প্রভৃতি রচনায় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কম নয়। 'নববর্ষা', 'কেকাধ্বনি', 'বাজেকথা', প্রভৃতি প্রবন্ধের বক্তব্য খুবই গুরুতর—কিন্তু লেখকের ভঙ্গি গুণে তা উপভোগ্য হতে পেরেছে। আবার 'শরৎ', 'পাগল'', আষাঢ়', প্রভৃতি রচনা কবিত্বময় হয়ে পড়েছে। বাস্তবিক 'বিচিত্র প্রবন্ধের' বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। কোন বিশেষ শ্রেণীতে ফেলে এ প্রবন্ধগুলোকে বিচার করা দুঃসাধ্য। এভাবে রবীন্দ্রনাথের

৩। নীলরতন সেন : রচনাসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৪৯

সমগ্র প্রবন্ধ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে বাধ্য হই যে, রবীন্দ্রনাথের মত মহান স্রষ্টার হাতে বাংলা প্রবন্ধ যেভাবে বিচিত্র রসে রসায়িত হয়েছে এবং সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তা আর কোন সাহিত্যিকের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়নি।

এই বিচিত্র সাহিত্য-সম্পদ সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের গৌরব যে কতটা বাড়িয়েছেন তার যথার্থ উপলব্ধি এখনো আমাদের সমাজে ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকেই আমরা সার করে রেখেছি। অথচ সেটাই যে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় নয়, আমরা তা ভুলে যেতে বসেছি। কবি রবীন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ সাহিত্যিক পরিচয়কে পূর্ণতা দান করেছেন প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ।

মোজাম্মেল হক

বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকা রীতিমত গৌরবের ছিল। এর তুলনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের 'অনগ্রসরতা ও পশ্চাদাপদতা' বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। অত্যন্ত বেদনার সাথেই আমরা লক্ষ্য করি ১৮০০ সাল থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে বাঙালী মুসলমান বিশেষ কোন ভূমিকা পালনে অগ্রসর না হয়ে অনেকটা নিষ্ক্রিয় ভাবেই অবস্থান করেছে। অথচ সাহিত্যানুরাগ তাদের ছিল না বা ঐ সময় তাদের সৃষ্টিক্ষমতা একেবারেই লোপ পেয়ে বসেছিল, এমন কথা মনে করারও সংগত কোন কারণ আনরা খুঁজে পাই না। বরং ঐ সময় আরবী ফার্সী শব্দবহুল 'মুসলমানী' বাংলায় কাব্যরচনায় বহু মুসলমান কবি বিস্ময়কর উদ্যমেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্য' রূপে পরিচিত এ কাব্যধারা অবশ্য রূপে রসে বিচিত্র ছিল না। আর তাতে যে জীবন দৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছিল, তাও আধুনিক ছিল না। বস্তুতঃ দোভাষী রীতির ঐ কাব্যসাহিত্য মধ্যযুগেরই ধারাবাহী ছিল। এ সাহিত্যধারায় অতীতের প্রতি একপ্রকার অন্ধমোহ এবং বর্তমানের প্রতি চরম ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছিল।

কেন এমন হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর সমসাময়িক কালের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত একশত বছরের জাতীয় বিপর্যয়ের ইতিহাস আলোচনা করলেই বাঙালী মুসলমানদের এ সাহিত্যিক দৈন্যের উৎস কোথায় নির্ধারণ করা যাবে। পলাশীর যুদ্ধের নির্মম প্রহসন মুসল-

মানের রাজনৈতিক স্বাধীনতারই শুধু অপহৃব ঘটায়নি, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সৃষ্টি করেছিল চূড়ান্ত বিপর্যয়। আর তারই অনিবার্য মানস-প্রতিক্রিয়া বাঙালী মুসলমানকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি করে তুলেছিল বিরূপ। এ-বিরূপতা হেতু তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোন গরজ বোধ করেনি। তাই উনিশ শতকের প্রথম পাদে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শ হেতু বাংলা দেশে যে ব্যাপক নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, সে নবজাগরণের বাণীকে অনুধাবন করার কোন প্রচেষ্টাই মুসলমান সমাজে বড় একটা দেখা যায় নি। অথচ প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজ এ নবজাগরণের তরঙ্গ প্রবাহে স্নাত হয়ে নব-প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বুদ্ধ হল। ফলে এ নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফসল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর ভূমিকা মুখ্য ও প্রায় একক হয়ে দেখা দিল। হিন্দু যেমন বৈষয়িক ক্ষেত্রে, তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্বিক আধিপত্য বিস্তার করল। তুলনায় মুসলমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্য প্রকট হয়ে উঠল।

স্বভাবতঃই মুসলমান সমাজে তখন নিদারুণ আত্মগ্লানি বোধ ও মানসিক সংকট দেখা দিল। তারা আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হল। কিন্তু সে আত্মানুসন্ধান প্রচেষ্টা কোন সুস্থ কর্মপদ্ধতি ও জীবনাদর্শ দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় তাকে বর্তমানের সাথে পাঞ্জা লড়বার প্রবৃত্তি না দিয়ে প্রাচীন ধর্মজীবনের আদর্শে ফিরে যাবারই প্রেরণা দিল। ফলে মুসলমানদের সকল ধ্যান চিন্তা কেন্দ্রীভূত হল পুনরুজ্জীবন কামনায়। এ অবস্থায় প্রাগ্রসর সাহিত্য চিন্তার সাথে সংযোগ সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তাই সে অনুভব করল না। আর করবেই বা কেমন করে? যে আধুনিক শিক্ষা তার মনের মুক্তি ঘটিয়ে তাকে যথার্থ পথের নির্দেশ দিতে পারত, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকে সে সম্ভাবনাকে সে নিজেই দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এ অবস্থায় যা হবার তাই হয়েছিল। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকেও মুসলমান অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল। পুরাতনের অনুবর্তনেই সে আপন রস পিপাসাকে নিয়োজিত রেখেছিল দীর্ঘকাল। ফলে মুসলমানের গৌরবময় সাহিত্যিক ঐতিহ্য যুগ-জীবন প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণতোয় হয়ে অবলুপ্ত হতে চলেছিল।

তবু জীবনের স্বাভাবিক ধর্মেই মুসলমান শেষ পর্যন্ত নতুন কালের পারিপার্শ্বিকের সাথে আপন জীবনধারার সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই আমরা দেখি ১৮৭০ সালের দিক থেকে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় দশক থেকেই বাঙালী মুসলমান নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে প্রাগ্রসর জীবন চিন্তার অধিকারী হওয়ার গরজ বোধ করেছে। ফলে ঐ সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানের অভিযাত্রা শুরু হয়। মনে রাখা দরকার যে, বাঙালী মুসলমান যখন আধুনিক সাহিত্যে দীক্ষা নিতে অগ্রসর হয়েছে, তখন অগ্রগামী হিন্দু সমাজের সাধনায় বাঙলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে 'স্বর্ণযুগ'—সাহিত্যের কারুকর্মে তারা তখন বিচিত্রের অন্বেষায় প্রবৃত্ত। স্বভাবতঃই পশ্চাদগামী মুসলমান সাহিত্যিকগণ সামনে তাঁদেরই রচনাকে আদর্শ হিসেবে রেখে সাহিত্যকর্ম শুরু করেছিলেন। নতুনতর কোন পরীক্ষার ঝুঁকি নিতে সাহস করেন নি। তাই দেখা যায় আধুনিক সাহিত্যের ঐশ্বর্যময় বিকাশের যুগে মুসলমান সমাজের সাহিত্যকর্ম কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের মত মহৎ কোন সাহিত্যকর্মী একটিও জন্মালেন না। এটা বাঙালী মুসলমানের জন্যে একটা দুর্ভাগ্য বৈ-কি!

তবু আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের অবদান একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। সর্বাত্মক নৈরাশ্যের অন্ধকারে উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় বহু সাহিত্য-প্রাণ মুসলমান আবির্ভূত হয়ে মুসলমানকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পথ দেখিয়েছেন। যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান সাহিত্যিক মুসলমান সমাজকে আধুনিক সাহিত্যের পথে সর্বপ্রথম আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দুজন নানা কারণে বৈশিষ্ট্যের দাবীদার—এক, 'বিষাদ সিন্ধুর' অমর শিল্পী মীর মোশাররফ হোসেন; দুই শান্তিপুরের কবি, বাংলা গদ্যের অন্যতম শিল্পী মোজাম্মেল হক। মীর মোশাররফ হোসেন নিঃসন্দেহে আধুনিক মুসলিম সাহিত্য সাধনায় অগ্রপথিক; তাঁর কনিষ্ঠ সমসাময়িক মোজাম্মেল হক তাঁরই এক যোগ্য উত্তরসূরী। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "মোছলেম বঙ্গের পতন যুগের অবসানের পর যে কয়জন সাহিত্য

সাধক মুসলমানের মনে আশা ও মুখে ভাষা দিয়া আবার তাঁহাদিগকে জীবন্ত ও জাগ্রত করিয়া তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন—মোজাম্মেল হক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রপথিক।'[১] যে যুগে শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর মুসলমানদের রসচেতনা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, উচ্চস্তরের রসের সামগ্রীর অভাবে সে যখন শিল্পশ্রী বর্জিত পুথির কেচ্ছা কাহিনীর অসম্ভবের অলীকের রাজ্যে পাক খেয়ে ফিরছিল, না পারছিল তার মোহময় আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে, না পারছিল তাকে কোন নবমূল্যে উদ্ভাসিত করতে, চেতনার নতুন দিগন্তে মুক্তি দিতে অথচ ভিতরে ভিতরে তার সমগ্র চেতনা যখন নতুনতর শিল্পবস্তুর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, সেই যুগে কবি মোজাম্মেল হক এবং তাঁর সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্যিকগণরা তিমত এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট মুসলিম সাহিত্যকর্মী সৈয়দ এমদাদ আলীর মন্তব্য স্মরণীয়। এমদাদ আলী বলেছিলেনঃ "কবি মোজাম্মেল হক ও মুন্‌শী রেয়াজুদ্দীন এবং তাঁহাদের সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্যিকগণ পুঁথি সাহিত্যের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বাংলার ভিতর দিয়া নিজেদের সমাজে সাহিত্য প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের সাহিত্য বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পোঁছিয়াছে এবং ইহার গতি অব্যাহত থাকিলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমাদের কোন ভাবনা নাই।"[২] বস্তুত মোজাম্মেল হক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃত মুসলিম সাহিত্যিক। তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস রচনার কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি, উপন্যাসিক ও জীবন চরিতকার, সর্বোপরি তিনি বাংলা গদ্যের একজন কুশলী শিল্পী। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও মোশাররফ হোসেনের গদ্যধারায় তিনি একজন সার্থক উত্তর সাধক।

১, মোহাম্মদী, ৭ম বর্ষ, পৌষ, ১৩৪০ সাল। পৃষ্ঠা ২২০ দ্রষ্টব্য।

২, সৈয়দ এমদাদ আলী: "মোজাম্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন", মোহম্মদী, ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪০ সাল পৃঃ ৪২৭।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরে মুন্সী মোজাম্মেল হক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নাসিমউদ্দীন আহমদ ছিলেন শান্তিপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান। বাল্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রবেশ করেন। তথায় প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ পর্যন্ত পড়ে তিনি ছাত্রজীবনে সমাপ্তি রেখা টেনে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হন এবং শান্তিপুরেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। সত্যিকার লোকশিক্ষকের মত নিষ্ঠার সাথেই তিনি এ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কর্ম-জীবনের প্রায় শুরু থেকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনেরও সূত্রপাত হয়। তিনি প্রথমে 'সময়' নামক পত্রিকার সংস্রবে আসেন। তার পর তিনি ক্রমে ক্রমে 'সোমপ্রকাশ', 'বাণী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে সাহিত্য জীবনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। শান্তিপুরে থেকেও তিনি তখনকার কলিকাতার সহিত্য সমাজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলে-ছিলেন। সে যোগ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুই ভাবেই সাধিত হয়েছিল। তখনকার দিনে শান্তিপুরের সাথে কলিকাতার রেলপথে যোগাযোগ ছিল না। আহিরীটোলা ঘাট থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত করত। মোজাম্মেল হক মাঝে মাঝে ষ্টিমারে কলিকাতা এসে সাহিত্যিক সমাজের সাথে সংযোগ রক্ষা করতেন। * পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন আল মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম, মুন্সী রেয়াজুদ্দীন প্রভৃতি মুসলিম সমাজ ও সাহিত্য কর্মীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছিল সাহিত্য জীবনের প্রায় গোড়াতেই। মুসলিম বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণকে সম্ভব করে তোলার জন্যে তিনি তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন প্রথম থেকেই। তাই তিনি উল্লিখিত মনীষীদের সাথে হাত মিলিয়ে 'সুধাকর' নামক পত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শোনা যায় তিনি কিছুদিনের জন্য 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন এবং

* সৈয়দ এমদাদ আলী বিরচিত "কবি মোজাম্মেল হক ও রেয়াজুদ্দীন" প্রবন্ধে উদ্ধৃত মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহম্মদের সাহিত্যিক জীবনী থেকে উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য। মোহম্মদী, পৃষ্ঠা সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪০ দ্রষ্টব্য।

দক্ষতার সাথে সে কার্য সম্পাদন করে, পরে নানা কারণে ঐ পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করেন। সমকালীন মুসলিম সাহিত্যান্দোলনের সাথে তিনি যে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন তার প্রমাণ মিলবে 'কোহিনূর', 'হাফেজ', 'প্রচারক', 'মিহির' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ থেকে। একদিকে গদ্যে পদ্যে গ্রন্থ রচনা করে, অপরদিকে পত্র-পত্রিকায় বিবিধ প্রবন্ধাদি রচনা করে মোজাম্মেল হক কালক্রমে বাঙলা গদ্যের কুশলী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পত্র পত্রিকা সম্পাদনেও কম উৎসাহী ছিলেন না। 'মিহির ও সুধাকরের' স্বল্পকালীন সংস্রব ছাড়াও তিনি 'লহরী' নামে একখানা 'কবিতাময়ী' মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করে বাঙলা দেশের প্রথম কবিতা পত্রের সম্পাদক হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। 'লহরী' ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তার দীর্ঘকাল পরে ১৯২০-২১ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি সাহিত্য-পত্র সম্পাদনে নতুনতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে প্রকৃতপক্ষে 'মোসলেম ভারতের' প্রাণশক্তি ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ আফজালুল হক সাহেব।

মোজাম্মেল হক সাহেব আজীবন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। ১৮৮১ সালে 'কুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কাল থেকে ১৯৩৩ সালে মৃত্যু কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল মোজাম্মেল হক বঙ্গবাসীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ ও এগারোটি গদ্য গ্রন্থ ছাড়াও তিন থেকে চারখানা দোভাষী রীতির পুঁথিও রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। গদ্য রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সুধী ও সমালোচক মহলের স্বীকৃতি পেয়েছিল। ১৩৪০ সালের মোহাম্মদীতে প্রকাশিত মণিভূষণ বাগচি লিখিত "পল্লীকবি মোজাম্মেল হক" নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় "গদ্য রচনায় তাঁহার এই অসামান্য কৃতিত্ব দর্শনে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর বঙ্গগৌরব স্যার আশুতোষ তাঁহার ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশনের বঙ্গভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত

হন।''[৩] তিনি ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বাংলা ভাষার পরীক্ষকরূপে কাজ করে গেছেন।

'লোকশিক্ষকতা' ও সাহিত্য সাধনাই মোজাম্মেল হক সাহেবের জীবনের প্রধান ব্রত হলেও তিনি সামাজিকের দায়িত্ব পালনে কোন দিনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি প্রায় চল্লিশ বছরকাল শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। কিছুদিন তিনি মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন। তারপর ত্রিশ বছর কাল তিনি নদীয়া জেলা বোর্ডের শিক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবেও আপনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সাহিত্যিক হিসেবে, লোকশিক্ষক হিসেবে এবং একজন সমাজ সেবক হিসেবে মোজাম্মেল হক মানুষের কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সমকালীন অনগ্রসর মুসলমান সমাজের সমস্ত দৈন্যমোচন করে তাকে শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতিতে উন্নত বলিষ্ঠ একটি জাতিরূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। আর সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্য অবিশ্রান্তভাবে লেখনী চালিয়েছেন। সৈয়দ এমদাদ আলী এ সম্পর্কে এক প্রবন্ধে বলেছিলেনঃ 'মুসলমান কবিদের মধ্যে বাংলার মুসলমানের বিদ্যাহীনতার কথা, দুঃখ দারিদ্র্যের কথা তিনিই সর্বাগ্রে গাহিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন এবং অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য আনিতে ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দুর্দিনের যাত্রীদের তিনিই প্রথম আহ্বান করিয়াছেন।''[৪] এ উক্তি যথার্থ। সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করে একদিকে তিনি যেমন মুসলমানকে আপন ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাকে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তেমনি মাসিক সাহিত্য-পত্র সম্পাদনার

৩। শ্রী মণিভূষণ বাগচি: 'পল্লী কবি মোজাম্মেল হক', মোহম্মদী, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৪০ পৃ: ৪৩০।

৪। সৈয়দ এমদাদ আলী: 'মোজাম্মেল হক ও রেয়াজুদ্দীন,' মোহম্মদী, চৈত্র সংখ্যা, ১৩৪০, পৃ: ৪২৩।

মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের রস রুচির যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের চেষ্টা পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য উৎকৃষ্ট স্কুলপাঠ্যগ্রন্থ রচনা করে তাদের শিক্ষার দৈন্য মোচনের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করে গিয়েছেন। মোজাম্মেল হকের "পদ্যশিক্ষা" মুসলমান রচিত সর্ব প্রথম স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। বস্তুত পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রনায়কের। হিন্দু সমাজে এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের যে ভূমিকা-মুসলমান সমাজে মোজাম্মেল হকের ভূমিকা তার চেয়ে ন্যূন ছিল না। মোজাম্মেল হকের এ মহান কীর্তি মুসলমান সমাজে তাঁকে লোকশিক্ষকের মর্যাদা দিয়েছে। শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজের নব জাগরণে তাঁর পাঠ্য পুস্তকগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে জনৈক স্মৃতিচারক মন্তব্য করেছেন: "সেও একদিন ছিল, যখন মোজাম্মেল হকের রচিত পাঠ্যপুস্তক হাতে লইয়া তখনকার নবীন যাত্রীদের মনোপ্রাণ আশা আনন্দ ও গৌরবের প্রেরণায় নাচিয়া উঠিত।"[৫] এ উক্তিতে লোকশিক্ষক মোজাম্মেল হকের রচনার সঞ্জীবনী শক্তিরই স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে।

মোজাম্মেল হকের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১৯৩৩ সালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিয়াত্তর বছর। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। সমকালীন বহু হিন্দু ও মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের সাথে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এ প্রীতির সম্পর্ক তাঁর সাহিত্য সাধনাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। তিনি বিভিন্ন মতাদর্শাবলম্বী পত্র-পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মতাদর্শের পার্থক্য কোথাও তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। ভাষাদর্শে তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের ক্লাসিক আদর্শের অনুগামী ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনে তিনি মুসলিম ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকেই আদরণীয় করে তুলেছেন। মুসলিম ধর্মসাধক, কবি মনীষী ও বীর চরিত্রই তাঁকে আকর্ষণ করেছে সব সময়। মোজাম্মেল হকের সাহিত্য সাধনায় আমরা পুরাতন যুগের অবসান ও নতুন

৫। মোহম্মদী, ৭ম বর্ষ, পৌষ, ১৩৪০ সাল, পৃঃ ২২০।

যুগের মহিমময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। 'হাফেজ' নামক পত্রে প্রকাশিত মোজাম্মেল হকের শাহ্‌নামার অনুবাদ প্রসঙ্গে কবি সমালোচক আবদুল কাদিরের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "বটতলার পুঁথি সাহিত্যের সহিত যৌবনাবধি মোজাম্মেল হকের পরিচয় ছিল সুগভীর; তাহারই আঙ্গিক অনুসরণ করিয়া তিনি ১২৯৪—৯৫ সালে 'মুসলিম বাংলা' জবানে 'এলাজে গাও' (গো-চিকিৎসা) ও 'আলেফ লায়লার পুঁথি' প্রণয়ন করেন। তিনি যে লেখনীতে একদা এ সকল পুঁথি সংরচন করেন তাহাতেই 'শাহনামা' লেখা অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।"[৬] সমালোচক কবি আবদুল কাদিরের এই মন্তব্য আমাদের ঐ ধারণা-কেই বলবত করে। বস্তুত যৌবনে পুঁথির ভাব ও ভাষার জগতে মুগ্ধ প্রেমিকের ন্যায় পরিক্রমণ করেও তিনি একদিন অবলীলাক্রমে সে রাজ্যের সীমানা ডিঙিয়ে ভাব ও ভাষার নতুন রূপ মহলে প্রবেশ করে যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তাতে তাঁর জীবন ও শিল্পদৃষ্টির আশ্চর্য প্রসারতার কথাই আমাদের মনে উদিত হয়। এখানেই মোজাম্মেল হক শিল্পী হিসেবে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রয়েছেন।

১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩৩ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীরও বেশী কাল ধরে মোজাম্মেল হক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা করে সাহিত্য কমে আপনার বিস্ময়কর নিষ্ঠার পরিচয় রেখে গেছেন। এ পঞ্চাশ বছরের অতন্দ্র সাধনার মধ্যদিয়ে তাঁর উদ্ভিন্নমান শিল্পীচেতনা একটি সার্থক পরিণতি লাভ করেছিল। ঐতিহ্য ও বংশগত সূত্রে পুঁথির উত্তরাধিকারকে বরণ করেই সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, একথা আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত সত্য। 'মুসলমানী বাঙ্গলা' জবানে লিখিত 'এলাজে বাঙ্গলা', 'এলাজে গাও', 'আলেফ লায়লা', 'মাহাৎ নামা' ইত্যাদি পুঁথির লেখক মোজাম্মেল হক আজ বিস্মৃতপ্রায় হলেও, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পূর্ণ পরিচয়

৬। মুসলিম বাংলা সাহিত্যপত্র: আবদুল কাদির প্রণীত 'হাফেজ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৯।

উদঘাটনে এ সবের মূল্য কিন্তু মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। একথা ঠিক, মোজাম্মেল হক সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই নতুন পথের সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু সে পথের সন্ধান পেতে তাঁকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। দোভাষী পুঁথির জগৎ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আধুনিক কাব্যের দিকে নিবদ্ধ করার চেষ্টা প্রথমাবধিই তাঁর সাহিত্য কর্মে দৃষ্ট হলেও, তিনি দীর্ঘদিন পুঁথির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পুঁথির ভাষা পরিত্যাগ করে আধুনিক কালের বিশুদ্ধ ভাষায় কাব্য রচনা করে তিনি আধুনিক বাঙলা কাব্যে মুসলিম সাধনার যে সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তী কালে তা অবশ্য যথেষ্টই ফলপ্রসু হয়েছিল। তবে কবি-পরিচয় মোজাম্মেল হকের যত বড়ই হোক, তা কখনই গদ্য-লেখক মোজাম্মেল হককে অতিক্রম করতে পারে নি! গদ্য রচনায় তাঁর কৃতিত্ব গুণে ও পরিমাণে রীতিমত ঈর্ষার বস্তু হয়ে রয়েছে। একই সময়ে গদ্য ও পদ্যে লেখনী ধারণ করে, মোজাম্মেল হক উভয় ক্ষেত্রেই কমবেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আপন শিল্পীসত্তার মহত্ত্বকেই প্রকট করে তুলেছিলেন।

মোজাম্মেল হকের শিল্পীসত্তার উদ্বর্তনের ইতিহাসটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর এ শিল্পীসত্তা বিকশিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে তিনি দোভাষী রীতির পুঁথির প্রভাব-প্রেরণা ও আধুনিক কাব্য রীতির দ্বিমুখী প্রেরণায় দোল খেয়ে ফিরেছেন। তাই তার শিল্পীসত্তা অনেকটাই ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু অচিরেই তিনি পুঁথির রাজ্য থেকে দূরে সরে এসে আধুনিক ভাষায় আধুনিক ছন্দে নতুন কবিতার আলাপন শুরু করেছিলেন। এ হচ্ছে তার শিল্পীসত্তার বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে তিনি কবিতার চেয়ে গদ্যের শিল্প কর্মে বেশী মনোযোগী হয়ে উঠেন। আর এ ক্ষেত্রেই তার শিল্পীসত্তার স্ফূর্তি ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। বলাবাহুল্য মোজাম্মেল হকের শিল্পীসত্তার বিকাশের এই তিনটি স্তরকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। কারণ কবি ও গদ্য শিল্পীর দ্বৈতসত্তা তাঁর মধ্যে প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান সক্রিয় ছিল। মোজাম্মেল হকের শিল্পীসত্তা সাহিত্যের কারুকর্মে যতটা উৎসাহী ছিল, অন্যত্র তেমন ছিল না। তাই তাঁর

কাব্যে ভাবের বাহ্যিক আড়ম্বর একেবারেই স্থান পায়নি। অতি সরল, কবিখ্যাতি বিমুখ, ভক্ত প্রাণের অধিকারী মোজাম্মেল হক ছন্দে ভাবে ভাষায় কবিতাকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর করে তোলার কাজে যতটা আগ্রহী ছিলেন, কবিখ্যাতি লাভে তার শতাংশের একাংশ আগ্রহও প্রদর্শন করেন নি। এ-কথা তাঁর গদ্যরচনা সম্পর্কেও কম বেশী প্রযোজ্য। আমরা দেখি তাঁর পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনারই তিনি বক্তব্যের প্রকাশকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে বেশী উৎসাহী। একাগ্র সাধনা ও অনুশীলনে তিনি তাঁর শিল্প প্রতিভাকে সবিশেষ মার্জিত করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টি কর্মদক্ষ শিল্পী কর্তৃক সংস্কৃত মণির মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

তথাপি মোজাম্মেল হকের রচনার বিষয় ও ভাববস্তু অকিঞ্চিৎকর ছিল না। এক্ষেত্রে প্রাচীনের প্রতি তাঁর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকলেও তিনি যুগধর্মানুযায়ী নতুন ভাষার পোশাক পরিয়ে তাকে অনেকটাই নবত্ব দানের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাছাড়া আধুনিক মন নিয়ে তিনি মনুষ্য-চরিত্রের মহিমানুধাবনের যে প্রয়াস পেয়েছেন, তারও মূল্য কম নয়। কবিতা পত্রিকা সম্পাদনের প্রয়াস থেকে তাঁর আধুনিকোচিত সূক্ষ্ম-রসচেতনার প্রকাশটিও স্পষ্ট। তাঁর কবিতার মধ্যে ভাববিলাসিতার প্রাচুর্য দেখা যায় না, তার পরিবর্তে পাওয়া যায় আর একটি জিনিস, তা হচ্ছে এক ধরনের বস্তুতান্ত্রিকতা। কাব্যবিচারে বস্তুতান্ত্রিক কবিতার যে বিশেষ স্থান ও গৌরব রয়েছে, তা মোজাম্মেল হক সাহেবের প্রাপ্য। স্বদেশ, স্বজাতি ও ঐতিহ্য-ভাবনা তাঁর কাব্যকে একটা বিশিষ্টতা দিয়েছে প্রথমাবধি। লক্ষ্য করার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের সমকালে জন্মগ্রহণ করে, রবীন্দ্রযুগের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেও তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের দ্বারা এতটুকুও প্রভাবান্বিত হন নি। তাঁর পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদীক্ষা ও মনোভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যেই যে এরূপ ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রপ্রতিভার দার্শনিক মেজাজ, আত্মানুসন্ধানপরতা ও সুতীব্র ভাবানুভূতি মোজাম্মেল হকের কবিপ্রকৃতিতে উপস্থিত ছিল না। তৎপরিবর্তে প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি একটি তদ্‌গত দৃষ্টি ছিল মোজাম্মেল

হকের, সে দৃষ্টিতে প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্যের আধার আর মানুষ হচ্ছে স্রষ্টার আপন সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলার এক অপরূপ প্রয়াসের প্রতীক। এ ভাবকল্পনার সরলতা, এর মাধুর্য ও সৌন্দর্য মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সরল আবেষ্টনীতে জীবন কাটিয়েছিলেন বলেই বোধ হয় মোজাম্মেল হক এই সুন্দর, সরল ও সুস্থ কবিচেতনার অধিকারী হয়েছিলেন।

মোজাম্মেল হক কাব্যক্ষেত্রের ন্যায় গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের ক্লাসিকধর্মী গদ্য মোজাম্মেল হকের হাতে নতুন এক সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল। গদ্যের কারুকর্মে তিনি এক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর; বিষয় পরিচর্যায় তিনি কখনও পুরাণের কল্পলোকের দ্বারস্থ; কখনও ইতিহাসের পটে মানব-চরিত্র মহিমা নির্ধারণে ব্যাপৃত; কখনও বা সুফী সুলভ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবশে মহাপুরুষ জীবনের অলৌকিক মহিমা বর্ণনে আত্মহারা। এ সব ক্ষেত্রে তিনি যেন লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ; তিনি আপনার উপজীব্য বিষয়কে নিছক কল্পনায় সম্ভোগ করার বস্তু হিসেবেই গণ্য করেন নি। তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রচারের সহজ সূত্রও অনুসন্ধান করেছেন। তিনি যেন ত্যাগ তপস্যা, তিতীক্ষা, বীরত্ব, চরিত্রমহিমার এক একটি দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটন করে সবাইকে মনুষ্যত্বের রাজপথে আহ্বান করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর এসব রচনায় কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের অপরূপ সম্মিলন দৃষ্ট হয়। অবশ্য এ সম্মিলন তাঁর অধিকাংশ গদ্য রচনায় দুর্লভ। স্বদেশ স্বজাতি-ঐতিহ্যপ্রীতি তাঁর পদ্যের ন্যায় গদ্যেও ক্রিয়াশীল। তবে গদ্য রচনার ক্ষেত্রে মোজাম্মেল হক সর্বত্র শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীর নিরাসক্তি রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি সুফী পীরবাদে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বশে অধ্যাত্মজগতের বার্তা শোনাতে গিয়ে একেবারে অলৌকিকের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবে তাঁর সকল গদ্য রচনা সম্পর্কেই একথা বলা চলে না। কোথাও কোথাও তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিকের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সমস্যার আলোচনার চেষ্টা করেছেন। জীবন সায়াহ্নে উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টায় তাঁর প্রাগ্রসর জীবন-চেতনার পরিচয়

মিলে। সেখানে মোজাম্মেল হক শুধু বিষয়েই নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও বাস্তবকে স্বীকৃতি দানের প্রয়াস পেয়েছেন। ভাষার মণ্ডন-শিল্পে যিনি আপনার সমস্ত ক্ষমতাকে এতকাল উজাড় করে দিয়েছেন, হঠাৎ যখন দেখি তাঁরই হাতে ভাষা সকল ছলাকলা বিসর্জন দিয়ে আটপৌরে রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত, তখন আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। তরুণ যৌবনে পুঁথির রাজ্যে পাক খেয়ে ফিরেছেন যে কবি, তাঁর শিল্পচেতনার এ আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিকাশ তাঁর শিল্পীসত্তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে বৈ কি!

অথচ বাস্তব জীবনে মোজাম্মেল হক সাহেব ছিলেন একেবারে আত্মপ্রকাশ-বিমুখ। শুধু আপনার গণ্ডীর মধ্যে থেকে নীরবে লোকশিক্ষকের মত কাজ করে গিয়েছেন, জাতিকে নব জীবনের পথে টেনে আনবার জন্যে। স্বজাতির হীন অবস্থা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল; সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সকল প্রাণমন দিয়ে স্বজাতির কল্যাণ কামনাই তিনি করে গেছেন স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত কবিপ্রাণে তাই বলে কোন তিক্ততাবোধ, কোন জ্বালা প্রবল হয়ে উঠেনি। তিনি ধীর স্থির চিত্তে সবাইকে আহ্বান করেছেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্ম করে সে দুর্দশামোচনে ব্রতী হতে। মোজাম্মেল হকের সাহিত্যে তাই কোন চড়া সুর লক্ষ্য করা যায় না। তিনি পুরাতন যুগের দৃঢ়মূল সংস্কার, বিশ্বাস নিয়েই জন্মেছিলেন; তাকে কখনই নিজ চিত্তভূমি থেকে একেবারে উন্মূল করতে পারেন নি। কিন্তু আধুনিক যুগের বার্তা কেমন করে যেন তাঁর চেতনায় ধরা দিয়েছিল; সে-চেতনার পূর্ণ স্বরূপকে তিনি উপলব্ধি করতে না পারলেও তাঁর চিন্তা ও কর্মে তা বেশ কিছুটা রঙ ধরিয়েছিল। তাই কোন মহৎ প্রতিশ্রুতির সদম্ভ ঘোষণা না করেই তিনি মুসলমান সমাজকে আধুনিক সাহিত্যের পথে এগিয়ে নেবার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। স্বাভাবিক যুগ-চেতনা বশেই যেন তিনি পুঁথির রাজ্য থেকে আধুনিক সাহিত্যের জগতে মুক্তি সন্ধানের গরজ বোধ করেছিলেন। তাই দোভাষী পুঁথির 'মুসলমানী বাঙ্গলা জবানের' প্রতি মমত্ব সত্ত্বেও তিনি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম মোশাররফ হোসেনের মত শিল্পীদের সাধনায় নির্মিত 'বিশুদ্ধ' বাংলা

সাধুভাষার গদ্যের রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন সকল দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি সমগ্র মুসলমান সমাজকেই সেই পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এক অর্থে, মুসলমানের জাতীয় দুর্দিনে তিনি বেশ সাহস করেই তাদের নতুন পথের নিশানা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। ক্ষমতা তাঁর সীমিত ছিল, কিন্তু সদিচ্ছার কোন অভাব ছিল না। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও সমাজ পারিপার্শ্বিকের সীমাবদ্ধতা, জীবন ও সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনে তাঁর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠতে দেয় নি, তা ঠিক। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয়, সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মোজাম্মেল হক বাংলার আধুনিক মুসলিম সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে রীতিমত একটা অসাধ্য সাধন করে গিয়েছেন।

নজরুল কাব্যত্রয়ী ঃ
অগ্নিবীণা-বিষের বাঁশী-ভাঙার গান

প্রবন্ধটির নাম 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য'। লেখা হয়েছিল ১৯০২ সালে। লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তা থেকেই কিছুটা তুলে ধরছি ঃ

"বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটিরূপ। একরূপে সে শেলীর Skylark-এর মত, মিল্টনের Bird of Paradise-এর মত এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না, কেবলি ঊর্ধ্বে-আরো ঊর্ধ্বে উঠে স্বপন লোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।

"আর একরূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে—অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন মাকে জড়িয়ে থাকে—তরুলতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী মাতাকে ধরে থাকে—তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

"ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে স্বর্গকে চায় না তা—নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে ঃ স্বর্গ যদি থাকে তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলার ধরাতেই নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবী চির দিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ ঔদ্ধত্যে সুরলোকের দেবতারা হাসেন। বলেন ঃ অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামি। এরাও চোখ পাকিয়ে বলে ঃ আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা।

উর্ধ্ব লোকের দেবতারা ভ্রুকুটি হেনে বলেন: দৈত্যের ঔদ্ধত্য কোন কালেই টেঁকে নি।

"নীচের দৈত্যশিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে: কেন যে টেঁকেনি তার কৈফিয়ৎই তো চাই, দেবতা। আমরা তো আজ তারই হেস্ত নেস্ত করতে চাই।

"দুই দিকেই বড় বড় রথী মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েট্‌স, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী, আর এক দিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্ণার্ডশ, বেনাভঁাতে প্রভৃতি।

"আজকের বিশ্বসাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।"

"এর অন্য রূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme এর মাঝে যে, সে এই মাটি মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। ......এই শিশু মনে করে—স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসি-মা। তবে সে তার মায়ের মত দুঃখিনী নয়, সে রাজরাণী, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। ......সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়—তার দুঃখিনী মাকে শোনায়। তার আর ভাইদের মত, তার অশ্রু জলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি—সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এদের দলে—লিওনিদ আঁদ্রিভ, নুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল রেঁমদ প্রভৃতি। বার্ণার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভঁাতের মত হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্‌গার করেন নি।

"যাঁরা ধ্বংসব্রতী—তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন—এ দুঃখ এ, বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল্ নল্‌চে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।"

উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু নজরুল কাব্যের রসলোক পৌঁছার স্বর্ণ সিঁড়ির সন্ধান এতে মিলে বলেই আমরা তা নিয়ে এতটা অগ্রসর হয়েছি। বিশ্বসাহিত্যের পথরেখা-অনুসন্ধানী কবি এখানে নানা

পথের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আপন মানস-মানচিত্রের যে পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা' বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে খুবই মূল্যবান বিবেচিত হবে। তাঁর কথার সুরে এটা প্রায় স্পষ্ট হয়েই দেখা দিয়েছে যে সাহিত্য রাজ্যের 'ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা নয়, 'নীচের দৈত্য শিশুর' বিদ্রোহী-মূর্তিই তাঁকে আকর্ষণ করেছে বেশী। 'সুন্দরের' হাতছানি তাঁকে মাঝে মাঝে উন্মনা করে তুললেও এ-আকর্ষণ প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর কবি কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর কাব্যে ধূলি-মলিন পৃথিবীর কর্দমাক্ত, ক্লেদ সিক্ত মানব-সন্তানের যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ও বেদনার সোচ্চার প্রতিকার কামনা, এ সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়। বস্তুত কাব্যে তিনি জীবনভর 'দুঃখী বেদনাতুর হতভাগ্যদের' একজন হয়ে তাদের বেদনার গান গেয়েছেন, তাদের পক্ষ নিয়েই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। ধূলি-মাটির পৃথিবীর সন্তানের দুঃখের প্রতিকারের মানসিক কামনা ব্যক্ত করে তিনি তৃপ্তি বোধ করেন নি, মানবের সকল বেদনা, সকল দুর্দশার উৎস অসাম্যের ভিত্তির উপর গড়া সমাজ-ব্যবস্থা উৎসাধন করে নতুন সমাজের ভিত্তি পত্তনের জন্যে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন রক্তমাখা' রিভোলিউশনের' বাণী। পুরাতনকে ভেঙ্গে চুরে খোল নল্‌চে বদলে একেবারে নতুন সৃষ্টির ভিত্তি পত্তন না করলে মানুষের দুর্গতি ঘুচতে পারে না। এ সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। মোট কথা মহাযুদ্ধের সদ্য রক্তস্নান থেকে জেগে উঠে সেদিনকার আর্তমানবতার কণ্ঠে সে আকাঙ্ক্ষাটি ধ্বনিত হয়েছিল, নজরুল ইসলাম সেই মানবিক আকাঙ্ক্ষাটি তাঁর কাব্যের মূলগত প্রেরণারূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। আনুভূতিক তীব্রতায় তাই বিদ্রোহীর উচ্চকণ্ঠ লাভ করেছে। নজরুলের দেশ ও কালের অগ্নিগর্ভরূপ এতে প্রয়োজনীয় উত্তাপ যুগিয়েছিল, একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাই রূপ ও রঙের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, নজরুল কাব্যে উদগীত বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করা এ কালের মানুষের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

যুগ ও জীবনের দাবীতেই নজরুল অমরার অমৃত-সাধনাকে অনেকটা তুচ্ছ করেই, তৃষ্ণাদীর্ণ মর্ত্যমানবের ব্যথা-বেদনার অগ্নিদাহের মধ্যেই জেগে

উঠেছিলেন, জাহান্নামের বুকেই পুষ্পের হাসি' ফুটিয়ে তোলার প্রায় অসাধ্য কাজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আমাদের জীবনে সেদিন যে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল; তার প্রচণ্ড আলোড়নে আমাদের জীবনের অতল গভীরে পাঁকের মত জমে-থাকা 'যুগযুগান্তের সঞ্চিত ব্যথার' গরল সহসা সবেগে জীবনের উপরিভাগে উত্থিত হয়ে আমাদের সামনে উদঘাটিত করেছিল মানুষের গরল-সিক্ত ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়। সে-গরল জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল সাধারণ মানুষেরও মনে। তা পান করে নজরুল হয়েছিলেন এ কালের নীলকণ্ঠ; কিন্তু সে বিষ হজম করে তিনি 'শিবত্ব' অর্জন করার সাধনা করেন নি, কবিতার মধ্যদিয়ে বিদ্রোহীর মত সে হলাহল উদগীরণ করেছেন। অগ্নিবীণা বিষেরবাঁশী-ভাঙ্গার গানে যে আগুন ঝরানো বাণী, যে বেদনাতিক্তস্বর, যে উন্মত্ত ধ্বংসকামনা ও ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে আমার বিশ্বাস; তার উদ্দেজক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে এ 'জীবন মন্থিত বিষ! 'একথা স্মরণ রাখলেই বোঝা যাবে, নজরুলের কাব্য কেন আর্টে'র বাঁধা নিয়মের শৃঙ্খলে আটকা পড়ে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' না হয়ে অবারিত গতি উচ্চৈঃশ্রবা' হয়ে উঠেছে। সমালোচকের নিষেধের বেড়ি ডিঙিয়েছে বলে তাঁকে হয়তো তাদের 'গোদা পায়ের লাথি' খেতে হয়েছে: কিন্তু তাতে তাঁর গতি রুদ্ধ হয়নি। উল্টো, 'গোদা পায়ে'র জ্বালা বেড়েছে।

এই যে 'আর্টের' সীমা লঙ্ঘন করেও নজরুল কাব্যের প্রাণসত্তা বিপর্যস্ত হয়নি, তার কারণ তাঁর কাব্যে অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল যাই থাক না কেন, তাতে তাঁর বিশেষ যুগের প্রশ্বাসটি অতি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। এ প্রশ্বাসের উষ্ণতা বহু যুগ পেরিয়ে আজও আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে যায়। ''সাময়িকতা' ও 'বর্তমানতা'র মধ্যে সঞ্চরণশীল হয়েও নজরুল কাব্য আমাদের স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়নি আর একটি কারণেও, বোধ হয় সেটিই সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ। সেটি হচ্ছে এর মধ্যে কবির দুর্বার দুর্জয় প্রাণাবেগের সঞ্চরণ এবং এক সহজ মনুষ্যত্ব বোধের অকপট অকুণ্ঠ প্রকাশ। এ দুটি বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যকে এমন একটা চারিত্র্য দিয়েছে, যা' মানুষের মনকে স্পর্শ করবেই, তার রক্তে আলোড়ন সৃষ্টি করবেই। সহজ কথায় বলা চলে, যুগ ও জীবনের মূল প্রবৃত্তিকে

জিহ্বা বিস্তার করে। আজ তার দাবী না মিটিয়ে সভ্যতার মৃত্যু রোধ করবে কে? তাই গণের বুভুক্ষা ও বেদনার কেন্দ্রে আসন পেতে সাহিত্য আজ তার নবমুক্তির পথ সন্ধানে ব্রতী হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে এই গণ-কণ্ঠ প্রথম সরব হয়ে উঠেছে নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী ও ভাঙার গানের মধ্য দিয়ে। প্রকৃত-পক্ষে এ কাব্যত্রয়ীর মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যের গণযাত্রা শুরু হয়েছে। এ পথের কলধ্বনি মধুসূদন কিছুটা ক্ষীণভাবে শুনতে পেয়েছিলেন, রবীন্দ্র-নাথ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তা সুস্পষ্টই শুনতে পেয়েছিলেন এবং কিছুটা দূর থেকেই তাতে কণ্ঠ মেলানোর চেষ্টাও করেছিলেন। নজরুল ইসলাম সদম্ভ ঘোষণা করে, বলিষ্ঠ পদপাতে এগিয়ে গিয়ে তাতে নিজের উচ্চ কণ্ঠ জুড়ে দিলেন। তাঁর এই স্পর্ধিত পদক্ষেপকেই অনেকেই প্রথম প্রথম সুনজরে দেখতে পারেন নি। এত হৈ হল্লোড় বাঁধিয়ে বাণীর সেবা করা সম্ভব কি না, এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। কিন্তু সংশয়ের অবিশ্বা-সের কুয়াশা যখন কেটে গেল, তখন সবাই সবিস্ময়ে দেখল গণ-জীবনের দুঃখ বেদনার চুয়াট হৃদ্রক্ত দিয়ে তৈরী হয়ে গিয়েছে এক আশ্চর্য উষ্ণ কবিত্বের পথ। অতীত ঐতিহ্যের স্বর্ণছড়ানো পথের মমত্বময় আকর্ষণকে সযত্নে পোষণ করে, বর্তমানের নানা কুশ্রীতা ও কণ্টকসমাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে, এক ক্লেদমুক্ত আশা সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তা হাত বাড়িয়েছে। পরম এক প্রত্যাশার আবেগে তা কম্পমান। পথের কাঁটা দূর করতে গিয়ে তিনি 'বিদ্রোহীর' মত ক্ষমাহীন আক্রোশে গর্জে উঠেছেন বটে, কিন্তু তারও ভিতর একটি অশ্রুত কারুণ্যের সুর যেন বার বার উথলে উঠেছে। বিদ্রোহের এ-এক অভিনব রূপ বটে। এ বিদ্রোহ আসলে কোন মতবাদের উত্তেজনার ফল নয়, এর অন্তর প্রেরণারূপে কাজ করেছে কবির স্বভাবগত অকৃত্রিম মানবপ্রেম। আর প্রেমাবেগের বিশ্বস্ততাই 'সাময়িকতা ও বর্তমানতার' মধ্যে সঞ্চরণশীল কবির কাব্যকে খাঁটি কবিত্বের জিনিস করে তুলেছে।

'অগ্নিবীণা বিষের-বাঁশী ভাঙার গান' লিখে কাব্যকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার করে তুলে নজরুল আমাদের দেশে সত্যিকার গণসাহিত্য রচনার পথ দেখিয়েছেন। একথাও আমাদের স্মরণ

রাখতে হবে। বাংলাদেশের আর কোন কবির কাব্য এমন করে জাতিকে মাতায়নি, তাতায়নি। তাই কোন কবির কাব্যই নজরুল কাব্যের মত জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। 'কবিতা'কে এই যে নতুন দিগন্তের দিশারী করে তোলার চেষ্টা, তা নিঃসন্দেহে এক বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা। এ চেষ্টাকে 'বিদ্রোহ' নামে আখ্যাত করতে হলে আমাদের একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে এমন বিদ্রোহ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে, একবার নয়, একাধিকবার। বিশেষত যখনই কাব্যে পুরাতন ধ্যান-ধারণার উচ্ছেদ সাধন অথবা পূর্বতন ঐতিহ্যের নতুন মূল্যায়নের সাহসিক প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে, তখনই বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। মাইকেল বিদ্রোহ করেছিলেন বাংলা কাব্যের প্রথাবদ্ধ রূপ ও ধ্যান-ধারণার উচ্ছেদ ঘটিয়ে; নতুন কাব্যাঙ্গিক প্রবর্তন করে এবং পুরাতন ঐতিহ্যের নব মূল্যায়নের সাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়ে। আবার অতি আধুনিক বাংলা কাব্যের উন্মেষপর্বে দেখি রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় কাব্যবাদের বিরুদ্ধে দেহাত্মবাদী মোহিতলাল ও দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ। সত্যেন্দ্রনাথও বিচিত্র ছন্দকলা ও ভাষার কারুকলার আশ্রয়ে কাব্যে সামগ্রিকতাকে মূল্য দিয়ে কিছুটা বিদ্রোহ করেছিলেন। এদের সবাইর বিদ্রোহ ভাবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। নজরুল তাকেই নবতর তাৎপর্য দিলেন কবিতাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন বাস্তবের প্রচণ্ড তোড়ের মধ্যে স্থাপন করে। আর তাতে করেই জাতীয় জীবনে এর তাৎপর্য বেড়ে গিয়েছিল অসাধরণ-রূপে। ঐ বিশেষ কারণেই দেখতে পাই 'বিদ্রোহী' বিশেষণটি নজরুলের একেবারে কণ্ঠভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'বিদ্রোহ' মূলক কাব্য হলেও 'অগ্নিবীণা বিষের বাঁশী ও ভাঙার গান' কাব্যত্রয়ী এক অর্থে উদ্বোধনমূলক বটে। কাব্যত্রয়ে কবি যে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার একটি নৈতিক ভিত্তি আছে বলেই তাকে নিছক বিদ্রোহী বলা চলে না। জরা-জীর্ণ পুরাতনকে উৎসাদন করে, সকল শোষণ-অত্যাচারের মূল বিনাশ করে নতুনের ভিত গড়বার পবিত্র অঙ্গীকার নিয়ে উপস্থিত এ বিদ্রোহী। তিনি সবাইকে আহবান করেছেন 'চির উন্নত শির' নিয়ে জেগে ওঠার জন্যে, সবাইকে ধ্বংস দেখে ভয় করতে

নিষেধ করেছেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন 'বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে' যে ভয়ঙ্কর এগিয়ে আসছে বিপ্লবের বেশ ধরে, সে নতুনের 'জয়কেতন' উড়িয়েই আসছে। সেই নতুনের অভ্যর্থনার জন্যে তিনি সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। ভেদবৈষম্য কণ্টকিত, জড়তায় ক্লিষ্ট, দুঃখ-দৈন্যে জর্জরিত আর্ত-অসহায় জাতির পক্ষে এ নতুনের আশ্বাস নিশ্চয়ই বড় মধুর। জাতির দুর্বল ধমনীতে উৎসাহের রক্ত-সঞ্চার করে নজরুল এভাবে জাতীয় জাগরণের কাজকেই ত্বরান্বিত করেছেন।

আগেই বলেছি, সমসাময়িক জীবনার্ত থেকে প্রাণরস আহরণ করেও যে 'অগ্নিবীণা-বিষের-বাঁশী-ভাঙার গান' কাব্যত্রয়ী রসিকচিত্তে সাড়া জাগাতে পেরেছিল, তার কারণ আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততাজনিত একটা প্রচণ্ড উল্লাস; এ উল্লাস কাব্যভাবনার সাথে কাব্যের ভাষা ও ছন্দকেও প্রভাবিত করেছে বিপুলভাবে, ভাষায় এনেছে একটা অপূর্ব চাঞ্চল্য, একটা উন্মদনা, একটা ওজস্বিতা ছন্দকে করেছে নৃত্যচঞ্চল অথচ গতিমুখর। একথা ঠিক আবেগের প্রচণ্ডতায় কাব্যিক ভাব ভাবনা, ভাষা ও ছন্দের সাথে এসে সমীকৃত হয়েছে অনেক অকাব্যিক উপাদানও। তবুও তা, কখনই কাব্য প্রবাহকে মন্দীভূত করেনি, সৃষ্টি করেনি কোন অস্বাস্থ্যকর পঙ্কল। এ প্রবাহে কখনও দেশ-কাল-ঐতিহ্যের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে, আবার কখন তা মুক্তবেণী হয়ে বিভিন্ন খাত রচনা করে আপনার পথ করে চলেছে। কোথাও তা আচারের মরু বালুরাশির মধ্যে পথ হারিয়ে যেলেনি। সাময়িক ঘটনাবর্ত যেমন এ প্রবাহকে বিক্ষুব্ধ করেছে তেমনি ঐতিহ্যভাবনা ও আদর্শ জীবন ভাবনা একে সংস্থিত হতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। আর একটি কারণেও নজরুল কাব্য কতকটা সহজাত সার্থকতার অধিকারী হয়েছিল। সেটি হচ্ছে তাঁর কবি-সত্তার পিছনে ক্রিয়াশীল এক সহজাত মনুষ্যত্ববোধ; তার উল্লেখ ইবিপূর্বেও প্রসঙ্গান্তরে করেছি। এই বোধই একদিকে তাঁকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানুষের সত্যরূপ আবিষ্কারের সহজ ক্ষমতার অধিকার যেমন দিয়েছিল, তেমনি ঐতিহ্যভাবনার ক্ষেত্রে তাঁকে স্বদেশী বিদেশী উপাদান অকুণ্ঠভাবে গ্রহণের শুভবুদ্ধি যুগিয়েছিল। ভায়ার ক্ষেত্রে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও বাংলাশব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের সহজাত

ক্ষমতাটিও ঐ উদার জীবনবোধের অনুষঙ্গ হিসেবেই তাঁর কাব্যে দেখা দিয়েছিল, তা মনে করলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। এতৎ সত্ত্বেও কবির বন্ধনহীন স্বভাব কবিতার রূপকর্মে প্রাযত্নিক শৈথিল্য ঘটিয়ে তাঁর কাব্যকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, একথা স্বীকার না করে পারা যায় না।

নজরুল ইসলাম নিজেই তাঁর কাব্যের ত্রুটির কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি ভাল রংরেজ নন বলেই তাঁর কাব্যে গানে হয়ত বাঞ্ছিত রূপ-রঙ ফুটে ওঠেনি। আসলে তাঁর কাব্যে সহজাত শিল্পবোধের প্রকাশ প্রায় কোথাও ব্যাহত হয়নি। তবে স্বভাব বৈগুণ্যে আর্টের বাঁধা নিয়মের বল্‌গা কষে চলতে গিয়ে তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত বলেই, তিনি কোথাও কোথাও আবেগ প্রকাশে কিছুটা বেশী স্বাধীনতাই নিয়ে ফেলেছেন। তার ফলে আবেগের মাত্রাধিক্য কাব্যদেহে একটা শিথিলতা এনে দিয়ে তার শিল্পমূল্য অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত লীলা প্রায়শঃই বজায় থাকায় তাঁর কাব্য কখনই আর্টশালা রক্ষী প্রাণহীন "আনন্দ গুণ্ডার" খপ্পরে পড়েনি। মোটকথা আর্টের বাঁধা রাস্তায় যান্ত্রিক নিয়মে ছেটে-কেটে আপন অনুভূতিকে চালিত করতে নজরুলের নিদারুণ আপত্তি ছিল। তাঁর কবি-স্বভাবের সায় না থাকায় তিনি এতে বড় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তাই তিনি আবেগের অবারিত পথেই সর্বথা চলাফেরা করেছেন। এতে করে আর যাই হোক তাঁর শিল্পী-সত্তার অপমৃত্যুর পথ রুদ্ধ হয়েছে। নজরুল-কাব্য তাই শিল্প-সুন্দর না হলেও, স্বভাব-সুন্দর। এর যা কিছু শিল্পসুষমা তা যেমন প্রাণ-বায়ুর মত সহজ ও স্বাভাবিক, এর তাবৎ ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাই। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গানের কবির মাহাত্ম্য অনুধাবনকামী পাঠক এই কথা স্মরণ রাখলেই কাব্য পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন এবং কবিকে শ্রদ্ধা-প্রীতির সাথে বরণ করে নিতে পারবেন। অন্যথায়, নজরুল-কাব্য পাঠক কিছুটা বিড়ম্বিত হবেন বই কি।

এবার 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গানের' বাণীলোকে প্রবেশ করা যাক। 'অগ্নি-বীণায়' ১২টি, 'বিষের বাঁশী'তে ২৬টি এবং 'ভাঙার গানে'

১১টি-মোট ৪৯টি কবিতা ও গানের মালিকা গ্রথিত হয়েছে কাব্যত্রয়ীতে। এদের সুর ও স্বরের সমগোত্রীয়তাই কাব্যত্রয়ীর মূলগত ঐক্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। আগেই বলেছি এ কাব্যত্রয়ী যুগ-বেদনা সঞ্জাত। স্বভাবতঃই জীবনের হৃৎ-স্পন্দন এতে অনুভূত হবেই। এ কাব্যত্রীয়র মধ্যে 'অগ্নি-বীণা' শুধু সৃষ্টি হিসেবেই প্রথম নয়। এটি কবির সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং আজ পর্যন্ত সর্বাধিক প্রচারিত কাব্য। 'অগ্নি-বীণা'র অগ্নিক্ষরা ভাষায় যে প্রচণ্ড প্রাণোন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছিল, তারই মধ্য দিয়ে আমরা যেন "যুগ নির্মাতা রুদ্রদেবের আগমন ধ্বনি" শুনতে পেয়েছিলাম। সেযু গদেবতার আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল প্রলয়ের ঝঞ্চার পথ ধরে, নতুনের কেতন উড়িয়ে, বজ্র শিখার মশাল জ্বেলে ভয়ঙ্কর কাল বৈশাখীর ঝড় রূপে। তার ধ্বংস ভয়াল রূপকে স্বাগত জানাতে কবি কোন কুণ্ঠাই বোধ করেন নি। তাই দেখি "অগ্নি-বীণা"র প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাসে' কবি তার জয়ধ্বনি করেছেন। এই ভাবে যুগ পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে গিয়েই আপনার ভিতর অহং-এর এক মহিমময় রূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে কবি-আত্মা জেগে উঠল 'বিদ্রোহী' রূপে। এই 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রকাশ পেল এক অভূতপূর্ব আত্মবোধ, সুতীব্র অহমিকা। তার প্রচণ্ডতায় ও ব্যাপকতায় কবি হলেন উচ্চকিত। সৃষ্টির সকল সুষমা এবং এর রুদ্র-ভয়াল রূপের মধ্যে সামঞ্জস্যকামী কবির এ আত্মবোধ সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় স্বাক্ষরিত হয়ে মহা তাৎপর্যবাহী কবিতা হয়ে দেখা দিয়েছিল সে-দিনকার জাগরণকামী মানুষের কাছে। ওয়াল্ট হুইটম্যানের song of myself. কবিতার মত 'বিদ্রোহী'ও অনেকটাই রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় উদ্বোধিত মানব-চিত্তের ঘোষণা। 'বিদ্রোহী' সে-দিন জাতির দুর্বল মেরু-মজ্জায় অপূর্ব শক্তির সঞ্চার করেছিল, তাকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে স্বর্ণ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে চালিত করেছিল। 'বিদ্রোহী' তার জন্মলগ্নের কিছুকাল আগেই রচিত মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' কথিকাটির ন্যায় অহং-সর্বস্ব চিন্তার জটিল প্রহেলিকা না হয়ে গভীর সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ জীবনবাণী হয়ে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে সেদিন মুক্তিকামী বাঙালী যে ভাবে

মুক্তিপাগল হয়ে উঠেছিল, তার পথে শক্তি, সাহস ও প্রত্যয় যুগিয়েছিল 'বিদ্রোহী' কবিতা। জনচিত্ত জয়ী এ কবিতাটির কারুকর্মে যতই দোষ থাকনা কেন সামগ্রিকভাবে এটি একটি উৎকৃষ্ট মহৎ ভাবব্যঞ্জক কবিতা বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য। সমালোচকরা এর শত দোষ নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে 'বিদ্রোহী'তে ভাববিরোধ ঘটেছে, ভাবের অসংযম রয়েছে, ধর্ম তথা ঈশ্বর বিদ্রোহিতা প্রকাশ পেয়েছে, অতএব তা অপাঠ্য। অনেকের মতে 'বিদ্রোহী'তে একটা অপ্রতিহত, দুর্দান্ত পৌরুষ, উদ্দাম উন্মুক্ত হৃদয়াবেগ ও বীর্যবন্ত 'চির উন্নত শির' অহমিকার প্রকাশ ঘটেছে। এতে বিদ্রোহীর মহনীয়তা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকেনি। কারণ প্রবল আত্মবোধ সম্পন্ন বিদ্রোহী যখন "আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ" বলেই পরমুহূর্তে বলেন, "আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না" তখন সঙ্গত ভাবেই আমাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, এ বিদ্রোহী তো যথার্থ বিদ্রোহী নয়। 'সচেতন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ যে মানব চিত্ত, তার তো এরূপ বিশ্রাম কাম্য হতে পারে না।' সকল বন্ধন ছিঁড়ে অনন্ত প্রগতি লাভই তো তার কাম্য। আর এ প্রগতির যখন শেষ নেই, তখন বিদ্রোহীরও ক্লান্তি থাকতে পারে না, বিশ্রাম থাকতে পারে না।

অনেকে 'বিদ্রোহী'র ভাবের ন্যায় এর ভাষায়ও অসংযম দেখেছেন। এর অনেক অংশই অকাব্যিক বলে নির্দেশ করেছেন। তবু 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে ভাবের বিচ্ছুরণ ঘটেছে, তার মূল্য কোন মতেই তুচ্ছ নয়। 'বিদ্রোহী' মানবাত্মার এমন রুদ্র রূপের পরিচয় কাব্য-সাহিত্যে আর মেলে না। কাব্য ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ততার জন্যেই নানা অসঙ্গতি সত্ত্বেও 'বিদ্রোহী' কবিতা আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। বাংলা কাব্যে এ কবিতার গুরুত্ব সামান্য নয়। এ 'বিদ্রোহী' কবিতার শিরোপা নিয়েই প্রকৃতপক্ষে বাংলা কাব্যের জনযাত্রা শুরু হয়েছে। আজ অবধি এ কবিতা সে-যাত্রা পথে 'beacon light' এর কাজ করে যাচ্ছে। এদেশের অপর কোন কবিতা এমন করে আমাদের জাতীয় জীবনের গতি পথে নিয়ামক শক্তির প্রভাব বিস্তার করেনি। সঙ্গত কারণেই 'বিদ্রোহী' সর্বাধিক পঠিত ও জনপ্রিয় কবিতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

'বিদ্রোহীর' পরিপূরক কবিতা 'ধূমকেতু'। নজরুলের কবি-সত্তার স্বরূপটিই যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে এ-কবিতায়। কবির অন্তরের বিষ জ্বালা ও অস্থিরতাই এখানে বিদ্রোহকে তীব্রতর করেছে। এক সুতীব্র অহংবোধ এ কবিতারও উদ্দীপক শক্তি। এ অহং মাঝে মাঝে নাস্তিক্য বুদ্ধির বড়াই করেছে বটে, তবে নাস্তিক্য বুদ্ধির চেয়ে শক্তিমান কবি হৃদয়ের অনমনীয় আত্ম-প্রত্যয়ই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। 'বিদ্রোহী'র মত এ কবিতাও সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় স্বাক্ষরিত বলে জাতীয় জীবনের পক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছিল। 'রক্তাম্বর ধারিণী মা' এবং 'আগমনী' কবিতা দুটি হিন্দু দেবদেবী কল্পনার উপর ভিত্তি করে লেখা যুগচেতনা-সিঞ্চিত অপূর্ব সুন্দর কবিতা। প্রথমোক্ত কবিতায় তিনি 'শ্বেত বসনা শতদল বাসিনী' সরস্বতীকে 'রক্তাম্বরধারিণী' 'দনুজ-দলনী' মূর্তিতে, 'অশিব-নাশিনী চণ্ডীরূপে' আবাহন করেছেন আমাদের জীবনের দৈন্য ও ক্লীবত্ব দূর করে দিয়ে 'ধ্বংসের বুকে সৃষ্টির নবপূর্ণিমা'র আয়োজন করার জন্যে। দ্বিতীয় কবিতা 'আগমনী'তে তিনি দেবী দুর্গাকে আবাহন করেছেন দানব-শক্তিকে পায়ে পিষে বরাভয় বাণী নিয়ে বাংলার গৃহাঙ্গণে উপস্থিত হতে। সন্তানের দৈন্য, ক্লীবত্ব ও অন্ধত্ব মোচনের জন্যেই তার উদ্দেশ্যে কবির আহ্বান।

'কামাল পাশা' ও 'শাত-ইল-আরব' কবিতার প্রেরণা যুগিয়েছিল অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পাক ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের শুভ প্রচেষ্টা। তুর্কীবীর কামাল নজরুলের দৃষ্টিতে এদেশের জনগণকে নেতৃত্বদান করতে পারেন এমন একজন নেতারই আকাঙ্ক্ষিত প্রতিরূপ বলে প্রতিভাত হয়েছেন। কবিতাটিতে কামালের নির্দেশে পরিচালিত তুর্কী সৈনিকদের 'আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস ও বেদনার' মধ্যে নজরুল নিজ দেশের পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছেন। রূপকর্মের অভিনবত্বেও এ-কবিতাটি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তুলনা বিরহিত। 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় কবি শাত-ইল আরবের অতীত মহিমা ও বর্তমান দৈন্যের কথা বলে প্রকৃতপক্ষে এদেশেরই হীনদশা স্মরণ করে বেদনা প্রকাশ করেছেন। 'রণভেরী', 'খেয়াপারের তরণী'

'কোরবানী' ও 'মোহররম্' এই পাঁচটি অবশিষ্ট কবিতায় ''কবি মুসলমান সমাজের বর্তমান দৈন্য, কাপুরুষতা ও ব্যর্থতার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। ''কবিতাগুলোতে কবি ইসলামের ত্যাগ, শৌর্যবীর্য ও অধ্যাত্ম মূল্যবোধের আলোকে জাতিকে নতুন করে সঞ্জীবিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন, তাকে ডাক দিয়েছেন মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্যে। কিন্তু সে আদর্শে আজ আর কেন যেন তারা উজ্জীবিত হচ্ছে না। তাই কবির আক্ষেপ, 'ঐ ইসলাম ডুবে যায়'। কবি যে বিদ্রোহী হয়েও ধর্মীয় মূল্যবোধে আস্থাবান, এসব কবিতায় তার যেমন প্রমাণ মেলে, তেমনি কবি যে পুরাতন ঐতিহ্যকে নবমূল্যে উদ্ভাসিত করতে সমুৎসুক তারও প্রমাণ মিলছে যথেষ্ট।

'অগ্নি-বীণা'য় নজরুলের কবি-আত্মার যে উল্লাস দেখা দিয়েছিল, তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনতিক্রম্যই থেকে গিয়েছে। এর কাব্যভাবনার স্বতঃস্ফূর্ততা ও বলিষ্ঠতা, এর ভাষার ওজস্বিতা ও গতিশীলতা এবং এর ছন্দোকলার বিস্ময়কর বৈচিত্র্যই কাব্যটিকে আদরণীয় করে তুলেছিল। তাছাড়া যুগজীবনের তরঙ্গদোলা বক্ষে ধারণ করায় 'অগ্নি বীণা'র সুর-ঝংকার এমনিতে যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছিল। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যিক গুণে ত বটেই, অন্যদিক দিয়ে বিচার করলেও নজরুলের শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

'অগ্নি-বীণা'র অগ্নিগর্ভ বাণীর ঝঙ্কার মিলিয়ে যেতে না যেতেই কবি 'বিপ্লব বাঁশী'তে সুর সংযোজন করলেন। "চিরতিক্ত প্রাণের' গভীর থেকে উদ্গত ''কণ্ঠছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত'' গান রচনার সঙ্কল্প থেকেই 'বিষের বাঁশী'র সুর লহরীর উদ্ভব। কাব্যের ভূমিকায় এ সম্পর্কে কবি জানিয়েছেন: "বিষের বাঁশী'র বিষ যুগিয়েছেন, আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।" বিষের বাঁশীর সুরে যে তাই বিদ্রোহের রেশ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে রাজরোষে পতিত 'অগ্নি-বীণার' পরিণাম দেখে তিনি যে এ কাব্যে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তা তাঁর ভূমিকার বক্তব্য থেকেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, "বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ আইন-রূপ "আয়ান

ঘোষ" যতক্ষণ তার বাঁশ উচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত 'বিদ্রোহ-রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধির কাজ। ঐ 'ঘোষের পো'র বাঁশ বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশী লাগ্‌লে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী।" এতখানি হিসেব করেও কি কবি শেষ রক্ষা করতে পেরেছিলেন? পারেন নি যে, তার প্রমাণ এ কাব্যও 'অগ্নি-বীণা'র ন্যায় রাজরোষে পতিত হয়ে অচিরেই লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বস্তুত কবি যাই বলুন না কেন, "বিষের বাঁশী'র অধিকাংশ কবিতা ও গান বিদ্রোহের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির। "অগ্নি-বীণা"র সাথে এ-কাব্যের সুর ও স্বরের সঙ্গতি এতটাই বেশী যে একে "অগ্নি-বীণা"র দ্বিতীয় খণ্ড বললে অত্যুক্তি হয় না। কবির প্রাথমিক সংকল্প বিশেষ কারণবশত পরিত্যক্ত না হলে, এটি যে "অগ্নি-বীণা"র দ্বিতীয় খণ্ড রূপেই প্রকাশিত হত, এ তথ্য স্বয়ং কবিই আমাদের উপহার দিয়েছেন।

'বিষের বাঁশী"র ছাব্বিশটি রচনার মধ্যে আঠারটিই গান। এ গান গুলোর উদ্দীপন ভাব যুগিয়েছে পরাধীনতার জ্বালাবোধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশের দুঃখবেদনার প্রতি গভীর সমবেদনাবোধ। পরাধীনতার অভিশাপের বিরুদ্ধে, স্বদেশ প্রেমের নিজস্ব মূর্তি নির্মাণেই "বিষের বাঁশী'র বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। 'বিদ্রোহীর বাণী' শীর্ষক কবিতায় নজরুল সে বিদ্রোহের স্বরূপ নির্দেশ করেই যেন বলেছেন, 'যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ।" তাই 'ধামা-ধরা, জামা-ধরা, মরণ-ভীতু' ক্লীবদের পথের বাধা বিবেচনা করে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন এবং তাঁর বিদ্রোহের লক্ষ্য কি তা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন: "আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ-স্বাধীন করব দেশ।" এ স্বাধীনতার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাই উত্তাল হয়ে উঠেছে 'বিষের বাঁশী'র বিভিন্ন কবিতা ও গানে। প্রথমে আমরা কবিতাগুলোর কথাই ভেবে দেখছি: 'বিদ্রোহীর বাণী' কবিতাটি ছাড়া 'সেবক', 'জাগৃহি'' অভিশাপ,' 'মুক্ত পিঞ্জর' এ চারটি কবিতায় কবি-বিদ্রোহীর অন্তর্লোকের সন্ধান আমরা কতকটা পাই। 'সেবক' কবিতায় কবি আদর্শ দেশ-সেবকের অপরূপ মহিমান্বিত মূর্তিকে

আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, চোখে তার "জয় সত্যম্ মন্ত্র-শিখা", তার বজ্রহাতের ঘায় 'ত্রিশ কোটি মানুষের জিন্দানের ভিত্তি নড়ে ওঠে'। এ মূর্তির পেছনে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা গান্ধীর ছায়াপাত ঘটলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সংস্কৃত তোটক ছন্দে রচিত 'জাগৃহি' কবিতায় কবি দেশমাতার 'ছিন্নমস্তা' কালীরূপ এবং কল্যাণী-মাতৃমূর্তি দুর্গারূপ দুই রূপের কল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপেরই যেন ছবি এঁকে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। 'অভিশাপ' কবিতায় বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' কবিতার সুরেরই অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। এ কবিতায় সুতীব্র অহমিকাবোধ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতার অধিকারকেও যেন ছাপিয়ে উঠেছে। এ আসলে এক ধরনের আত্মবোধে উদ্দীপ্ত মানুষের প্রচণ্ড আত্মাভিমানেরই প্রকাশ। এতে যারা নাস্তিক্যের স্পর্ধা দেখেন তারা ভুল করেন। বিধাতার সাথে নিরন্তর লড়াইয়ে তার উৎসাহ দেখে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আসলে এ-অহংবোধ বিধাতার কাছে আত্মনিবেদনেরই একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা মাত্র। এর প্রকাশে যে ঔদ্ধত্য, যে সীমাহীন স্পর্ধা দেখা যায়, তা বিদ্রোহীর বটে, যে বিদ্রোহী মানুষকে চির উন্নত শির নিয়ে সকল বাধা বিপত্তির মোকাবেলা করতে উদ্দীপনা যোগায়। 'মুক্ত পিঞ্জর' কবিতায় বিদ্রোহী রোমান্টিক কবির স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই যেন ভাষা পেয়েছে। পরাধীনা দেশ-মাতার মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে কবি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে স্থান পেয়েছিলেন। সে কারার লৌহকবাট খুলে বাইরে এসেও তিনি শান্তির স্বাদ পেলেন না, কারণ তাঁর দেশ জননীর বন্দিনী দশা যে ঘোচেনি। এ-চিন্তাই তাঁকে বিষাদযুক্ত করেছে। 'বিষের বাঁশী'র অপর কবিতা 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ) একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটির বৈশিষ্ট্য এইখানে যে কবি 'ঝড়ের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস, প্রচণ্ড মত্ততা, দুরন্ত বেগ এবং অবশেষে অশ্রান্ত বৃষ্টি ধারার মধ্য দিয়ে তার ভয়ঙ্কর রূপ সংহরণের সুন্দর একটি বাস্তব চিত্র এঁকে তারই মধ্য দিয়ে অনাগত বিপ্লবের আগমনী সংকেত ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বিষের বাঁশী'র বাকী দুটি কবিতা এ কাব্যের মূল সুরের সাথে অনেকটাই সংশ্রবহীন বলে মনে হয়। হজরত মোহম্মদের (দঃ) আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষ্য করে রচিত 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম্' নামক এই কবিতাদ্বয় 'বিষের বাঁশী'র প্রথমেই অবশ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে নবী মোহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাব ও তিরোভাবের তাৎপর্যানুযায়ী কবি-ভাবনার উত্থান-পতনের দোলা সঞ্চারিত হয়েছে।

'বিষের বাঁশী'র প্রধান সম্পদ এর গানগুলো। গানগুলোতে কবি ভাবনার যে একটি বৃত্ত গড়ে উঠেছে তার নাম দেওয়া যেতে পারে স্বদেশ আত্মার উদ্বোধন কামনা। কোথাও তিনি নব জাগরণের নকীব রূপে আমাদের 'অভয় মন্ত্র' শুনিয়েছেন, 'বজ্র বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান বাজিয়ে জাতির আত্ম শক্তির 'উদ্বোধন' কামনা করেছেন, কোথাও বা 'তূর্য-নিনাদ' তুলে জাতির বুকের 'গুরু লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার' অপসারণের আহ্বান জানিয়েছেন। আবার কোথাও তিনি নতুনের 'বোধন' গান গেয়ে অত্যাচার উৎপীড়নে পর্যুদস্ত মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন। 'মরণ বরণ' গান শুনিয়ে মরণ-ভীতু মেষতুল্য মানুষদের তিনি বীর্যবন্ত মনুষ্যত্বের আদর্শের মধ্যে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন। 'যুগান্তরের গান' গেয়ে তিনি দুর্যোগ রাত্রির শেষে নবযুগের স্বাধীন মুক্ত জীবনের আবাহন করেছেন। সত্যের বরাভয় মন্ত্রে আস্থা স্থাপন করে সকল মিথ্যা, বাধা চূর্ণ করে এগিয়ে যেতে পারলেই মড়ার হাড়ে আবার নতুন প্রাণ-সঞ্চারিত হবে এবং দেশমাতা মনোহর মূর্তিতে আমাদের সামনে জেগে উঠবেন, এমন একটি বিশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

'বন্দী-বন্দনা', 'বন্দনা-গান', 'মুক্তিসেবকের গান', 'শিকল পরার গান', 'মুক্তবন্দী'—এই পাঁচটি গানের উদ্দীপন ভাব যুগিয়েছে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে কবির কারাবরণের স্মৃতি। কারার নিপীড়ন কবির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করতে তো পারেই নি, উপরন্তু তাকে আরো প্রবল করে তুলেছিল। কাজেই দেখতে পাই 'ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন, বক্ষে গুরু শিলা 'হস্তে বন্ধন' নিয়ে যে বন্দী স্বাধীনতার দুর্মর স্বপ্ন দেখছে তারই বন্দনা করেছেন মুক্তির প্রদীপ্ত মহালগ্নে, স্বাগত জানিয়েছেন তাদের, 'শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারি',

মুক্তি সেবকদের আশ্বাস বাণী শুনিয়েছে 'ঐ কারা-ঘর তো নয়-হারা ঘর, হোথায় মিলে মা'র দেওয়া বর রে।' আবার 'শিকল পরা গান' গেয়ে তিনি এই বলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন যে "এই শিকল ঝঞ্ঝনা, এ যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা।" 'মুক্ত-বন্দী'র প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনা ও অভিনন্দনের মধ্যে ঐ একই মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া, 'আত্মশক্তি' 'সত্যমন্ত্র', 'বিজয় গান', 'চরকার গান', 'পাগল পথিক' ইত্যাদি গানেও দেশের মুক্তি কামনাই বিচিত্র সুরে ঝংকৃত হয়েছে। 'আত্মশক্তি' শীর্ষক গানে কবি আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ দেশের বীরসন্তানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'সত্যমন্ত্রে' কবি গান্ধীকে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও মোহম্মদের (দঃ) মত চির অবনত ভাগ্যহত মানুষের মুক্তি সাধক বলে নন্দিত করেছেন। 'বিজয় গানে' কবি দেশ জননীর মুক্তিস্বপ্নে কবিচিত্তের আশা ও ভরসাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। 'চরকার গানে' নজরুলের স্বদেশভাবনা নতুন মাহাত্ম্য লাভ করেছে। স্বরাজকামী দেশবাসীকে স্বাবলম্বনে দীক্ষা দিতে গিয়ে গান্ধী চরকার প্রবর্তন করেছিলেন। নজরুল যদিও গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের প্রতি তেমন আস্থাবান ছিলেন না, তবু এর মানবীয় দিকটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই চরকাকে হিন্দু-মুসলমানের আত্ম-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সৌভ্রাত্র চেতনা সঞ্চারী শক্তি বলে অভিনন্দিত করেছেন। চরকার ঘর্ঘর আওয়াজের মধ্যে তিনি স্বরাজের সিংহ দরজা খোলার আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলেন। কবির স্বদেশ ভাবনা অমনি করেই নানা উপলক্ষ্যে স্ফূর্তি লাভ করেছে। 'পাগল পথিক' গানটিতে গান্ধীজী ও তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। ত্রিশ কোটি দেশবাসীকে সেদিন মরণ গান শুনিয়ে মাতিয়ে তুলেছিলেন মুক্তি পথের 'পাগল পথিক' গান্ধী, সে-কথা মুক্তি পাগল নজরুলের চেয়ে আর বেশী কে জানতেন!

'বিষের বাঁশী' কাব্যের অবশিষ্ট দুটি গানের নাম হচ্ছে 'জাতের বজ্জাতি' ও 'ভূত ভাগানোর গান'। এতে নজরুল ব্যঙ্গের কশাঘাত করে জাতিভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের অভিশাপে জর্জরিত পঙ্গু, জড়াগ্রস্ত

দেশবাসীকে মনুষ্যত্বের পথে জাগিয়ে তোলার প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন। 'জাতের বজ্জাতি' শীর্ষক চমৎকার জনপ্রিয় গানটিতে কবি বলতে চেয়েছেন যে অন্তঃসারশূন্য জাতিভেদ প্রথা এদেশের মানুষের মনুষ্যত্বকে টুঁটি টিপে মেরেছে, তাই 'মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কা হুয়া।' জাতিভেদ প্রথা জাতীয় সংহতিকে বিপর্যস্ত করে এদেশের পরাধীনতার পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে বলে কবির ধারণা। তাই এর উৎসাদন অবশ্যই কাম্য। 'ভূত ভাগানোর গানের' ব্যঙ্গটি রীতিমত উপভোগ্য। তেত্রিশ কোটি দেবতা আজও ভূতের ভীতির মত জেগে আছে দেশবাসী হিন্দুর শিরের কাছে, সহস্র মিথ্যা, কুসংস্কারের জাল পেতে। এ মিথ্যার ভূতকে তাড়িয়ে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হলেই জীবনে সত্যিকার দেবতার আবির্ভাব ঘটবে, জাতি জেগে উঠবে মনুষ্যত্বের আলোকে। মোটামুটি এই হচ্ছে গান দুটির বক্তব্য। এই সঙ্গেই আমরা 'বিষের বাঁশী' কাব্য প্রসঙ্গের ও উপসংহার টানছি। অগ্নিবীণার'' উন্মাদনা এ কাব্যে নেই, কিন্তু এতে যে বিষের জ্বালা রয়েছে, সে জ্বালা মানুষকে কম পাগল করে না। তাই 'অগ্নিবীণার' পথ থেকে 'বিষের বাঁশী' বড় বেশী দূরে সরে পড়েনি।

'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশীর' পথ ধরেই কবিকণ্ঠে 'ভাঙার গান' এসেছিল। 'ভাঙার গানের, মূলগত প্রেরণাও তাই বিদ্রোহের, বিপ্লবের। 'ভাঙার গান অসহযোগ আন্দোলনের প্রাণোন্মাদনাকেই যেন অনেকটা বহন করছে। তবে এ গ্রন্থের প্রথম গান 'ভাঙার গানে' বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ ও ক্ষোভ যেভাবে বিপ্লবীর রণহুঙ্কারে পরিণত হয়েছে, তাতে বুঝা যায় অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে সক্রিয় বিপ্লবের প্রতিই কবির সহানুভূতি ছিল বেশী। 'ভাঙার গানে' বিদেশীর কারার লৌহ কপাট ভেঙে ফেলে মুক্তির নিশ্বাস নেওয়ার যে :উদাত্ত ও স্পর্ধিত আহ্বান শোনা যায়'', সমগ্র বাংলা-সাহিত্যে তার তুলনা নেই।' গ্রন্থের মূল সুরের দ্যোতনাকারী এ গানটি ছাড়া 'ভাঙার গানে' আরও আটটি গান এবং দুটি কবিতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি সাময়িক ঘটনাকে উপজীব্য করে লেখা, যেমন 'জাগরণী,' ''পূর্ণ অভিনন্দন,'' 'মোহান্তের মোহ-অন্তের গান', 'আশু প্রয়াণ-গীতি'—এ চারটি গান। প্রথমটি

প্রিন্‌স অব্‌ ওয়েল্‌স-এর ভারত সফরের প্রতিবাদে, দ্বিতীয়টি বিপ্লবী বীর পূর্ণচন্দ্র দাসের কারামুক্তি উপলক্ষে অভিনন্দন হিসেবে, তৃতীয়টি অসহযোগ আন্দোলনের সময় তারকেশ্বরের দুর্নীতি পরায়ণ, অসচ্চরিত্র ধর্মব্যবসায়ী মোহান্তের অপসারণের দাবীতে সৃষ্ট আন্দোলনের সমর্থন হিসেবে এবং চতুর্থটি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বেদনা প্রকাশ করে লিখিত হয়েছিল। 'জাগরণী'তে কবি দেশবাসীর কাছে মানবতা ভিক্ষা চেয়েছেন, কারণ তার বিশ্বাস, বাধা-বন্ধন-ভয়হারা সত্য মানবের জাগরণ না হলে দেশের দুর্গতি ঘুচবে না। 'পূর্ণ-অভিনন্দনে' কবির স্বাদেশিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। আবেদন-নিবেদনের পথ নয়, সংগ্রামের পথই যে অধিকতর কাম্য এমনি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এ গানে দেওয়া হয়েছে। 'মোহান্তের মোহ-অন্তের গানে' ধর্ম ব্যবসায়ী পুরোহিত শ্রেণীর মুখোস যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি ধর্মবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতিও ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে। 'আশু প্রয়াণ গীতি'তে স্যার আশুতোষের মত শক্তি, সাহস ও পৌরুষের প্রতীক বীর সন্তানের মৃত্যুতে, দেশ জননীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা স্মরণ করে কবি বেদনা বোধ করেছেন।

'মিলন গান' শীর্ষক একটি সুন্দর গানে এবং 'বিশেষভাবে দুঃশাসনের রক্তপান' ও 'শহীদী ঈদ' নামক দুটি কবিতায় কবির স্বদেশ ভাবনা তুঙ্গতম রূপ লাভ করেছে। 'মিলন গানে' কবি আমাদের জাতীয় জীবনে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের গুরুত্বের প্রতি সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হিন্দু মুসলিম বিরোধের সমাধান ব্যতীত জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে সফল হতে পারে না, এ কথাই নজরুল সবাইকে বল্‌তে চেয়েছেন। গানটিতে হিন্দু মুসলমানের আত্মঘাতী হানাহানির নিন্দা যেমন করা হয়েছে, তেমনি তাদের শুভ মিলনের সুফলকে এক মহান আশার বাণীরূপে সবাইর সামনে তুলে ধরা হয়েছে। 'দুঃশাসনের রক্তপান' কবিতায় স্বাধীনতা হরণকারী সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন জানান হয়েছে। এ গানটিতে 'ভাঙার গানের' প্রথিত কবি কণ্ঠেরই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'শহীদী ঈদ' কবিতায় ঈদের এক নতুন তাৎপর্য উদঘাটিত হয়েছে। কবির মতে, এ ঈদ

গতানুগতিক ঐশ্বর্যের অঞ্জলি চায় না, চায় প্রাণের কোরবানী। এই কোরবানী ছাড়া ইসলামের ইজ্জত যেমন রক্ষা পেতে পারে না, তেমনি বোধ হয় জাতির স্বাধীনতা আসতে পারে না। কবির ধারণা এরূপই। স্বাদেশিকতার রক্ত রঙীন স্বপ্নে ডুবে থেকে এর চেয়ে ঈদের মহত্তর কোন তাৎপর্য কবি খুঁজে পান নি।

'ঝোড়ো গান', 'ল্যাবেণ্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত' ও 'সুপার (জেলের) বন্দনা'—এই তিনটি গানই ব্যঙ্গাত্মক। কীর্তনের সুরে রচিত 'ঝোড়ো গানে'—'ভ্যাবাগঙ্গারাম' নিরীহ বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতি একটা কটাক্ষ আছে বলে মনে হয়। 'ল্যাবেণ্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত' বৃটিশ শাসনের তল্পিবাহী এক জাতীয় দেশীয় সেপাই, যাদের বলা হত 'সিভিল গার্ড', 'যাদের নিশ্চল হাতে পিস্তল কাঁপলেও, 'গোঁফেচাড়' দেওয়ার কমতি ছিল না, তাদেরই উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছিল। 'সুপার (জেলের) বন্দনা' গানটি রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে', গানটির ভঙ্গীর অনুকরণে লিখিত হয়েছিল। হুগলী জেলে বন্দী থাকাকালীন জেলের মূর্তিমান 'জুলুম' বড়কর্তাকে লক্ষ্য করে এ ব্যঙ্গাত্মক গানটি লেখা হয়েছিল। স্বদেশী হাওয়ায় লালিত বলে এ ব্যঙ্গের সুর 'ভাঙার গানের' মূল সুরের পোষকতা করেছে বলেই আমাদের ধারণা।

'অগ্নিবীণা-বিষের বাঁশী-ভাঙার গান' শুনিয়ে নজরুল আমাদের কবিত্বের যে পথে ডাক দিয়েছেন, সেপথ আর্টের বাঁধা রাজপথ নয়, জীবনাবেগের যথেচ্ছ চলার পথ, সাহিত্যের নতুন পরিভাষায় যাকে বলা চলে জনপথ। এ জনপথে চলতে গিয়ে তাঁর আচরণ যদি আর্টের বাঁধা রাজপথের পথিকদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে, তবে তা স্বাভাবিক বলে মেনে নে'য়া উচিত। আর্টের বাঁধা পথে জনতার ভীড় বাঁচিয়ে যাঁরা চলতে অভ্যস্ত, তাঁদের পক্ষে পোষাকী তব্যতা বজায় রেখে নীচু স্বরে কথা বলে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবও বটে, শোভনও বটে; কিন্তু জনতার ভীড়ে যিনি পথ করে চলেন, তাঁর পক্ষে ও রকম গা বাঁচিয়ে চলা সম্ভব নয়। তাঁকে সবার রঙে রঙ মিলিয়ে চলতে হয়, না হলে জনতার

মিছিলে তাঁকে বেমানান ঠেকবে যে! তাঁর কণ্ঠস্বরও অনিবার্য ভাবেই কিছুটা উচ্চগ্রামে বাঁধা হয়ে যায়, নইলে তা যে জন কোলাহলে ডুবে যায়। শুধু তাই নয়। তাঁর বক্তব্যও স্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তির আত্ম-ভাবনার থেকে সমষ্টির সমাজ ভাবনার দিকেই বেশী উন্মুখ হয়ে ওঠে। এতে সব সময় আর্টের সায় না থাকতে পারে, কিন্তু জীবনের সায় আছে। যুগ ধর্মে আজ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই দেখি শিল্প সাহিত্য আর্টের বাঁধা পথ থেকে জীবনের কলমুখরিত পথের দিকেই বেশী করে ঝুঁকে পড়ছে। নজরুলও এই যুগধর্মেই জনপথের পথিক পড়েছেন। তাতে করে তাঁর কাব্যে জীবনের দাবী মেটাতে গিয়ে আর্ট যদি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও পড়ে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই বা বলি কেন; 'নজরুল কাব্যে' প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টির আর্ট না থাকতে পারে; কিন্তু অনুভূতি ও আবেগ-গাঢ় জীবনের সহজ প্রকাশের আর্টটি তাতে স্বতোপ্রকাশিত। নজরুলকে তাই আধুনিক বাংলা কাব্যের একজন বিশিষ্ট কবি কর্মী বলে মেনে নিতে আপত্তি থাকতে পারে না।

নজরুল ইসলাম ও বাংলা কবিতার ছন্দ

কাব্যের প্রাণরহস্য নির্দেশ করে জনৈক কাব্যরসিক বলেছেন, "কাব্যে ভাষা, ছন্দ এবং অর্থ বাইরের জিনিস, রস ভিতরের। ভাষা অর্থ ছন্দ হচ্ছে সেতারের ঘাটের মত—বন্ধনের মধ্যে মুক্তি সৃষ্টিই তার ধর্ম। ছন্দের বাঁধনে রসাত্মক বাক্য যখন মুক্তি পায়, তখন হয় কাব্য। রস—মহাদেবের দুই ঘরণী ভাষারূপী পার্বতী এবং ছন্দময়ী গঙ্গা। একজন স্থির, গভীর, অন্যজন চঞ্চল গতির বেগে উচ্ছল। পার্বতী এবং গঙ্গা নিয়েই শিব সম্পূর্ণ। ভাষা এবং ছন্দের বিচিত্র মিলনে রস-মহাদেবের সম্পূর্ণতা।" বস্তুত কাব্যরস সৃষ্টির জন্যে ভাষায় অলংকার, রূপরীতি, ধ্বনি প্রভৃতির সমাবেশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এই সবকে সুসংহত আবেগের সাথে সমীকৃত করে বয়ে নিয়ে যাবার বেগ। যা পদ বিন্যাসের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করে এক আশ্চর্য সৌন্দর্য। ছন্দ হচ্ছে এই সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রাণ। যেহেতু প্রাণই সকল আনন্দের উৎস, তাই ছন্দের মধ্যেই নিহিত থাকে কাব্যের সকল আনন্দদায়িনী শক্তি, এমন একটা সিদ্ধান্ত করলে বোধ হয় ভুল করা হবে না। কাব্য-বিচারে ছন্দোকলার প্রয়োগ নৈপুণ্যের প্রশ্নটি তাই আমাদের সবিশেষ মনোযোগ দাবী করে।

কবিতার শিল্পকর্মে ছন্দের এ বিশেষ ভূমিকাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও আমাদের উপরিউক্ত ধারণাকে অনেকটা বলিষ্ঠতা দান করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে

থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে। ....এই ছন্দের বাহন যোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দন যোগ করে দেয়। এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কি অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে বলা যায় না। সেই জন্যে কাব্য রচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা, বিষয়ের চেয়ে বেশীটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে"। কবির বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে বাইরের দিক থেকে ছন্দ কথাকে একটা নিয়মের মধ্যে রেখে প্রকৃতপক্ষে তাকে অন্তরে মুক্তি দেয়। এই যে বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ সঞ্চারিত করার ক্ষমতা, এখানেই তো ছন্দের সার্থকতা। সকল বড় কবিই তাই বড় ছন্দো শিল্পীও বটেন। নজরুল ইস্‌লামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখি না।

নজরুল ইসলাম বাংলার এক অতি জনপ্রিয় কবি এবং একজন সত্যিকার বড় কবি। রবির আলোকে বাঙালীর চিত্তাকাশ যখন ভাস্বর, তখনই সবাইকে চমকে দিয়ে ঐ আকাশেরই প্রান্তে ধূমকেতু পুচ্ছের তীব্র ঔজ্জ্বল্য, উল্কার দহন-জ্বালা ও অশনি-সংকেত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নজরুল কাব্যের ক্ষেত্রে এসেছিলেন অপরিমেয় হৃদয় ঐশ্বর্য নিয়ে। সুতীব্র স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বেগে চালিত হয়ে সে ঐশ্বর্য তিনি ধূলিমুষ্টির ন্যায় অকাতরে ছড়িয়ে দিয়েছেন পথের দু'ধারে অজস্র কবিতারূপে। সে ঐশ্বর্য কুড়িয়ে যাঁরা ঘরে তুলেছেন, তাঁদের মুখে মাঝে মাঝে একটা অভিযোগ শোনা যায়, 'নজরুল আমাদের যা দিয়েছেন, তার অনেকটাই উপযুক্ত শৈল্পিক প্রযত্নের অভাবে ম্লান। তাঁর কবিতার অন্তরঙ্গে আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততার যে ঐশ্বর্য রয়েছে, তা যদি বহিরঙ্গে কারিগরি প্রযুক্তি কুশলতা দ্বারা সমর্থিত হত, তবে তাই হত তাঁর প্রতিভার যথার্থ অভিব্যক্তি।' এ অভিযোগের সত্যতা কিছুটা স্বীকার করে নিয়েও কিন্তু নির্ভয়ে বলা যায় যে নজরুল কাব্যের অন্তরঙ্গের ন্যায় বহিরঙ্গেও ঐশ্বর্য নেহায়েৎ কম নয়। ভাব, ভাষা ও ছন্দে যৌগপদ্যে সৃষ্ট সার্থক কবিতার দৃষ্টান্ত তাঁর কাব্যভাণ্ডারে অজস্রতায় দেখা না দিলে

পারে, কিন্তু তা যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসব ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস সাফল্য আমাদের বিস্মিত করে। আসলে নজরুল ছিলেন জাত শিল্পী। উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে তাঁর শিল্পী সত্তা সর্বত্র কাঙ্ক্ষিত সাফল্য খুঁজে না পেলেও কোথাও তার ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় নি।

বস্তুত নজরুল ইসলামের কাব্যে অপ্রমেয় ভাব—সম্পদের সাথে ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে অনায়াস প্রযুক্তি কুশলতার পরিচয় অপ্রতুল নয়। আরবী, ফার্সী ভাষার শব্দ সম্পদের উত্তরাধিকারকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলা কাব্যের ভাষায় তিনি যে প্রাণময়তা, ওজস্বিতা ও বলিষ্ঠতার সঞ্চার করেছেন, তা ভাষাশিল্পী হিসাবে তাঁকে বিপুল মর্যাদার অধিকারী করেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ নন। মুকুন্দরাম, আলাওল, ভারতচন্দ্র, গরীবুল্লাহ্, সৈয়দ হামজা, রামপ্রসাদ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল পর্যন্ত অনেক কবিই আরবী ফার্সীর শব্দ ভাণ্ডার থেকে সম্পদ নিয়ে আপন কাব্যদেহ গড়ার কাজে লাগিয়েছেন। নজরুলও তাই করেছেন। তবে পার্থক্য এই, নজরুলের ক্ষেত্রে কবিচেতনার নিগূঢ় সম্পৃক্তির ফলে এ শব্দ-সম্পদ যেরূপ রসমূর্তি লাভ করেছে, অন্য কারোর ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি।

পূর্বসূরীদের কাছে ঋণী হয়েও এ কারণেই নজরুল এক্ষেত্রে বিশিষ্ট। ছন্দের ক্ষেত্রে নজরুল সমৃদ্ধতর উত্তরাধিকারকে অনুসরণ করেও ক্ষেত্রবিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পেরেছেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে বাংলা কবিতায় ছন্দের প্রয়োগ বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করার পর নতুনতর কিছু প্রত্যাশা করাই যেন ছিল অসম্ভব। পয়ারের জটাজাল থেকে ছন্দ ভাগীরথীর মুক্তিপথ দেখিয়েছিলেন মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথ সে পথের সংকেত বুঝেই তাকে সহস্রধারায় প্রবাহিত করে দিয়ে সমুদ্রগামিনী করে তুলেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এতে ভিন ভাষার ছন্দের হাওয়া এনে নতুন তরঙ্গদোলা সঞ্চার করেছিলেন। নজরুল বাংলা ছন্দের এই মহৎ উত্তরাধিকারকেই অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এ-ব্যাপারে তাঁর ঋণ খুবই বেশী। তবু নজরুল

অন্যের বাঁধা পথেই অন্ধের মত ছুটে চলেন নি। যেখানেই সম্ভব হয়েছে নতুন সুর যোজনার চেষ্টা পেয়েছেন। পূর্বসূরীদের ন্যায় তিনিও অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত—বাংলা কবিতার এই তিন প্রধান ছন্দেই কবিতা লিখেছেন, তবে অক্ষরবৃত্তের চেয়ে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দেই তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে বেশী। তাঁর আবেগ-প্রধান কবি-স্বভাব অক্ষরবৃত্তের সুদৃঢ় কাঠামোর মধ্যে অস্বস্তিই বোধ করেছে। তাই 'দারিদ্র্য' কবিতার দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও নজরুল ঐ ক্ষেত্রে বেশী পদচারণায় উৎসাহ বোধ করেন নি। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব বরণ করে নিয়েও স্বকীয়তার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। এই উভয় ছন্দে নজরুল যে ওজস্বিতা সৃষ্টি করেছেন তার সম্পূর্ণতা কোন মতেই অস্বীকার করা চল্‌বে না। তাঁর প্রথম দিককার অনেক রচনাই, দেখতে পাই, সমিল মুক্তক স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দে রচিত। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র কাছে ঋণী। আশ্চর্যের বিষয় এই ছন্দেই নজরুল 'কামাল পাশা' ও 'প্রলয়োল্লাসে'র মত প্রাণ-মাতান রক্তে দোলা লাগানো অপূর্ব কবিতা রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। আবার সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 'বিদ্রোহী'র মত কবিতা রচনা করে তিনি ছন্দের এ-ক্ষেত্রেও বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এখানে তাঁর হাতে প্রায় নতুন ছন্দেরই মর্যাদা পেয়েছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত তাঁর বহু কবিতায় একটা আশ্চর্য দীপ্তি, শক্তি ও বলিষ্ঠতা দেখা যায়। স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ ক্ষেত্রে নজরুলের স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষণীয়। এ ঘরোয়া ছন্দেই তাঁর বহু বিখ্যাত কবিতা রচিত হয়েছে। নজরুলের কবি-মানসের বিশেষ গঠনটি এ ছন্দেরই অনুকূল ছিল বলে এমনটি হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে অক্ষরবৃত্তের কঠিন বাঁধনে 'আবেগ প্রধান কবির উদ্দামতা বাঁধা পড়তে চায়নি বলেই মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল স্বাভাবিকভাবে। তাই বলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বল্প-প্রয়োগক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব কিন্তু কম নয়। 'দারিদ্র্য' কবিতার প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বলা-

কার মুক্তক ছন্দের অনুসরণে' 'মুক্ত পিঞ্জর' 'ঝড়' (পশ্চিমতরঙ্গ), 'অনামিকা' ইত্যাদি কবিতা রচনা করে তাঁর ছন্দোকলাকৌতূহলী মনের পরিচয় রেখে দিয়েছেন।

বাংলা ছন্দের ঐ প্রধান তিন ধারা ছাড়াও নজরুল সত্যেন্দ্রনাথের অনুবর্তী হয়ে কয়েকটি নতুন ছন্দেও হাত পাকিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রাস্বরিক বা প্রস্বরমাত্রিক ছন্দ-ভঙ্গীতেই তিনি দিউয়ান-ই-হাফিজ বাংলায় রূপান্তরিত করেন। আবার সত্যেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেই তিনি সংস্কৃত তোটকছন্দ, শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ, চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত ছন্দ প্রভৃতি ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের প্রাস্বরিক পদ্ধতির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের মাত্রিক প্রক্রিয়াকেই অনুসরণ করেছেন বিশেষভাবে। রবীন্দ্রনাথ মাত্রিক প্রক্রিয়ায়ই সংস্কৃত 'মন্দাক্রান্তা' ও 'শিখরিণী' ছন্দের বাংলা রূপান্তর সম্ভব করেছিলেন। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের মতই নজরুল বাংলা কাব্যে আরবী ছন্দের অনুসরণে কয়েকটি নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। কবি-সমালোচক আবদুল কাদির এ-সম্পর্কে জানিয়েছেন, "১৩২৫ বৈশাখের 'ভারতী'তে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তা'তে 'মদীদ', 'ত'বীল' 'হজজ্', 'রজজ্', 'রমল' খফিফ, ও মতদারিক এই ৭টি ইরান আরবের ছন্দের বাংলা প্রাস্বরিক প্রতিরূপ পরিবেশিত হয়। ১৩২৮ চৈত্রের প্রবাসীতে নজরুল আরবী 'মোতাকারিব্' ছন্দে লেখেন 'দোদুল দুল'।" সত্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত প্রাস্বরিক রীতিতেই তিনি তাঁর আরবী কবিতার ছন্দের বাংলা রূপান্তরে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৩২৮ সালের চৈত্রের 'প্রবাসী'তে 'আরবী ছন্দের কবিতা' শিরোনামায় তিনি হজয্, রজজ, রমল, মোতাকারেব্, সরীএ, খফীফ, ময্তস্, মোজারাহ, কামেল, ওয়াফের, মোত্দারিক, তবীল, মদীদ, বসীত্, মন্সর্হ্, করীব, যদীদ্, মশাকেল্ এই আঠারটি ছন্দের বাংলা নমুনা উপস্থাপিত করেন। বাংলা কাব্যের ছন্দোবৈচিত্র্য বিধানে নজরুলের সবিশেষ আগ্রহ এ-প্রচেষ্টার মধ্যে মূর্ত দেখতে পাই।

বাংলা কবিতার জন্য নব নব ছন্দের উদ্ভাবনার তাগিদ তিনি বোধ করেছেন 'সুরের প্ররোচনায়।' সুরের মুক্তি ঘটাতে গিয়েই দেখি তিনি প্রাস্বরিক ছন্দের কবিতাতেও মাত্রাবৃত্তের ঢঙ আশ্রয় করেছেন, কোথাও বা স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মিশ্রিত ভঙ্গীতেই কাজ চালিয়েছেন। ছন্দের প্রসঙ্গেই মিলের কথাও এসে যায়। বাংলা ভাষার ধ্বনি প্রকৃতি এমনি যে ছন্দে মিল না থাকলে তা শ্রুতিসুখকর হয় না। এদিকে লক্ষ রেখেই নজরুল সুষ্ঠু শব্দের মিল সৃষ্টি করে কবিতায় মাধুর্য সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। ফারসী ভাষার সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় এ ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ফারসী কবিতায় শব্দ মিলের বৈচিত্র্য রীতিমত বিস্ময়কর। নজরুলের মধ্যে মিলের প্রতি যে এক ধরনের মোহ মিশ্রিত আবেগ লক্ষ্য করা যায়, তা তাঁর ফারসী কাব্য পাঠের ফল। নজরুল-কাব্যের সমালোচক সুশীলকুমার গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "দেশী-বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে নজরুল মিলের যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি মনোহর।"

যে মিলের প্রতি তাঁর অত মোহ, আধুনিক কবিতায় যখন সেই মিলের খিল খুলে গেল, তখন তিনি তা পছন্দ করতে পারেন নি। "শেষ সওগাত" কাব্যে 'কবির মুক্তি' কবিতায় কবি গদ্যছন্দের চালে রচিত অতি-আধুনিক কবিতার তথাকথিত মিলহীনতার ও বিষয়বস্তুর দৈন্যের প্রতি শানিত ব্যঙ্গ-বাণ বর্ষণ করেছেন। সে ব্যঙ্গ রীতিমত উপভোগ্য। কবিতাটিতে তিনি শব্দ-চয়নেও অতি-আধুনিক কবিতার স্বভাবকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। এতে করে দুটি জিনিস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে: এক, তিনি অতি-আধুনিক কবিতার রূপ-রীতি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন, দুই, তার অসারতা সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই আধুনিক কবিদের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে তা দিয়েই তাঁদের আক্রমণ করে সাধারণ্যে তাঁদের হাস্যাস্পদ করার প্রয়াস পেয়েছেন। নজরুলের মতে মিল হলো কবিতা লেখার 'গরম-মশলা', যা কবিতাকে সুস্বাদু করে তোলে। আধুনিকরা কবিতা লেখার মশলা পেয়েই খুশী, গরমমশলা না হলেও তাদের চলবে, কারণ ঐ গরম মশলাটার মূল্য সম্পর্কেই তাঁদের ধারণা

নেই। ব্যঙ্গের শাণিত দীপ্তিতে ভাস্বর কবিতাটির কিছু অংশ কৌতূহলী পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

"মিলের খিল খুলে গেছে।
কিল্‌বিল্‌ করছিল, কাঁচু মাচু হয়েছিল -
কেঁচোর মতন - -
পেটের পাঁকে কথার কাতুকুতু।
কথা কি 'কথক' নাচ্‌বে
চৌতালে ধামারে?
তাল-তলা দিয়ে যেতে হলে
কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
তালের বাধাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে।
এই যাঃ! মিল হয়ে গেল।
ও তাল তলার কেরদানী—দুত্তোর।"

আধুনিক কবিতার রূপরীতির বিদ্রোহকে আমাদের 'বিদ্রোহী' কবি বরদাস্ত করতে পারেন নি, যেমন পারেন নি আরও অনেকে। নজরুল কিন্তু চোখে সামনেই দেখেছেন কবিরা তাঁর ব্যঙ্গে আমল দেয়নি, আর তা নিয়ে নজরুল নিজেও আর বেশী মাথা ঘামান নি। তবে অবিশ্বাসীর দৃষ্টি নিয়েই তিনি সব সময় ওঁদের দিকে তাকিয়েছেন। বলা যায় না, তাঁর শিল্পবোধ শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকলে তিনি কি করতেন।

নজরুল ইস্‌লামের কাব্যে যাঁরা শুধু আবেগেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করেন এবং ভাষা ছন্দের উপযুক্ত প্রযুক্তিকুশলতার সমর্থন পান না বলে আক্ষেপ করেন তাঁরা উপরের আলোচনা পাঠের পর নিশ্চয়ই তাঁদের ধারণা অনেকটা সংশোধন করতে বাধ্য হবেন। কবিতার শিল্পকর্মে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করতে পারলে তাঁর রচনার শৈল্পিক উৎকর্ষ হয়তো আরো বেড়ে যেত এবং তিনি কবি হিসেবে মহত্তর মর্যাদার অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর কবিতার শিল্পকর্মে যে অনায়াস কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। ছন্দের ক্ষেত্রেই

আলোচনা সীমাবদ্ধ বলে আমরা শিল্পকর্মের এ দিকটায় তাঁর অবদান কতখানি, তাই দেখতে চেষ্টা করেছি। এবার আমরা নজরুল-কাব্যে ছন্দ-প্রয়োগ কুশলতার নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন ছন্দে রচিত কাব্যাংশের নমুনা তুলে ধরছি।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

(১) প্রবহমান পয়ার :

(ক) হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা। দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস,
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণ মোর শাপে তব হ'ল তরবার !

(দারিদ্র্য, সিন্ধু-হিন্দোল)

(খ) এমনি সন্ধ্যায় বসি একাকিনী গেহে !
দুখানি আঁখির দীপ সুগভীর স্নেহে
জ্বালাইয়া থাক জাগি তারি পথ চাহি !
সে যেন আসিছে দূর তারা লোক বাহি
পারাইয়া অসীমের অনন্ত জিজ্ঞাসা,
সে দেখেছে তব দীপ, ধরণীর বাসা।

(তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চক্রবাক্)

(২) মুক্তক ছন্দ :

(ক) বুঝি নাই রক্ষী-ঘেরা রাক্ষস-দেউল
এল কবে মরুমায়াবিনী
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্য-মূলে !
চরণ-শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল—
কোন্ চপলার কেশজাল

কখন জড়াতেছিল গতি-মত্ত আমার চরণে,
লৌহবেড়ী যত যায় খুলে তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণ বন্ধনে।
(মুক্ত-পিঞ্জর, বিষের বাঁশী)

(খ) তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া।
তোমারে বন্দনা করি······
হে আমার মানস-রঙ্গিণী,
অনন্ত যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী
(অনামিকা, সিন্ধু-হিন্দোল)

(গ) হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চিরবিরহী
হে অতৃপ্ত! রহি রহি
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কান্নায় কান্নায়
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে নীলা নিম্নে বেলাভূমি!
(সিন্ধু—প্রথম তরঙ্গ, সিন্ধু-হিন্দোল)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

(১) সাধারণ মাত্রাবৃত্ত :

(ক) শাতিল আরব! শাতিল আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানী মিসরী আরবী কেনানী,
লুটেছে এখানে মুক্ত-আজাদ বেদুঈনদের চাঙ্গা-শির।
(শাত্-ইল্-আরব, অগ্নি-বীণা)

(খ) দাতাকর্ণের সম নিজ সুতে কারাগার-যূপে ফেলে
ত্যাগের করাতে কাটিয়াছে বীর বারে বারে অবহেলে।

ইব্‌রাহীমের মত বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া
কোরবানী দিলে সত্যের নামে, হে মানব নবী-হিয়া।
(ইন্দ্র-পতন, চিত্তনামা)

(গ) রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা!
(সাবধানী ঘণ্টা, ফণিমনসা)

(ঘ) বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই 'নবি'
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!
(আমার কৈফিয়ৎ, সর্বহারা)

(ঙ) প্রাচীর দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির রাতে।
মেসেরের শের, শির, শমসের—সব গেলো এক সাথে।
(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

(২) সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত :

বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি' আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ছাড়ি
ভূলোক-দ্যুলোক-গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রর।
মম ললাটে রুদ্র-ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
(বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা)

স্বরবৃত্ত ছন্দ

(১) সাধারণ স্বরবৃত্ত :

(ক) পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রাণি।
মধ্যে সাগর এ-পার ওপার করছে কানাকানি।

আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার
ও-পার হ'তে ছায়াতরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি,
(গোপন প্রিয়া, সিন্ধু-হিন্দোল)

(খ) যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে।
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে।
(অভিশাপ, দোলন চাঁপা)

(গ) শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল ?
(চৈতী হাওয়া, ছায়ানট)

(২) স্বরবৃত্ত মুক্তক ঃ

(ক) আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে
ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর !
ওরে ঐ হাস্‌ছে ভয়ঙ্কর।
(প্রলয়োল্লাস, অগ্নি-বীণা)

(খ) ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।
কামাল ! তুনে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো কামাল ! তুনে কামাল কিয়া ভাই !
(কামাল পাশা, অগ্নি-বী·া !)

(গ) রাণীগঞ্জের অর্জুন পটির বাঁকে
যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে

রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হতে তিনটি রাস্তা এসে
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে।

(মুক্ত, নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

ঘ. প্রাস্বরিক বা প্রস্বরমাত্রিক ছন্দ

তামাম্‌মোর কাম্ শুধুই বদ্‌নাম্ নিজের দোষ ভাই নিজের দোষ্ সে
গোপন্ দূর ছাই রয় কি নাম্‌তায় রাজসভায় যার চর্চা জোরসে ঃ

(গজল—স্ব, দীওয়ান-ই-হাফিজ)

ঙ. আরবী ছন্দ

(১) মোতাকারিব ছন্দ ঃ মৃণাল পাত
নয়ন-হাত
গালের টোল,
চিবুক দোল
সকল কাজ
করায় ভুল
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল ?

(দোদুল দুল, দোলন চাঁপা)

(২) মোজারাহ্ ছন্দ ঃ
ডাগর চোখ তোর বিজলীচঞ্চল,
কাহার চিন্তায় কান্না ছল্‌ছল ?
হিঙুল, লাল্ গাল পাংশু পাণ্ডুর
অধর নীল রং, সিক্ত অঞ্চল।

('আরবী ছন্দের কবিতা' নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

(৩) মোত্‌দারিক ছন্দ ঃ

(ক) তোর অথই
মন যতই
জিন্‌তে চাই
সই ততই
পাইনে থই
পাইনে থই
('আরবী ছন্দের কবিতা' নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

(খ) কই সে কই
চক্রধর
ঐ মায়ায়
খণ্ড কর্‌
শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর
ঐ মায়ায়
(প্রবর্তকের ঘুর চাকায়, ফণী মনসা।)

(৪) রমল ছন্দ ঃ
থাম্‌কা হা সফাঁস
দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
নাই রে নাই আশ
মিথ্যা আশ্বাস।
(আরবী ছন্দের কবিতা 'নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

(৫) মদীদ ছন্দ ঃ
হায়, এ কান্নার
নাই ক শেষ,

কই মা শান্তির
কোন্ সে দেশ ?
('আরবী ছন্দের কবিতা' নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

কৌতুহলী পাঠক অন্যান্য 'আরবী ছন্দের কবিতার' নমুনার জন্য নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ডের প্রাথমিক অংশ পড়ে দেখতে পারেন।

চ, সংস্কৃত ছাঁচের ছন্দ

(১) তোটক ছন্দ ঃ

ভাঁজো মোহিনী সানাই, বাজা আগমনী সুর
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ বিধুর।
ওঠে কণ্ঠ ছাপি বাণী সত্য পরম
বন্ দে মাতরম্। বন্‌দে মাতরম।
(জাগৃহি, বিষের বাঁশী)

(২) চণ্ড-বৃষ্টি-প্রপাত ছন্দ ঃ

পুষ্প বিলাস নয় তোমার
পাওনি তাই পুষ্পহার,
বেদনা আসনে বসায়ে আজ
করে নিখিল পূজা তোমার
(শরৎচন্দ্র, সন্ধ্যা)

(৩) শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ ঃ

উত্রাস ভীম
মেঘে কুচ্‌কাওয়াজ
সোন্মাদ সাগর
খায়রে দোল্।
ইন্দ্রের রব
বজ্রের কামান
টানে উজান
মেঘ-ঐরাবত
মদ্ -বিভোল্।।
(পুবের হাওয়া, ঝড় ঃ পূর্বতরঙ্গ, ছায়ানট)

(৪) **অনঙ্গশেখর ছন্দ :**

এবার আমার বিলাস শুরু অনঙ্গ শেখরে।
পরশ-সুখে শ্যামার বুকে কদম্ব শিহরে।
(পুবের হাওয়া, ঝড় : পূর্বতরঙ্গ-ছায়ানট)

(৫) সিংহ-বিক্রীড় ছন্দ :

মেঘের ছায়া শীতল কায় ঘুমায় থির দীঘির জল অথই থই
তুষার ক্ষীণ 'ফটিকলে' 'ফটিক জল' কাঁদায় দিল চাতক ঐ
(পুবের হাওয়া, ঝড়, পূর্বতরঙ্গ ছায়ানট)

আমরা নজরুল-কাব্য থেকে ছন্দের নমুনা-স্বরূপ বিচ্ছিন্ন কাব্যাংশের উদ্ধৃতির কাজ এখানেই শেষ করছি। আশা করি, এ-থেকে নজরুল-কাব্যের আগ্রহী পাঠক তার ছন্দ-নির্মাণ ও প্রতিযুক্তি কুশলতা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। তবে সাথে সাথে একথা স্মরণ রাখা ভাল যে নজরুলের মত একজন বিচিত্রকর্মা কবির হাতে বাংলা ছন্দ যে বিচিত্র-ভঙ্গিমা লাভ করেছে, তার পূর্ণরূপ অনুধাবন করতে হলে এ সম্পর্কে ব্যপকতর অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলা ছন্দের বিচিত্র বিকাশ ধারার সাথে আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত ছন্দের জ্ঞান যাদের আছে, তারাই একমাত্র ছান্দসিক নজরুলকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন। বর্তমান প্রবন্ধকার জ্ঞানের সেই ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত : তাই তার বক্তব্যে সুধী পাঠক যদি তৃপ্ত বোধ না করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই!

নজরুলের সাহিত্য-ভাবনা

বায়রন সম্পর্কে গ্যেটের উক্তির প্রতিধ্বনি করে একদা বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্পর্কে বলেছিলেন যে, বায়রনের ন্যায়ই নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি শিল্পী হিসেবে 'চির-শিশু, চির-কিশোর' রয়ে গিয়েছেন। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করেই তিনি লিখেছিলেন ঃ

পঁচিশ বছর ধরে এক প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েন নি, বয়স্ক হন নি। পর পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তাঁর প্রতিভার প্রদীপে ধী-শক্তির শিখা জ্বলেনি। যৌবনের তরলতা খর্ব হয় নি কখনো, জীবন-দর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত করে নি। তাঁর সৃষ্টি-প্রেরণার প্রবলতা বিপথগামী হয়েছে আত্মস্থ স্বাধীন সচেতনতার অভাবে। [১]

নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ ব্যাখ্যানে এ উক্তি যে লক্ষ্যভেদী তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তী বহু সমালোচকের কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে বুদ্ধদেব বসুর এ উক্তি আজ প্রায় আপ্ত বাক্যের মহিমা লাভ করেছে। তথাপি নজরুল-প্রতিভা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর রায়ই চূড়ান্ত, এর উপর আপীল চলে না, এমন কথা মেনে নিতে আমাদের আপত্তি আছে।

১। বুদ্ধদেব বসু : নজরুল ইসলাম : কালের পুতুল, নিউ এজ্ সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ১৩০।

সত্য বটে 'মন ও মস্তিকের অন্বয় সহযোগিতা' [২] তাঁর ভাগ্যে জোটে নি বলে তিনি প্রাগ্রসর জীবন চেতনার পথ ধরে আপন প্রতিভার বাঞ্ছিত উত্তরণ ঘটাতে সমর্থ হন নি।

আবেগের স্রোতে তিনি ভেসেছেন, আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি অথবা পারলেও চান নি।[৩]

শিল্পের জন্য বুদ্ধি ও মননের চর্চার যে প্রয়োজন রয়েছে এসত্য তিনি জেনে শুনেও বিস্মৃত হয়েছেন; এতে করে তাঁর রচনায় কতগুলো শিল্পগত ত্রুটি অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও কোন শিক্ষা গ্রহণের গরজ তিনি বোধ করেন নি। ফলে তাঁর জীবন-ব্যাপী কাব্যসাধনা মহত্তর কোন পরিণতির অভিসারী হয়ে উঠে নি। এ-কথা স্বীকার করে নিতে হয়।

নজরুল ইসলামের কবিকর্ম সম্পর্কে একটি সাধারণ সত্য হিসেবে উপরিউক্ত বক্তব্য মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হলেও তাঁর সামগ্রিক শিল্পীসত্তার বৈশিষ্ট্য বিচারে বুদ্ধদেব বসুর সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে সংশোধিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে বলে আমরা মনে করি। কবি-ঔপন্যাসিক গাল্পিক নাট্য-কার নজরুল, এমন-কি প্রাবন্ধিক নজরুলও প্রায়শই আবেগের শিকার হয়ে পড়ে শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তা ঠিক! কিন্তু কিছু প্রবন্ধে এবং বহু ভাষণ-প্রতিভাষণে ও চিঠিপত্রে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষত বাঙলা সাহিত্যের নানা সমস্যা সম্পর্কে যে সব মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন তা একদিকে যেমন তাঁর স্বচ্ছ উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে, অপর দিকে বুদ্ধি ও মননের ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ পদপাতের ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে। মনে হয় তাঁর প্রতিভার প্রদীপে 'ধী-শক্তির শিখা' এসবের মধ্যে দিয়েই কিছুক্ষণের জন্য হলেও জ্বলে উঠেছিল। এ-সব প্রকাশকে যদি নজরু-

২। আহ্‌মদ শরীফ: নজরুল সমীক্ষা—অন্য নিরিখে: মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল ইসলাম', পৃ: ১৩৭।

৩। মোতাহের হোসেন চৌধুরী: কাজী নজরুল ইসলাম: সংস্কৃতি কথা. ১ম সংস্করণ ১৯৫৫, পৃ: ২৭৪।

লের শিল্পীসত্তার একটি উপেক্ষিত দিকের দ্যোতক বলে গ্রহণ করতে আপত্তি না থাকে, তাহলে 'অপরিণত' নজরুল প্রতিভায় পরিণত মনের ছাপ পড়তে শুরু করেছিল তা মানতেই হয়। নজরুল প্রতিভার পুনর্বিচার তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর সাহিত্য-ভাবনামূলক অনেক মূল্যবান সুচিন্তিত বক্তব্য ইদানীং গবেষকদের কৃপায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছে, এ প্রসঙ্গকে অনেকটা জরুরী করে তুলেছে।

তবে প্রারম্ভেই নজরুল সম্পর্কিত এ জাতীয় আলোচনার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করে সমালোচকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও স্বীকার করে নিচ্ছি যে ঃ

> নজরুল তাঁর কাব্যাদর্শ এবং সাহিত্য-শিল্পের রূপ প্রকৃতি সম্পর্কে কোন শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনা করেন নি। খণ্ড বিচ্ছিন্ন আলোচনা এবং ভাষণ ও প্রতিভাষণে প্রসঙ্গত তিনি তাঁর শিল্পীসত্তা ও সাহিত্য-কর্মের রূপ প্রকৃতি সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনা ও উক্তি করেছেন মাত্র। সে সব উক্তিতে হয়ত সর্বত্র সুবিন্যস্ত চিন্তারীতি ও গভীর তথ্যানুষ্কানী মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় উদ্ভাসিত নেই, কিন্তু তাতে একটি অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান শিল্পীমনের পরিচয় আছে যা শিল্পরীতির কঠিন নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ সংকীর্ণ আঙ্গিনায় পরিবর্ধিত না হয়ে আত্মপ্রকাশের আবেগে উদার আকাশের অনাহত নীলিমায় ডানা মেলতে চেয়েছে।[৪]

তবে সংগে সংগে বলব, আপন শিল্পীসত্তা ও সাহিত্য-কর্মের রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে কবির বক্তব্যে খুব একটা সুবিন্যস্ত চিন্তারীতি ও তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় না মিললেও সাহিত্যের মূলগত সত্য সম্পর্কে তাঁর মনে একটি সুস্পষ্ট প্রত্যয় ছিল। এ-ছাড়া বাঙলা সাহিত্যের নানা সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি যে সব গঠনমূলক বক্তব্য পেশ করেছিলেন, সেখানে সুবিন্যস্ত চিন্তারীতি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি-

৪। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ্‌উল্লাহ : নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা (২য় সংস্করণ), ১৯৬৯, পৃঃ ৪৬-৪৭

ভঙ্গীর ছাপ মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের একালের বাঙলা সাহিত্যের কোন সমস্যাই প্রায় তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সাহিত্যের মূলগত সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি বাঙলা সাহিত্যে নানা সমস্যার জট মোচনের প্রশংসনীয় প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক দিকটি ছাড়া তার যে একটি সুগভীর সামাজিক তাৎপর্যের দিক রয়েছে, এ সম্পর্কে তাঁর মনে কোন অস্পষ্টতাই ছিল না। এই সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক দিকের আলোচনায় তঁরে প্রয়াস কতকটা প্রক্ষিপ্ত হলেও এর সামাজিক তাৎপর্যের দিক উদঘাটনে তাঁর প্রয়াস যে অনেক বেশী সুসংবদ্ধ তা স্বীকার করতেই হয়। কোন সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত চেতনা তাঁর দৃষ্টিকে খর্ব করেনি। পরিপূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমাদের বাঙলা সাহিত্যের যাবতীয় সমস্যাকে খতিয়ে দেখেছেন, আর সে-সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠু চিন্তাভিত্তিক কার্যকরী পন্থাও নির্দেশ করেছেন। নজরুল-প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়নের জন্য তাঁর ভাবনা-চিন্তার এই দিগন্তের সাথে পাঠকের যোগসাধন তাই একটি অবশ্যপালনীয় শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আপন শিল্পীসত্তার স্বরূপ নির্দেশ করে নজরুল বলছেন,

> মানস সরোবরে বদ্ধ জলধারাকে শুভ শঙখধ্বনি করে নিয়ে চলেছি কবি আমি ভগীরথের মত। আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সংঘ।"

'বিদ্রোহী' বলে সাধারণ্যে পরিচিত কবির এ স্বীকারোক্তি নানা কারণে অতি মূল্যবান। তিনি যে মুখ্যত রোমান্টিক স্বাপ্নিক কবি, যিনি বনের পাখীর মত মুক্তির আনন্দে গান গাইতে পারলেই খুশী—একথাই হচ্ছে তাঁর কবি-স্বভাব সম্পর্কে চরম সত্য। কিন্তু যুগ-সমস্যার শায়ক-বিদ্ধ হয়ে বার বার তিনি নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন রূঢ় জীবন-বাস্তবের মধ্যে। তাঁর নিজের স্বীকৃতি থেকেই আমরা জানতে পাই যে স্বপ্ন

৫। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার', চিঠি-পত্র সংখ্যা ১০ : (১১-৮-২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে লেখা কবির পত্র) পৃঃ ১৬৩

সুন্দরের ধ্যান বিঘ্নিত হয়েছে বলেই তিনি মাঝে মাঝে বিদ্রোহীর রণহুঙ্কারে ফেটে পড়েছেন অসুন্দরকে ছেদন করার উদ্দেশ্যে বাঁশী ছেড়ে হাতে তুলে নিয়েছেন অসি। কাজটা যে নিতান্ত দায়ে পড়েই করেছেন তা প্রকাশ পায় তাঁর কৈফিয়ৎ দেবার প্রচেষ্টা থেকে ঃ

> সুর আমার সুন্দরের জন্য। আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে, সেই অসুরের জন্য।[৬]

বস্তুত সকল রোমান্টিক কবির ন্যায় নজরুল ছিলেন মূলত সুন্দরের পূজারী, আনন্দের ধেয়ানী। তাই আপনাকে বিদ্রোহীরূপে পরিচিত করতে তার বরাবর অনীহা ছিল। তিনি আপন মনোভাব স্পষ্ট করেই বলেছেন ঃ

> আমাকে বিদ্রোহী বলে খামাখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোন দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।[৭]

তিনি তার পর অকপটেই বলেছেন ঃ

> একথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে আমি শক্তি সুন্দর রূপসুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারি নি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মন্ত্র—Truth is beauty beauty truth - - - সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম।[৮]

তবে তাঁর এ সৌন্দর্য-ধ্যান কবি-স্বভাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে গতানুগতিক রোমান্টিক ভাবনা থেকে যে কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে ফুটে উঠেছে, তাও তাঁর উক্তি থেকে পরিস্ফুট ঃ

৬। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' : 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা' শীর্ষক অভিভাষণ, পৃঃ ১১১

৭। ঐ ঐ প্রতিভাষণ পৃঃ ৯৫

৮। ঐ ঐ প্রতিভাষণ পৃঃ ৯৫-৯৬

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে; গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি। কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতি।[৯]

রূঢ় জীবন বাস্তবের পটভূমিতে রূপে রূপে দেখার এ অভিজ্ঞতা অপরূপই বটে। তাই তাঁর পক্ষে সুন্দরের চোখে জল দেখার অভিজ্ঞতা অপ্রত্যাশিত নয়। আর এ বেদনাময় অভিজ্ঞতার জন্যেই "বাণীর কমল বনের বনমালী' কবির বাণী অনেক ক্ষেত্রেই 'বেদনাতুরের কান্না' হয়ে দেখা দিয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যের লক্ষ্য 'সর্ববন্ধন মুক্তির—পূর্ণতম স্রষ্টার'[১০] আনন্দময় সৌন্দর্যময় অভিব্যক্তি।
এই মজ্জাগত সৌন্দর্যবোধই প্রথমাবধি নিয়ন্ত্রিত করেছে কবির কাব্য-ভাবনাকে। তাই কাব্যসৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন:

আনন্দ ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা মানুষের চিরন্তন। মানুষ অন্নের জন্য ক্ষুধা অনুভব করে, তেমনি করে সৌন্দর্য পিপাসাকে অনুভব। মানুষের এই সৌন্দর্য-ক্ষুধা থেকেই কাব্যের সৃষ্টি, কবির জন্ম।[১১]

অন্যত্র বলেছেন:

কবিতা আর দেবতা সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় যা সুন্দর তাই দিয়ে।[১২]

যদিও কবি সাথে সাথে একথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে,

৯। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার': প্রতিভাষণ পৃঃ ৯৭
১০। ঐ ঐ চিঠি-পত্র, সংখ্যা ২৪, পৃঃ ১৮৪
১১। ঐ ঐ 'স্বাধীন চিন্তার জাগরণ', পৃঃ ১২৮
১২। ঐ ঐ চিঠি-পত্র সংখ্যা ১১; ১৮১

কবি ও সাহিত্যিকের জীবন ও তাঁর সৃষ্টি যেন শতদল। তার এক একটি দল জন্ম নিয়েছে দুঃখবেদনার আঘাত পেয়ে।[১৩]

রোমান্টিক হয়েও যে কবি বাস্তব জীবনবোধ বিবর্জিত নন, এ উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে। আসল কথা জীবনবেদনার কেন্দ্রে সমাসীন থেকেই তিনি সুন্দরের ধ্যান করেছেন। আঘাত বেদনাহীন নির্জীব জীবনে যেখানে 'চলার আনন্দ স্রোতের বেগ এবং ঢেউয়ের কলতান ও চঞ্চলতা'[১৪] নেই, সেখানে যে সুন্দরের তথ্য প্রাণবান সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সকল আদর্শবাদী রোমান্টিক কবির ন্যায় নজরুল বিশ্বাস করতেন আর্ট-এর অঙ্গ সত্যের প্রকাশ (Execution of truth)।[১৫] আর এ সত্য মাত্রই সুন্দর ও মঙ্গলময় ? সত্যের প্রকাশই হচ্ছে আর্টের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।[১৬] অথচ এও তিনি জানতেন যে, 'উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়।'[১]

ভাবনার এ ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতার আভাস থাকলেও মনে হয় কবি যা বলতে চেয়েছেন তা হল এই যে, আর্ট মহৎ উদ্দেশ্যের পরিপোষকতা করতে পারে, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য আর্টকে ছাপিয়ে গেলে তা হবে একটা দুর্ঘটনা। মনে রাখতে হবে আর্ট মুখ্য, উদ্দেশ্য গৌণ। অথচ কবি তখন পরমুহূর্তেই বলেন,

আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।[১৭]

তখন নিয়ম বন্ধ ভীত রোমান্টিক কবির অবুঝ মনোভাবের পরিচয়টি সুস্পষ্টই হয়ে ওঠে। এটা তাঁর সাহিত্য ভাবনার দুর্বলতা তা অস্বীকার করা যায় না। মস্তিকের নির্দেশ মানতে এ'টা আপত্তি ছিল বলেই যে তাঁর শিল্পকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেকথা বুঝতেও চান নি তিনি।

১৩। আবদুল কাদির সম্পাদিত : নজরুল রচনা সম্ভার : স্বাধীন চিন্তার জাগরণ পৃঃ ১২৯
১৪। ঐ নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড) : 'যুগবাণী গ্রন্থের' 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: পৃঃ ৬২১
১৫। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬২৯
১৬। ঐ নজরুল রচনা সম্ভার : চিঠি-পত্র সংখ্যা ২৪, পৃঃ ১৮৪
১৭। ঐ ঐ পৃঃ ১৮১

কবির রোমান্টিক স্বভাবের গভীরে যে একটি বিরোধ ছিল তাই তাঁর এধরনের আচরণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও কাব্য তথা সাহিত্যের মূলগত সত্য নির্দেশে তিনি ব্যর্থ হন নি। সাহিত্য যে লেখকের 'ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ'[১৮] তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আপন সাহিত্য-কর্মের মধ্যে তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিস্বরূপের ছায়া প্রত্যক্ষ করে কুণ্ঠিত বোধ করেননি। এ প্রসঙ্গেরই জের টেনে তিনি অন্যত্র বলেছেন :

> লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও লুকাইতে পারিবেন না।[১৯]

সাহিত্য সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যিক যদি নিজের কথা, নিজের ব্যথা দিয়ে বিশ্বের কথা বিশ্বের ছোঁওয়া না দিতে পারেন অর্থাৎ তাকে সার্বজনীনত্ব[২০] না দান করতে পারেন তবে সে সাহিত্য ব্যর্থ, এই ছিল নজরুলের ধারণা। সাহিত্যের এই সার্বজনীনত্ব তখনই দেখা দিতে পারে যখন লেখক হতে পারবেন আকাশের মত উন্মুক্ত উদার—ধর্ম-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, বড় ছোট সবরকম ভেদ জ্ঞান থেকে মুক্ত।[২১] সাহিত্যের স্থায়িত্বের জন্যই তার এই সার্বজনীন রূপ কাম্য, এ-কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন।[২২] আর সত্যিকার সাহিত্য হলে, তা যে কোন গণ্ডী মেনে চলতে পারে না। এবং তা যে সকল জাতিরই সাহিত্য বলে গণ্য হতে বাধ্য

১৮। আবদুল কাদির সম্পাদিত : নজরুল রচনা সম্ভার : 'আর যদি বাঁশি না বাজে' পৃঃ ১৪৬

১৯। ঐ নজরুল-রচনাবলী (১ম খণ্ড): যুগবাণী গ্রন্থ 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৬৮

২০। ঐ ঐ ঐ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৬২৮-৬২৮

২১। ঐ ঐ

২২। ঐ ঐ

এমন একটি প্রশান্ত ধারণাও [২৩] নজরুলের ছিল। তাঁর সাহিত্য-ভাবনার পরিধিতে কাব্য পাঠের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটিও জবাব খুঁজে ফিরছে। সে প্রশ্নের জবাবও তিনি নিজের মত করেই দিয়েছেন:

> বড় বড় কবির কাব্য পড়া এই জন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায় চিন্তার বদ্ধধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারার যে উদ্বেগ, তা সহজ হয়ে ওঠে।[২৪]

আপন শিল্পীসত্তা এবং বিশেষভাবে সাহিত্যের রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এসব বিচ্ছিন্ন উক্তি মন্তব্য বা বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নজরুল এ-জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রেই প্রায়শঃই আত্মনিষ্ঠ মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণের পথ না ধরে উপলব্ধ সত্যকেই যেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ব্যক্ত করতে তিনি সমধিক উৎসুক। তথাপি এ-সব বক্তব্যের মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা বোধ হয় অসম্ভব নয়। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, উক্তিগুলি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে করা হলেও এদের মধ্যে ভাবে ও চিন্তার পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে। মোট কথা রোমান্টিক আদর্শবাদী সাহিত্য ভাবনার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই এতে সুচিহ্নিত হয়েছে, এ-কথা বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গেই দাবি করা চলে।

তবে রোমান্টিক কবি হলেও যুগ-জীবনের প্রচণ্ড দোলাকে নজরুল কোন দিনই উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই কাব্যে তিনি বার বার ফিরে আসছেন সংঘাতসংক্ষুব্ধ সংসারের তীরে। তাঁর সাহিত্য-ভাবনায়ও সেই যুগজীবনের ভাবনার দোলা ভাল ভাবেই লেগেছিল মনে রাখতে হবে। স্বাভাবিক কারণেই দেশ-কাল-পরিপার্শ্বিক চেতনা-সম্পৃক্ত তাঁর কাব্যধারার সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে তাঁর সাহিত্য-চিন্তা কতকটা যুগচেতন সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। সাহিত্য-ভাবনার এই পর্যায়ে তাঁর চিন্তা-পরিধির মধ্যে এসেছে বাঙলা সাহিত্যের নানা সমস্যা—যে সব সমস্যার মূল খতিয়ে

২৩। আবদুল কাদির সম্পাদিত: নজরুল-রচনাবলী (১ম খণ্ড): যুগবাণী গ্রন্থের 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য পৃঃ ৬২৮-৬২৮

২৪। আবদুল কাদির: নজরুল রচনা সম্ভার: পত্র সংখ্যা ১১, পৃঃ ১৬৩-১৬৪

পাওয়া যাবে সমকালীন বাঙলা দেশের হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক জীবন সম্পৃক্ত নানা বিরোধী চিন্তার জটের মধ্যে। হিন্দু-মুসলমানের জীবনের কর্ম ও চিন্তায় সমঝোতার অভাব কিভাবে তাদের বাস্তবজীবনের চূড়ান্ত বিড়ম্বনা সৃষ্টি ক'রে তাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভাঙন ধরাচ্ছে, কি ভাবে তাদের সুস্থ জীবন-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তা কবি বাস্তববাদীর মন ও দৃষ্টি নিয়েই অনুধাবন করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান জীবনের এ অভিশাপ বাঙলা সাহিত্যের স্বভাব-সুন্দর বিকাশকে কি ভাবে ব্যাহত করেছিল তা কবির চেয়ে ভাল করে কেউ বুঝি ভেবে দেখেন নি। হিন্দু-মুসলিম জীবনের শত অনৈক্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে বাঙলা সাহিত্য-এ বিশ্বাসেই তিনি সচেতনভাবে তাঁর লেখনীকে পরিচালনা করেছেন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। তাই আপন সাহিত্য-সাধনার মূলগত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন:

> আমি (আমার সাহিত্য কর্মে) হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক্ করবার চেষ্টা করেছি। গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।[২৫]

তা করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে অকপটভাবেই তিনি উভয় সমাজকে বেশ কিছু তিক্ত সত্য কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে' আমাদের 'এ পোড়া দেশের কিছু হবে না।' আর এ-অশ্রদ্ধা যে সাহিত্যের ভিতর দিয়েই দূর হতে পারে[২৬] সে সম্পর্কে তিনি প্রায় স্থির-নিশ্চিত ছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তির মূঢ়তাবশত সাহিত্যের রাজ্যে ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পেয়ে বাঙলা সাহিত্যের প্রাণে যে সংকট উপস্থিত হয়েছিল তাতে সামাজিক দায়িত্ব সচেতন শিল্পীর পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁর মতে সাহিত্য সকল কালের এবং সকল দেশের, সকল জাতির সাধারণ

২৫। আবদুল কাদির সম্পাদিত : নজরুল রচনা সম্ভার : প্রতিভাষণ, পৃ: ৯৬

২৬। ঐ ঐ চিঠি-পত্র সংখ্যা ২৪, পৃ: ১৮৫

সম্পদ—তা তিনি হিন্দুই লিখুন, আর মুসলমানই লিখুন। তিনি মনে করতেন

> ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। কারণ ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না জন্মও লাভ করতে পারে না।[২৭]

মুসলমান সমাজে ইসলামী সাহিত্য (হিন্দু রচিত সাহিত্যের পাল্টা হিসেবে) রচনার ধুয়া তুলে তাই ভুল করেছে একথা তিনি বহুবার স্পষ্ট করে বলেছেন। কারণ যুক্তিসঙ্গতভাবেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে

> ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পরে কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না।[২৮]

আর সে সত্য যেহেতু মূলত সার্বজনীন বিশ্বজনীন তাই তা শেষ পর্যন্ত বিশেষ সাম্প্রদায়িক চেতনা পুষ্ট ধর্মের গণ্ডি মেনে চলে।

বাঙলা সাহিত্যের বড় সমস্যা যে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও সত্য দৃষ্টির অভাবের ফল তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় উগ্রতাবশত দৈশিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে হিন্দুর পৌরাণিক ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করার মুসলিম মানসপ্রবণতা এবং কূপমণ্ডুক সঙ্কীর্ণ প্রথাবদ্ধ উন্নাসিক মনের প্ররোচনায় মুসলমানী চিন্তা ভবনার পরিপোষক আরবী-ফার্সী শব্দের প্রতি এক ধরনের আক্রোশমূলক হিন্দুমনোভাব, যা ভাষাকে মুসলমানীত্বের হাত থেকে রক্ষা করার অপচেষ্টায় সর্বদা সংস্কৃতের দ্বারে ভিক্ষা রত, এ দুয়েরই তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে বাঙলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই যখন সাহিত্য তখন তাকে হিন্দু-মুসলমানের এ আত্মনাশবিরোধী মনোভাবকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পরস্পরের ভাবনা-চিন্তার ঐতিহ্যে শরীক হতে হবে। সে জন্য উভয়ের উদ্দেশে তাঁর উপদেশ ঃ

২৭। আবদুল কাদির সম্পাদিত ঃ নজরুল রচনা সম্ভার ঃ চিঠি-পত্র সংখ্যা ৬, পৃঃ ১১৫
২৮। ঐ ঐ ঐ ২৪, পৃঃ ১৮৪

এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায় হিন্দুরও তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়।[২৯]

অথ বাস্তবে তাই ঘটেছে। এমতাবস্থায় নজরুল ইতিকর্তব্য হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের মূঢ়তাকে আঘাত হেনেছেন শক্ত করে—মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করে উন্নাসিক অনুস্বারবাদীদেরকে আর হিন্দু দেবদেবীর নাম উল্লেখ করে গোঁড়া মুসলমান সমাজকে। ক্রুদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তাঁকে 'যবন' 'কাফের' বলে গাল দিয়েছে। তদুত্তরে তিনি স্পষ্টতর কঠোরতর সত্যভাষণের সাহস দেখিয়ে বলেছেন,

আমি মনে করি বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে ও সাজে তাঁর শ্রীহানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। বাঙলা কাব্যলক্ষ্মীকে দুটো ইরাণী জেওর পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়।[৩০]

পুনশ্চ

হিন্দু দেব দেবীর নাম নিলেই যদি কাফের হয়ে যেতে হয় তা হলে মুসলমান কবি দিয়ে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি কোন কালেই সম্ভব হবে না—জৈগুণ বিবির পুঁথি ছাড়া।[৩১]

বস্তুত সত্য কথাকে সহজভাবে, নির্ভীকভাবে বলতে তিনি পিছ্-পা ছিলেন না কখনই। আর এক্ষেত্রে বুদ্ধি মনন-যুক্তির পথে বলিষ্ঠ পদপাতেই তিনি এগিয়ে গিয়েছেন বল্লে বোধ হয় যথার্থই বলা হবে। কারণ আবেগের সস্নেহ প্রশ্রয় সত্ত্বেও এসব বক্তব্য তাঁর ধী-শক্তির সমর্থনে আপন মেরুতেই সংস্থিত।

২৯। আবদুল কাদির সম্পাদিত : নজরুল রচনা সম্ভার চিঠি-পত্র সংখ্যা ২৪, পৃঃ ১৮৬

৩০। ঐ নজরুল-রচনাবলী (২য় খণ্ড) : 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ', পৃঃ ৬২৭

৩১। ঐ নজরুল রচনা সম্ভার, চিঠিপত্র সংখ্যা ২৪, পৃঃ ১৮৬

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্লিন্নতার একটি গভীরতর কারণ নজরুলের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। বৃহত্তর জাতীয় জীবনের যে বড় এক ট্র্যাজেডিরই ফলশ্রুতি আমাদের সাহিত্যের বর্তমান দুর্গতি তা চিহ্নিত করে নজরুল বলেছেন ঃ

> আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিই এই যে, আমার সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি।[৩২]

এই যে কাছের মানুষটিকে আবিষ্কারের অক্ষমতা এটাই বাঙালী হিন্দু-মুসলমান তথা বাঙালা সাহিত্যের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। আমাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা, ভাবনার কূপমণ্ডুকতা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাবই এর জন্যে দায়ী। তাই নজরুল তাঁর সাহিত্য-কর্মের মধ্যে প্রায় সর্বত্র প্রয়াস পেয়েছেন উদার মানবতাবোধের জোরালো হাওয়া বইয়ে দিয়ে এ সঙ্কট অতিক্রমণের। তা সব সময় যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় তিনি বিদ্রোহের বিপ্লবের আওয়াজও তুলেছেন। আহ্বান করেছেন জনসাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজনে, জনগণের স্বার্থে, নূতন করে যোগ স্থাপনের চেষ্টায় ব্রতী হতে দেশের শিল্পী সমাজকে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের সাহিত্য টবের ফুল গাছের মত প্রায় মাটির সংস্পর্শ বর্জিত বলেই তার আশানুরূপ বিকাশ ঘটছে না।।[৩৩] বৃহত্তর জীবনপ্রবাহ থেকে রস গ্রহণের অক্ষমতা করে তুলেছে তাঁকে পাংশু, বিবর্ণ। কতিপয় বুদ্ধিজীবীর করুণার পাত্র জাতীয় জীবনে ব্যাপক সংযোগের অভাবে হিন্দু-মুসলমান যেমন কাছের মানুষ হয়েও অনেকটাই অনাত্মীয় হয়ে গিয়েছে, সাহিত্যেও ঐ একই কারণে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ-রেখা মুছে যায় নি। গণজীবনে জোয়ার এলেই যে সাহিত্যের এই সংকট মোচন সম্ভব সে সম্পর্কে নজরুলের মনের একটি বলিষ্ঠ প্রত্যয় সদা জাগ্রত ছিল। সাহিত্যে ছোট বড় সবারই প্রয়োজন আছে এ-কথা তিনি মানতেন, তাই বৃহত্তর জনজীবনের সমর্থন-সঞ্চিত বাঙলা সাহিত্যের জীবনমুক্তি প্রশ্নটি তাঁর যথেষ্ট শিরঃ পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ-সমস্যা সমাধানের পন্থা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ভেবেছেন এবং আপন সাধ্যানুযায়ী হিন্দু-মুসলিম

৩২। আবদুল কাদির সম্পাদিত : নজরুল রচনা সম্ভার : মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা, পৃঃ ১১৫

৩৩। ঐ ঐ জনসাহিত্য, পৃঃ ১২৩

জীবনের বিশিষ্ট উপকরণ নিয়ে জাতীয় সাহিত্যের এক সমন্বিত ভিত্তি রচনার সাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বিশিষ্ট সমাজকর্মী চিন্তানায়কের মত অনেকটাই বাস্তব কর্ম পদ্ধতির নিরীক্ষায় নিয়োজিত।

একজন রোমান্টিক কবির এ বাস্তবমুখীন চিন্তা ও কর্মধারা আমাদের বিস্মিত করলেও আজ আর কোন চিন্তা সংকটের কারণ হয়ে দেখা দেয় না। উনিশ শতকীয় মানবতার ঐতিহ্যে লালিত ও বিশ-শতকীয় গণ-আন্দোলনের চেতনায় পুষ্ট রোমান্টিক কমি-মানসে দুই প্রবৃত্তির সহাবস্থান আজ অতি স্বাভাবিক ঘটনা রূপেই গণ্য। নজরুল-মানবতার বাস্তব দৃষ্টান্ত। আকাশচারী বিহগের ন্যায় সত্য-সুন্দরের স্বপ্নাভিসারী হয়েও তিনি তাই অবলীলায় মাটির বুকে নেমে এসেছেন, সহস্র শিকড় দিয়ে তরুলতা যেমন মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকে তেমনি করে পৃথিবীর মানুষকে আঁকড়ে ধরেছেন অপার মমতায়। ধূলোবালি মেখেও অতৃপ্তি বোধ করেন নি।[৩৪] এতৎ সত্ত্বেও তিনি যখন বলেন যে, তাঁর সত্তার পনের আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর। তখন তাঁকে বিশ্বাস করতে আমাদের আপত্তি হয়না। কারণ ওটাই তাঁর প্রতিভার মূলগত প্রবৃত্তি—যুগধর্মে সে প্রবৃত্তি অনিবার্যভাবে অনেকটাই মানবমুখী হয়ে পড়েছে এই যা ব্যতিক্রম। এই যে যুগধর্মকে স্বীকার করে নেওয়ার সহজাত ক্ষমতা তাই নজরুল-প্রতিভাকে ঐতিহাসিক তাৎপর্য দান করেছে। সত্য-সুন্দরের পূজারী মানবতার বাণীবাহক এই কবি সম্পর্কে আর একটি লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে এই যে, তিনি সর্বত্র আবেগনির্ভর হলেও আপন শিল্পকর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্চর্যরূপে নির্লিপ্ত নিরাবেগ; ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেকে বিড়ম্বিত করতে প্রস্তুত নন একেবারেই। তাই অপরূপ নির্লিপ্তিতার সাথে তিনি বলেন :

> বাঙলা সাহিত্যে আমার স্থান সম্বন্ধে আমি কোন দিনই চিন্তা করি নি। এর জন্যে লোভ নেই আমার। সময়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমালোচক। যদি উপযুক্ত হই। একটা ছালা-টালা পাব হয়ত।[৩৫]

৩৪। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' : বর্তমান বিশ্বসাহিত্য : পৃঃ ৮৬
৩৫। ঐ ঐ চিঠি-পত্র সংখ্যা ৯, পৃঃ ১৫৬

ভাবনা ও চেতনার এই নবদিগন্তে নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর আমাদের মনে কবিসম্পর্কে এই সপ্রশংস মনোভাবেরই সৃষ্টি হয় যে, তিনি মূলত ভাবুক হলেও বাস্তব বুদ্ধি চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রও তাঁর পাক্ষে অগম্য ছিল না। শিল্পী হিসাবে তিনি প্রতিভাবান বালকের ন্যায়ই প্রথমাবধি লিখে গিয়েছেন, কোথাও বয়স্কের ন্যায় ধী-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি—বুদ্ধদেবের এ অভিযোগ এরপর নির্বিচারে মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়। নজরুল-প্রতিভা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য আজ তাই কেবল সংশোধিত রূপেই গ্রহণ করা চলে বলে আমরা মনে করি।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

বাংলা সাহিত্যে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ একটি নাম—স্বল্পকীর্তিত কিন্তু শ্রদ্ধেয়। সাহিত্যরাজ্যে তিনি মননের জনবিরল পথের পথিক। কর্মাবর্তের মধ্যে ঘূর্ণমান হয়েও প্রচুর অধ্যয়নের ফলে যে বিপুল মানস-সম্পদের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন, তাই প্রবন্ধের আকারে অকৃপণভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন উত্তর সূরীদের উদ্দেশে। ইস্‌লামের ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শনই প্রধানত তাঁর পরিক্রমের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছে। এ ক্ষেত্রে যে দুর্লভ মনীষা ও রসজ্ঞানের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তাই বাংলা সাহিত্যে তাঁর জন্যে একটি আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে মনীষার ধারাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, বরকতুল্লাহ্ সে ধারারই একজন যোগ্য অনুসারী। তিনি একজন কবিপ্রাণ ভাবুক, চিন্তাশীল দার্শনিক, ইতিহাস ও জীবনী আলেখ্যের চিত্রকর মাত্র নন, তিনি একজন ভাষাশিল্পীও বটেন। ভাষাশিল্পী হিসেবে তিনি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, মোজাম্মেল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রমুখেরই এক যোগ্য উত্তরসূরী। 'পারস্য-প্রতিভা'র বাণী রূপদানকারী বরকতুল্লাহ, সাহিত্যজীবনের সূচনায় যে প্রত্যাশা জাগিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সে প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বজায় রাখতে না পারলেও, আমাদের একেবারে নিরাশ করেননি। তাঁর কর্ম জীবনের চঞ্চলতা যে তাঁর সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবু বরকতুল্লাহ্, আমাদের, বিশেষত মুসলমানের

জাতীয় জীবনে জ্ঞান চর্চা, মনন ও ভাবনার ক্ষেত্রে দৈন্যমোচনের জন্যে যেরূপ অক্লান্ত সাধনা করেছেন, তার তুলনা বড় বেশী একটা মিলে না। তাঁর সে সাধনার ধারা আজ স্তিমিতপ্রায়, কিন্তু এখনও স্তব্ধ হয়ে যায় নি। এ যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বাঙালী মুসলমানের কাছে বরকতুল্লাহ্ একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের বাণী নিয়ে উপস্থিত। তাঁর সাহিত্য সাধনা মুসলমানের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাদের চিন্তার দিগন্তপ্রসারণের পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছে।

বরকতুল্লাহ্ তাঁর সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলমানকে আপন সত্তা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তার মধ্য দিয়ে মুসলমানকে সহজের পথ পরিত্যাগ করে তপস্যা, সাধনা ও সংযমের পথই নির্দেশ করেছেন। স্বাজাত্যবোধ, ঐহিত্য-প্রীতি, ধর্মনিষ্ঠা, পরমত-সহিষ্ণুতা, উদার মানবিকতা, সূক্ষ্ম দার্শনিকতা, ঐতিহাসিক চেতনা ও শিল্পীসুলভ সৌন্দর্যবোধ ও ভাষা জ্ঞান তাঁর রচনা-সমূহকে একটা বিশিষ্টতা দিয়েছে। বরকতুল্লাহ্‌র রচনা আধুনিক কালের নবজাগ্রত বাঙালী মুসলমানকে জীবনের যাত্রা পথে বেশ কতকগুলো মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী করেছে। বরকতুল্লাহ্‌র সাহিত্য-সাধনা তাই আমাদের সশ্রদ্ধ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বিস্ময়ের কথা এই যে, 'পারস্য-প্রতিভা'র লেখক বরকতুল্লাহ্ ইতিমধ্যেই যেন আমাদের চিন্তার পরিধির বাইরে চলে গিয়েছেন। আমাদের নতুন সাহিত্যের যে বোধনের কাজ আজ চলেছে, সেখানে বরকতুল্লাহ্ প্রায় অনুপস্থিতই বটে। কিন্তু পূর্ব-সূরী হিসেবে তিনি আমাদের জন্যে অবস্থান করেছেন একজন পথ-নির্দেশক হিসেবে, সে-কথা কোন মতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। বরকতুল্লাহ্‌র মত প্রবীণ সাহিত্য-কর্মীদের জীবনী ও সাহিত্য কর্মের সত্যিকার আলোচনার কাল উপস্থিত হয়েছে। কারণ, পূর্ব-সূরী এসব সাহিত্য কর্মীদের সাধনার স্বার্থকতা ও ব্যর্থতার পূর্ণ উপলব্ধির মধ্য দিয়েই কেবল আমরা আমাদের ভবিষ্যতের পথ নির্মাণে যথার্থ দিগ্‌দর্শন লাভ করতে পারি। অন্যথায় আমাদের নতুন সাহিত্যের ভিত্তি দুর্বল থেকে যেতে বাধ্য।

॥ ২ ॥

বরকতুল্লাহ্ বাঙ্‌লা-গদ্যের একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী। বাঙালী মুসলমান লেখকদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রমুখ পূর্ব-স্থরী এবং প্রায় সমসাময়িক লেখক মোঃ ওয়াজেদ আলী, মোতাহের হেসেন চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি। এ রা সবাই কম বেশী বাঙ্‌লা গদ্যের কৃতী লেখক। বাঙালী মুসলমানের মনন ধারার এঁরা যোগ্য প্রতিনিধি। 'পারস্য-প্রতিভা' ও 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ দুটির লেখক বরকতুল্লাহ্‌র স্থানও সেখানে সুনির্দিষ্ট। রচনার ভাষাদর্শ বিচারে এঁরা সবাই এক পথের পথিক নন, তা ঠিক। বরকতুল্লাহ্ ও তাঁর পূর্ব-স্থরী মুসলমান লেখকগণ মোটামুটি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের সাধনায় পুষ্ট সাধু গদ্যের আলঙ্কারিক রূপটিকে আশ্রয় করেছিলেন এবং তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ লেখকই রবীন্দ্রনাথের রচনাদর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত। বরকতুল্লাহ্‌র গদ্যে মাঝে মাঝে যে কবিত্বের আমেজ পাওয়া যায় তা যে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের ফল তাতে সন্দেহ নাই। তবে ভাষাদর্শের ব্যাপারে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখের গদ্য রচনাকেই মোটামুটি আপন শ্রেষ্ঠ রচনার আদর্শ করে নিয়েছিলেন। পরিণত বয়সে সে ভাষারীতি পরিত্যাগ করে তিনি বাংলা গদ্যের একটি সরলতর, প্রাঞ্জলতর রূপের আশ্রয় নিয়ে অবশ্য তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

বরকতুল্লাহ্‌র রচনা পরিমাণে খুব বেশী নয়। কিন্তু বিষয়বৈচিত্র্যে তা মোটামুটি আকর্ষণীয়। আর গুণগত দিক দিয়ে কিছু কিছু রচনা যেমন অতি উচ্চস্তরের শিল্পোৎকর্ষের অধিকারী, আবার কিছু গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। লেখক হিসেবে কোথাও তাঁর ভূমিকা জীবনী-আলেখ্য রচয়িতার, কোথাও দার্শনিকের, কোথাও বা ঐতিহাসিকের। 'পারস্য-প্রতিভা' গ্রন্থে তিনি মূলত কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী আলেখ্য রচনায় মনযোগী হলেও, সেখানে দার্শনিক ও সাহিত্য-সমালোচকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আবার ''মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তিনি মূলতঃ

দর্শনের দুরূহতত্ত্ব ব্যাখ্যায়ই নিযুক্ত। কিন্তু তাতে কাব্যমাধুর্য সঞ্চারে সুস্বাদু করে তুলতে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব দেখি না। 'কারবালা' গ্রন্থটিতেও তিনি ইতিহাসের পাতায় সত্য সন্ধানে নিযুক্ত। কারবালা কাহিনী নানা অনৈতিহাসিক, কাল্পনিক ঘটনার সংযোগে যে ভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, তা থেকে মূল সত্য আবিষ্কার করে কাহিনীটিকে ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। এ গ্রন্থে সাহিত্যরস সৃষ্টির অবকাশ কম। এ গ্রন্থের ভাষাভঙ্গীও অনুজ্জ্বল। তবে এ গ্রন্থে বরকতুল্লাহ্‌র ইতিহাস-নিষ্ঠ মনের পরিচয়টি উজ্জ্বল। 'নবীগৃহ সংবাদ ও 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' গ্রন্থদ্বয়ে বরকতুল্লাহ্‌ নবীজীবনের একটি সুন্দর ভাষ্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এ দুটি পরিপূরক গ্রন্থ। গ্রন্থ দুইটিতে তিনি নবী মুহম্মদের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি যেমন এঁকেছেন তেমনি তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বময় চরিত্র ও বিপ্লবী কর্মধারার মহাত্ম্য অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থ দুইটি ইতিহাশাশ্রিত জীবন কাহিনী রচনার বলিষ্ঠ প্রয়াস হিসাবে গণ্য হবে। নবীজীবনী রচনায় তিনি ইতিহাসের যুক্তি ও তথ্যের দাবীকে প্রায়শঃ মেনে নিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগের বশীভূত হয়ে রচনার বস্তুধর্মিতাকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছেন। এ দুটি গ্রন্থে বরকতুল্লাহ্‌ ঐতিহাসিক জীবনীকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ভাষাভঙ্গিতে তিনি এখানে কারবালা গ্রন্থের ন্যায়ই বিশিষ্টতাবর্জিত। তিনি এখানে এক ঐতিহাসিক মহাজীবনের ভাষ্য রচনায় ব্যাপৃত, একে উৎকৃষ্ট সাহিত্য গ্রন্থের মহিমাদানের জন্যে ভাষাশিল্পের দিকে যে প্রয়োজনীয় মনোযোগদানের আবশ্যকতা ছিল তা তিনি দেননি। ফলে 'পারস্য প্রতিভা'র ভাষার সৌন্দর্যচ্ছটা এখানে অনুপস্থিত! এ ছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত রচনাও কিছু কিছু আছে। সেগুলোর প্রকাশ-সম্ভাবনা যথেষ্ট। তবে সে সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশসাপেক্ষে মূলতুবী থাকাই বাঞ্ছনীয়।

॥ ৩ ॥

বরকতুল্লাহ্‌র সাহিত্যিক খ্যাতি আমাদের বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত ,পারস্য প্রতিভা' ও 'মানুষের ধর্ম' দুটি গ্রন্থের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

এ খ্যাতির ভিত্তি খুব মজবুত বলেই, তিনি শেষপর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান্ গল্পলেখক হিসেবে বেঁচে থাকবেন। দু'খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'পারস্য-প্রতিভা' বিরল মনীষা, রসজ্ঞান ও উচ্চস্তরের শিল্পচেতনার পরিচায়ক। 'পারস্য-প্রতিভা'য় তিনি পারস্য ইতিহাসের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনধারার পটভূমিতে ফেলে পারস্য-সাহিত্যের বিকাশের স্বরূপটি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট পারসিক কবি ও দার্শনিকদের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন? শুধু তাই নয়, প্রতিটি কবি ও দার্শনিকের ভাব ও চিন্তাধারার মর্মমূলে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। অনুপম শ্রী-সৌন্দর্যমণ্ডিত বেগবান্ গদ্যে আপন রসগ্রাহী মনের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে বরকতুল্লাহ্ একাধারে ঐতিহাসিক, দার্শনিক, জীবনীকার ও সাহিত্য-সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর রচনার ভাষায় চিত্রকরের চিত্রাঙ্কনক্ষমতা, সংবেদনশীল কবিমনের স্পর্শ ও পণ্ডিতমনের ঋদ্ধি একই সাথে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই এ গ্রন্থ অনবদ্য সৃষ্টি। বাঙলা ভাষায় এমন বহু-কীর্তিত গদ্য গ্রন্থের সংখ্যা চিরকালই অল্প। বরকতুল্লাহ্'র কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি প্রাচীন জ্ঞান-গরিমার কীর্তিভূমি, ইস্‌লামী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও লীলার কেন্দ্র পারস্যের ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগের সবগুলো উজ্জ্বল অধ্যায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁরই সাধনার বদৌলতে ফেরদৌসী, সাদী, ওমর খৈয়াম, হাফিজ, রুমী, জামী, নিযামী, প্রভৃতি পারসিক কবি-মনীষীদেরকে আমরা আমাদের মনোলোকের অধিবাসীরূপে প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত হয়েছি। শুধু তাই নয়, তাঁরা যে রসধারা বইয়ে দিয়ে পারস্যের তৃষিত চিত্তের পিপাসা মিটিয়েছিলেন, সে রসধারায় অবগাহনের সুযোগ লাভ করে আমরাও ধন্য হয়েছি। ইতিহাস সে রসধারার সাথে এককালে আমাদের সংযোগ বিধানের সুযোগ করে দিয়েছিল বটে; কিন্তু তার মর্ম অনুধাবনের প্রয়াস তখন বড় কেউ একটা করেনি। তাই ইতিহাস যখন পার্শ্ব-পরিবর্তন করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তখন থেকেই সে সংযোগসূত্র শিথিল হতে হতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দিকে প্রায় ছিন্ন হয়ে

গিয়েছিল। ঐ দ্বিতীয়ার্ধেই আবার মুসলিম নবজাগরণের সূত্রপাত হলে, এ বন্ধনসূত্রটি পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা হয়। মোজাম্মেল হকের 'ফেরদৌসী চরিত্রে' তার সার্থক সূচনা, বরকতুল্লাহ্‌র 'পারস্য-প্রতিভায়' সে প্রচেষ্টার পূর্ণ সফলতা দেখা যায়। পারস্য-ভাষার চর্চা এদেশে ঐতিহাসিক কারণেই এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে; কিন্তু পারস্যের সাথে আমাদের হৃদয়ের যোগাযোগের পথটি বরকতুল্লাহ্‌র 'পারস্য-প্রতিভার' বদৌলতে প্রশস্তই রয়েছে। 'পারস্য-প্রতিভা' শুধু পারস্য-কবিদের জীবনী ও সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ নয়। এটি পারস্য ও বাঙলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগেরই একটি সেতু। বরকতুল্লাহ্‌, এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে, একজন উচ্চস্তরের সংস্কৃতিসেবীও বটেন।

'পারস্য-প্রতিভা' ভাষাশিল্পের দিক থেকেও যে একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ, সে সম্পর্কে সুধীমহল একমত। ভাষার পরিচর্যা ও অনুশীলনে আজকাল যেরূপ শৈথিল্য দেখা যায়, উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকের প্রথম চার দশকেও তা' ছিল না। বরকতুল্লাহ্‌র সাহিত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ ঐ পরিবেশেই কেটেছে। তখনও সাধু গদ্যেরই বাড়বাড়ন্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরী গদ্য রীতিতে মৌল পরিবর্তন আনলেও, সাধুগদ্য এখনকার মত প্রাধান্য হারাতে বসেনি। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষাবিপ্লব এ-শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই তরুণ সাহিত্যিকদের আকর্ষণ করেছিল। বরকতুল্লাহ্‌র ভাষারীতি সবুজপত্রী আন্দোলনের পূর্ব যুগেরই নির্দিষ্ট পথ বেছে নিয়েছিল। কারণ তাঁর প্রতিভার ও ভাষার চারিত্র্য 'সবুজপত্রে'র জন্মের আগেই প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন ইত্যাদির সাহিত্যচিন্তা ও ভাষাদর্শের সাথে ব্যাপক পরিচিতি তাঁকে অনিবার্যভাবে সে-দিকে আকর্ষণ করেছিল। সে আদর্শের প্রাণ-রহস্যটি যে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তা তাঁর গদ্য ভাষার অপরূপ সার্থকতাতেই প্রতিবিম্বিত। সমালোচকরা বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর ভাষা সম্পর্কে যে উচ্চ সাধুবাদ দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর ভাষার যে পরিচয় আমরা পাই তা হচ্ছে, এ ভাষা "Very

chaste and sweet Bengali," " racy sweet Bengali prose", "highly chaste and elegant and the style is almost classical" এসব বিচ্ছিন্ন উক্তি থেকে বরকতুল্লাহ্‌র ভাষা সম্পর্কে যা ধারণা হয়, তা হচ্ছে এই : এ-ভাষা সুমিষ্ট, সুমার্জিত, সুক্ষ্ম-রুচিবোধের পরিপোষক, বেগবান সাধুভাষা এবং এর ভঙ্গীটি ক্লাসিকতাধর্মী। এ ভাষা অনেককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে 'inimitable prose of Bankim Chandra' অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের অননুকরণীয় গদ্যকে। কেউ কেউ এতে কার্লাইলের রচনার 'সুক্ষ্মসৌন্দর্যবোধ' ও রাস্কিনের 'কারুশিল্প বিশ্লেষণের নৈপুণ্য' প্রত্যক্ষ করে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। অনেকের মতে এ ভাষা 'ক্ষণে ক্ষণে কবিত্বময়ী' হয়ে উঠেছে, অনেকে এতে দেখেছেন 'চিত্রকরের দুর্লভ চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা'। মোটকথা, পারস্যপ্রতিভার গদ্যভঙ্গীতে প্রশংসা করার মত বহু গুণ সমালোচকরা খুঁজে পেয়েছিলেন। এ-গদ্য বিষয়ানুসারে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের উপলাকীর্ণ পথে চলতে গিয়ে এ-গদ্য সতর্ক পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বৈভবে কিছুটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে; আবার মানুষের ধ্যান চিন্তা-ধর্ম-দর্শনের অন্তহীন জটিল বিকাশধারার সূত্রানুসন্ধানে এ গদ্য অনেকটাই যেন চিন্তাভারাক্রান্ত, অতএব শ্লথ-গতি; কিন্তু সর্বত্রই তার দৃষ্টি বিশেষ লক্ষ্যে নিবদ্ধ। আবার কবি-সাহিত্যিকদের জীবন পট-নির্মাণে রত এ গদ্য জীবন-মহিমার অনুধ্যানের সাথে সাথে, তার অন্তর্গূঢ় চারিত্র্যটিকে তুলে ধরতে ব্যগ্র। এ ক্ষেত্রে চিত্রকর ও জীবনশিল্পী যৌথভাবে কাজ করে গেছে। কবি-ব্যক্তিত্বের মহিমাটি যেমন সর্বত্র তাঁর নজরে পড়েছে, তেমনি কবি-চরিত্রের মানবিক দুর্বলতার দিকটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এসব ক্ষেত্রে ভাষায় চিত্রধর্মিতার সাথে মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার সমন্বয় ঘটেছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কবির জীবনকাহিনী উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য হয়েছে। কবিদের সাহিত্য-কর্মের রূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে বাক-বৈদগ্ধ্যের সাথে রসবোধের সমন্বয় ঘটেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বক্তব্যে মাঝে মাঝে কবিত্বের প্রলেপ যেমন পড়েছে, তেমনি কবি ভাবনার অন্তঃসৌন্দর্য বিশ্লেষণে কবির রসবোধের সুক্ষ্মতা দেখা দিয়েছে। এসব কারণেই

সাধুভাষায় রচিত হলেও এ গ্রন্থ সকল রসিকচিত্তজয়ে সমর্থ হয়েছে। মোট কথা পারস্য-প্রতিভা বরকতুল্লাহ্‌র পাণ্ডিত্যের যেমন পরিচায়ক, তেমনি তাঁর শিল্পীসত্তারও মহত্বদ্যোতক গ্রন্থ।

॥ ৪ ॥

বরকতুল্লাহ্‌র অপর উল্লেখযোগ্য অবদান 'মানুষের ধর্ম' নামধেয় দার্শনিক সন্দর্ভ-সম্বলিত গ্রন্থটি। দর্শনের ন্যায় জটিল বিষয়ের আলোচনা বাঙলা সাহিত্যে খুব কম লেখকই করেছেন। আর যাঁরা করেছেন, তাঁদের অনেকের রচনাই পাণ্ডিত্যের তাজমহল হলেও সাহিত্যগুণোপেত হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম', ও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী। বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্যে দার্শনিক প্রবন্ধ রচনায় আর যাঁরা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন এবং বরকতুল্লাহ্‌। বরকতুল্লাহ্‌ই বোধ হয় একমাত্র মুসলমান লেখক যিনি দর্শন নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আর তাও আজ পর্যন্ত একটি গ্রন্থের মধ্যেই প্রায় সীমিত রয়েছে। গ্রন্থটিতে বরকতুল্লাহ্ 'সাধারণতঃ আমাদের মনে জীবন ও জগৎ, ইহলোক ও পরলোক, আত্মা ও পরমাত্মা, জড় প্রকৃতি ও মনোজগৎ, ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে সময় সময় যে-সব প্রশ্ন জাগে' সেগুলোর উপর দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন বলে জানিয়েছেন। বইটি দর্শনের, তাই এর বক্তব্য সাধারণের বোধগম্য হবে এমনটা বোধ হয় লেখক বা সমালোচক কেউ আশা করতে পারেননি। কিন্তু 'মানুষের ধর্ম' সে অপ্রত্যাশিত সার্থকতার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। সমালোচক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, "এমন সুবোধ্য ভাষায় ও সরস ভংগীতে বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে যে পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন।" এর ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলা হয়েছে, "ভাষা সর্বত্র সরল', বিষয়োপযোগী ও সুখপাঠ্য" ; বক্তব্যের কোথাও "অযথা উচ্ছ্বাস নাই"। তদুপরি এ গ্রন্থে লেখকের চিন্তার গভীরতা ও নিপুণ বিশ্লেষণ শক্তির যে পরিচয়

ফুটে উঠেছে, তাও সমালোচকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সমালোচক দার্শনিক-লেখক হিসেবে বরকতুল্লাহ্‌কে "মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, বোধ হয়, অদ্বিতীয়" বলে নির্দেশ করেছিলেন। গ্রন্থটির প্রশংসার যতদিক ছিল তার কোনটিই সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। গ্রন্থে ভারতীয়, ইসলামী ও পাশ্চাত্য দর্শনে লেখকের ব্যুৎপত্তির পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর স্বাধীন চিন্তার পরিচয়টিও পরিস্ফুট হয়েছে। ধর্মপ্রাণতার পরিচয় সত্ত্বেও বরকতুল্লাহ্‌ এ-গ্রন্থে ধর্মপ্রচারের পরিবর্তে বিশুদ্ধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের কথাই বেশী বলেছেন। তিনি জড়বাদী চিন্তাধারা খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন এবং অনুভূতির সাহায্যে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বৈদান্তিক ও সুফী মতবাদের ধারণাকে অনেকটাই সমর্থন করেছেন। তবে একথাও ঠিক "প্রাকৃতিক জগতে যাহা কিছু গ্রহণীয়, করণীয় ও বরণীয় তাহাকে জীবনের উপভোগ, উপায় ও উদ্দেশ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করিতে" সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন। বরকতুল্লাহ্‌র এ দার্শনিক চিন্তা সর্বশ্রেণীর সমালোচকের পূর্ণ সমর্থন পায়নি। আর তা কেউ প্রত্যাশাও করেন না। তাঁর রচনায় কোথাও কোথাও বিজ্ঞানবাদের উপর তীব্র কটাক্ষ এবং আধ্যাত্মিক দুর্জ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসকে অনেক সমালোচক নিন্দা করেছেন। তিনি বিচার বুদ্ধির পরিবর্তে অপরোক্ষানুভূতিবাদের (intuitionalism) সমর্থক হয়ে "activity of contemplationকেই 'rational' 'scientific' বিচার বুদ্ধির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এ-মনোভঙ্গী 'traditional mysticism' এর অনুবর্তনে অভ্যস্ত বলে, কেউ কেউ একে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ন্যায় "a lazy man's philosophy" বলে চিহ্নিত করেছেন। একথা নিশ্চিত যে বরকতুল্লাহ্‌র দর্শন চিন্তা অধীত জ্ঞানেরই ফল, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। এ অবস্থায় তিনি তাঁর চিন্তার rational ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেন না কেন, তা সহজে বোধগম্য হয় না। মূলতঃ বরকতুল্লাহ্‌ প্রাচ্য-দর্শনের অপরোক্ষানুভূতিবাদের খপ্পরে পড়ে এ বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পারেননি। তিনি আধুনিক কালে অতীন্দ্রিয়বাদীদের অনুভাবে আপন চিন্তাধারার

সমর্থন খুঁজে ফিরেছেন। তবে একথা ঠিক তাঁর বিশিষ্ট মানস-কেন্দ্রটির পরিচয় এ গ্রন্থে সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। সেখানেই এর সার্থকতা।

বরকতুল্লাহ্ দর্শন-চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আত্মিক সাধনাকেই সবার উপর স্থান দিয়েছেন। সেই পরিমাণে সমষ্টির ভাবনার মূল্য বেশী দেননি। তবে 'জীবন ও নীতি' এবং 'জীবন ও প্রবাহ' নামক দুটি প্রবন্ধে তিনি সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কের ভিত্তিতে দর্শন চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। প্রাচ্য দর্শনের অপরোক্ষানুভূতিবাদ-সমর্থিত আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসের প্রলেপ তাঁর চিন্তায় আধিপত্য বিস্তার করলেও তিনি ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধিবাদী চিন্তার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হননি। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটিতে বরকতুল্লাহ্‌র ভাষাভঙ্গী বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারেই কিছুটা বদ্‌লে গিয়েছে। এখানে abstract-এর দিকেই কবির লক্ষ্য বিশেষভাবে নিবদ্ধ বলে ভাষায় একটা অপরোক্ষতা, ইঙ্গিতময়তা দৃষ্ট হয়। তত্ত্বভাবনার প্রকাশের জন্যে ভাষার মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে মাত্রাতিরিক্ত শৃঙ্খলাপ্রীতি ও সংযমবোধ লক্ষিত হয়। এ জাতীয় রচনায় কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ স্বভাবতই কম; তথাপি লক্ষ্য করার বিষয়, বরকতুল্লাহ্ আপন হৃদয়নিষিক্ত সরস ভাষা ব্যবহার করে বক্তব্যকে অনেকটা স্বাদুতা দান করতে পেরেছেন। আপন ভাবনা ও চিন্তার পরিস্ফুটনে, ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তব্যে কাব্যের আমেজ এনে দিয়েছেন। এভাবে দর্শনের বিশেষক্ষেত্রে লেখনী চালনা করেও বরকতুল্লাহ্ প্রমাণ করেছেন যে তিনি মনে-প্রাণে একজন সাহিত্য-শিল্পী। বক্তব্য যাই হোক, তাকে ভাষার পারিপাট্যে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষমতা তাঁর আছে।

॥ ৫ ॥

দুঃখের বিষয়, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি ভাষার ক্ষেত্রে নিজস্ব শিল্পপন্থাটিকে সযত্নে পরিহার করে সহজ ও সুবোধ্য হবার-সাধনা করতে গিয়ে রচনার সে-যাদু হারিয়ে ফেলেছেন। তাই দেখি তাঁর 'কারবালা' 'নবীগৃহ-সংবাদ', 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মোহম্মদ' প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি। এসব গ্রন্থে তিনি ঐতিহাসিকের দায়িত্ব

পালনে অগ্রসর হয়েছেন বলে স্বীয় মনঃকল্পিত কথা বলার কোন সুযোগ রাখেননি। তথাপি 'পারস্য-প্রতিভা'র ভাষা সম্পদকে অস্বীকার করে নতুন পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা না করলে, তিনি বোধ হয় এ ক্ষেত্রেও কিছুটা বেশী সার্থকতা অর্জন করতে পারতেন। বিষয় এখানে তাঁর কল্পনার স্ফূর্তি ঘটাতে বাধা দিয়েছে। অথচ ভাষা আপন ঐশ্বর্যে সে ঘাটতি পূরণে অগ্রসর হয়নি। 'পারস্য-প্রতিভা' ও 'মানুষের ধর্মে'র লেখক এক্ষেত্রে অনেকটাই স্বধর্মচ্যুত, তাই বিশিষ্টতা বর্জিতও বটেন।

যৌবনে বহু সাধনায় একটি শিল্প-সম্মত সাধুভাষার পরশমণি লাভ করে, তিনি যা' কিছু রচনায় হাত দিয়েছিলেন তাতেই এসেছিল স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য। পরিণত বয়সে ভাষার সে পরশমণির দিক থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সরল, প্রাঞ্জল গদ্যের চক্‌মকির বাক্সটির দিকে হাত বাড়িয়ে আত্ম-বঞ্চনাকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। জ্ঞানের সাহিত্য রচনায় ঐশ্বর্যময় ভাষার কুহক কিছুটা না থাক্‌লে, তা যে লেখকের জন্য কি বিড়ম্বনা নিয়ে আসে, তা বরকতুল্লাহ্‌র শেষপর্যায়ের রচনা থেকেই প্রতিপন্ন হয়। তথাপি বরকতুল্লাহ্‌র সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ যায়নি। 'পারস্য-প্রতিভা' ও 'মানুষের ধর্ম' তাঁর অমরত্বের দাবীকে অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'কারবালা', 'নবীগৃহ-সংবাদ', 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মোহম্মদ' সে-দাবীকে পূর্ণ সমর্থন দেয় না, তা ঠিক। কিন্তু এসব রচনার শৈল্পিক ব্যর্থতা 'পারস্য' প্রতিভার লেখকের পরিচয়কে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতর করে তুলতে সাহায্য করেছে।

কবি জসীম উদ্‌দীন

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাঙলা কাব্যের আসরে জসীম উদ্‌দীনের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ তখনও নিত্যনতুন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে রসিক পাঠকের মনোহরণ করে চলেছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গশীর্ষে আসীন—তাঁর 'রক্ত-মাতাল-করা' কবিতা ও গান সেদিন তরুণদের প্রাণে যে উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল, তার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। এরই মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যের সর্বগ্রাসী প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করে এগিয়ে এলেন আধুনিক কবিরা সম্পূর্ণ নতুন জীবনদৃষ্টি, অপূর্ব মননশীলতা, অভিনব বাণীভঙ্গী ও চিত্রকল্পসৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তির যে সচেতন প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, নজরুলে যা' যুগ-জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকাশে উচ্চকণ্ঠ, তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি শক্তিমান কবিদের হাতে একটা শক্তিশালী আন্দোলন রূপে দানা বেঁধে উঠেছিল। কাব্যবস্তুর বৈচিত্র্য-সাধনে, নতুন বাক্‌ভঙ্গীর প্রবর্তনায়, অভিনব রূপ-প্রতীকের ব্যবহার-নৈপুণ্যে ও কাব্যের দেহে মননের দীপ্তি সঞ্চারে অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে এঁরা রবীন্দ্র-নজরুলের রোমান্টিক কাব্যধারার বিরুদ্ধে একটা সাহসিক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছিলেন। এঁদের এ বিদ্রোহী মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি বিষ্ণু দে'র একটি কবিতায়—

> রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
> চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং

আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।[১]

কাব্যে নতুন দিগন্তের অন্বেষায় এঁরা কথা ও সুরের পরিবর্তন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বাঙলা কাব্যের পরিমণ্ডল পর্যন্ত বদ্‌লিয়ে ফেল্‌তে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে বাংলা দেশকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তা মূলতঃ 'গ্রাম বাঙলা'। 'যন্ত্রযুগ-লালিত বণিক সভ্যতার পাদপীঠ কলকাতা, তাঁর কাব্যে কোনোদিন প্রাধান্য পায়নি।' পরবর্তী রবীন্দ্রানুসারী কবিরাও পল্লীপ্রকৃতির রূপেই মুগ্ধ ছিলেন। এমন কি জীবনদৃষ্টির অভিনবত্ব ও প্রকাশকলার অনন্যতা সত্ত্বেও জীবনানন্দের কাব্যেও পল্লী-প্রকৃতির এলায়িত রূপের স্বীকৃতি আছে। তাঁর 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি' তার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু আধুনিক কবিরা প্রায়শঃ পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের আকর্ষণকে উপেক্ষা করে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি, অবসাদ, যন্ত্রণা-বেদনাকেই মুখ্যতঃ সত্য বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। কলকাতা শহরকেই বিশেষ করে কাব্যের বিষয় করে তুলেছিলেন আধুনিক কবিরা।

তার কারণ, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়ঃ

'আমাদের জীবনের কেন্দ্র এখন সরে এসেছে শহরে। শহর এখন জীবনকে রূপায়িত করে, ধ্বংস করে, পরিপূর্ণ করে। শহরের মধ্যে, শহরের প্রাণের মধ্যে আমরা বাঁচি।'[২] কবি প্রত্যক্ষ করেছেন—"জীবন ফেনিল হয়ে উঠেছে শহরে—স্বার্থের সংঘাতে, বিলাসিতার লাস্যে, দারিদ্র্যের ভয়াবহতায়, উপছে পড়ছে কুল-ছাপিয়ে—মর্মান্তিক সংগ্রামে, অর্থ-গৃধ্নুতার পিশাচবৃত্তিতে, সভ্যমানুষের দীর্ঘ জটিল প্রণয়ে, রসবোদ্ধার সৌন্দর্য উপাসনায়, ভাঁড়ামিতে, বোকামিতে, হাস্য-স্রোতে, নিষ্ঠুরতায় বিচিত্র বহুমুখী জীবন; প্রাণের অফুরন্ত অপর্যাপ্ত

১। বিষ্ণু দে: 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যের '২৫ শে বৈশাখ' শীর্ষক কবিতা থেকে।

২। বুদ্ধদেব বসু: 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' পৃঃ ২৫।

লীলা।[৩] এতদিন পল্লীই ছিল আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, এখন সে-স্থান গ্রহণ করল শহর। স্বভাবতঃই কাব্যের অঙ্গন থেকে পল্লীর বিদায়ের করুণ সুর বেজে উঠল। কবিতার এ ক্ষেত্রবদলের সাথে সাথে তার বেশভুষা, হাবভাবেও দেখা দিল বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙলা কাব্য দেশের জনচিত্ত থেকে ক্রমশঃই দূরে সরে যেতে লাগল। কবিতা গ্রাম্যবধূর লাজমধুর 'হাস্য-বিনম্র' সরল স্বভাব-সুন্দর রূপ পরিহার করে লাস্যময়ী নগর নটিনীর নয়ন ধাঁধানো রূপে দেখা ছিল। সে আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়াল একটা প্রহেলিকা।

বাঙলা কাব্যের প্রকৃতি যখন এমনি করে পাল্‌টে যাচ্ছিল, বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা যখন পাঠক-চিত্তে আবেদন সৃষ্টির সেই স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্‌ছিল, সেই সময় তাকে সমে ফিরিয়ে আনবার সাধনায় ব্রতী হলেন জসীম উদ্‌দীন। তিনি যুগ ও জীবনের সকল ঘাত-প্রতিঘাত এঁড়িয়ে, সকল জটিলতা পরিহার ক'রে বাঙলা কাব্যের পুরনো ঐতিহ্যভিত্তিক ধারায় কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। পুরাতন পল্লীগীতি ও গাথার রাজ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, পল্লীর অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ, সাদামাটা জীবনের অপূর্ব মাধুর্যকেই তিনি কাব্যমহিমা দান করে বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করলেন। পল্লীর প্রতি একটা মমত্বময় আকর্ষণ রবীন্দ্রানুসারী অনেক কবির মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও, তাঁরা পল্লীকে দেখেছেন নগরের বাতায়ন পথেই। রোমান্টিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে তাঁরা পল্লীর একটা মোহময় রূপের ছবি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন, তা ঠিক। কিন্তু সে ছবি কখনই আত্মার যোগে খুব সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি! এখানেই অন্য কবিদের উপর জসীমউদ্‌দীনের জিত! জসীমউদ্‌দীন পল্লীকে দেখেছেন পল্লীপথের পাশেই দাঁড়িয়ে প্রেমিকের মুগ্ধদৃষ্টি দিয়ে ও অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে। পল্লীও তাই যেন তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে আপন

৩। বুদ্ধদেব বসু: 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি,' পৃঃ ২৭।

সহজ, নিরাভরণ রূপ নিয়ে, অনাবৃত করে দিয়েছে তার সকল হৃদয়-ঐশ্বর্য। ভাষায় ভাবে জসীম উদ্‌দীনের কবিতা পল্লীর অনাড়ম্বর সৌন্দর্যেরই যেন প্রতিচ্ছবি। আধুনিক কাব্যের সমস্ত জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও কৃত্রিমতা থেকে তা আশ্চর্যরূপে মুক্ত! উপরন্তু এমন একটা সহজতা, এমন একটা আন্তরিকতার স্পর্শ রয়েছে তাঁর কাব্যে যা অতি স্বাভাবিক-ভাবেই জনচিত্ত আকর্ষণ করে। জীবনের সাথে স্বাভাবিক যোগে বিধৃত বলেই জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের আবেদন এত বেশী—নাই বা রইল তাতে প্রসাধন পারিপাট্য, ভাষার কারুকলা, নভোস্পর্শী কল্পনার ঐশ্বর্য। জসীম উদ্‌দীনের লোক-প্রিয়তার রহস্য এখানেই নিহিত।

জসীম উদ্‌দীনের 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ' কাব্যটির মাধুর্য-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি আমাদের এ-ধারণাকেই পুষ্ট করে। তিনি বলেছিলেনঃ "নক্‌সীকাঁথার মাঠ" কাব্যখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ যেন সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়া পাইলাম—সেই পল্লীর পথঘাট—এ যেন কত চেনা—হৃদয়ের দরদ দিয়া আঁকা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দু'টি ডাগর চোখ, পল্লীরাখালের চোখ জুড়ানো কালোরূপ, মুসলমান লেঠেলদের মারামারি—বাঙালীর বিবাহ-বাসর, গিন্নীর ঘরকন্না এই সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল। এই পল্লীদৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ছিল—এখনও হয়ত কিছু কিছু আছে; কিন্তু এ-সকল হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হারানো জিনিস নূতন করিয়া পাওয়ার যে আনন্দ, কবি জসীম উদ্‌দীন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন।"[৪] আমার ধারণা, আধুনিক যুগে বাঙলা কাব্যে পল্লীর এই পুনঃপ্রতিষ্ঠাই জসীম উদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ অবদান। দীনেশচন্দ্রের ভাষায় তিনি "দেশের পুরাতন রত্নভাণ্ডারকে নূতনভাবে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনাগত রাজ্যের বার্তা বহিয়া আনিয়াছিলেন।" স্মরণ রাখা উচিত জসীম উদ্‌দীন যখন কাব্যের আসরে নামেন, তখন বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে চল্‌ছিল নাগরিকতারই জয়জয়কার। 'সর্বগ্রাসী শহরের মায়াজাল কাটাইয়া পল্লীর অনাবিল ভাব ও স্ফূর্তি বজায় রাখা শক্ত'

৪। দীনেশচন্দ্র সেন: বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯।

ছিল। জসীম উদ্‌দীন তাঁর কাব্যে তা অনেকটা বজায় রাখতে পেরেছিলেন বলেই অসাধারণ কৃতিত্বের দাবীদার। তিনি আধুনিক কালে কাব্যে উপেক্ষিত পল্লীকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে, পল্লী কবিতার মৃতপ্রায় অথচ আশ্চর্যরূপে জীবন-ঘনিষ্ঠ ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে, প্রাচীন ও নবীন কাব্যধারার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে বাঙলা কাব্যের আত্মিক অপমৃত্যু রোধ করেছেন। কাব্যকে জনচিত্তের ঘনিষ্ঠ করে তুল্‌তে পেরেছেন বলে তিনি দেশবাসীর ভালবাসা পেয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর কাব্যবস্তুর ঘনিষ্ঠ পল্লীনিষ্ঠ রূপের জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই পল্লী কবি আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন।

জসীম উদ্‌দীনের কাব্য তাই অতি আধুনিক কাব্যধারার এক ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। অতি আধুনিক কাব্যের সাথে তাঁর কাবের চারিত্র্য-ধর্মের পার্থক্য এতই বেশী যে এদের মধ্যে কোন সম্পর্কই আবিষ্কার করা শক্ত। তবু জসীম উদ্‌দীনের কাব্য আধুনিক যুগ-চেতনার পরিপন্থী নয়—এটা সমালোচকগণ স্বীকার করেন। এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে নগর-চেতনার নতুন খাতেই আধুনিক কাব্যের মূল ধারাটি প্রবাহিত। গ্রাম্য গীতি-গাথার রসপুষ্ট জসীমউদ্‌দীনের কাব্য কিন্তু সে মূল ধারার সাথেই যুক্ত একটা উপধারা—যত ক্ষীণই হোক সে ধারা, তা ঐতিহ্যের যোগে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত। সমাজ বিবর্তনের যে ধারায় নগর-চেতনা প্রবল হয়ে আধুনিক কাব্যে নিজ প্রতিষ্ঠা কায়েম করেছে, জীবনের সর্বস্তরে তার প্রচণ্ড অভিঘাত-জনিত প্রতিক্রিয়ায় অনেক কবি-সাহিত্যিকের দৃষ্টিই পল্লীর সাদামাটা প্রকৃতি ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, ঐ একই কালে। সমকালীন বাঙলা দেশের ইতিহাসও এ সত্যকে সমর্থন করে। জসীম উদ্‌দীনকে তাই যুগ-বিরোধী বললে ভুল করা হবে। আধুনিকরা যেখানে নতুনত্বের মোহে পুরাতন সব কিছুকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন, জসীম উদ্‌দীন সেখানে পুরানো কাব্যের ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে কাব্যের স্বাভাবিক বিবর্তনে নিজের আস্থা প্রকাশ করেছেন। আধুনিক কবি স্বভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদ্রোহী। গণ্ডী অতিক্রমের নেশায় ও নতুনের অন্বেষায় সে

সদা-চঞ্চল বিক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত। তাঁর কাব্যের গঠনভঙ্গী, ভাব-ভাষা ও জীবন-দৃষ্টির অভিনবত্বে সে-স্বভাবেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রানুসারী কবিরা, বিশেষ করে জসীম উদ্‌দীন, কাব্যক্ষেত্রে—এলিয়ট যাকে বলেছেন ট্র্যাডিশন, বাঙলায় যাকে বলা যায় ঐতিহ্য, তার গণ্ডী ছেড়ে কখনই প্রায় অগ্রসর হননি। "বিশ শতকে বাস করেও বিশ শতকের ইংরেজী কাব্যের আত্মানুসন্ধানের নব নব পরীক্ষায় এঁরা কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নি।......নগর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা ও নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত মানবাত্মার আর্ত ক্রন্দন এঁদের শ্রবণে পোঁছেনি। আসলে এঁরা গ্রাম-জীবনের কবি—গ্রামের মায়া ও মমতা, স্নেহ ও অনুভূতি এঁদের ধরে রেখেছিল।"[৫] তাই বিশ শতকের প্রখর সূর্যালোকে এঁরা 'বৈষ্ণব যুগের ছায়াভরা' পল্লীর স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করতে উৎসাহ বোধ করেছেন। একই যুগে বাস করে, সে-যুগের শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যানধারণার সাথে নিবিড় পরিচয় সত্ত্বেও যে এটা সম্ভব হয়েছে, তার কারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত শিল্প-বিপ্লব আমাদের দেশের পল্লীকে একেবারে কোণঠাসা করতে পারে নি। এবং জাতীয় মানসে তেমন বিপ্লবাত্মক কোন পরিবর্তনও আনতে পারে নি। জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে বাঙলার সে স্বভাবধর্মই জয়ী হয়েছে। তাই তিনি কাব্যে আধুনিকতার প্রবক্তা না হয়েও আধুনিক যুগের কবি।

এমন আপাতবিরোধী অথচ জীবনবাস্তবের ন্যায় রূঢ় সত্যের সংঘটন কেমন করে সম্ভব হল, তা ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ হয়েছে তাই। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "প্রত্যেক সভ্যজাতির মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির দুই ধারা আছে...একটি লৌকিক ও আর একটি শিক্ষাগত। একথা সত্য নহে যে, দুইটি ধারা স্বাধীনভাবে সমান্তরাল হইয়া প্রবাহিত হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা হয়, তাহা ইহার বিপরীত। লৌকিক ও শিক্ষাগত

৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, পৃ: ১০

ধারা দুইটি অনেক সময় পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে আদান-প্রদান চলিত থাকে—folk-lore materials being absorbed by poets and artists।[৬] কিন্তু অধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নাই; কারণ ইহার শিক্ষাগত (literary) ধারাটি এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই যে কেবল উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহার সঙ্গে লৌকিক ধারাটির অনেক বিষয়ে বিরোধও দেখা যায়। সেই জন্য বাংলায় লোক-সাহিত্য ও উচ্চতর সাহিত্যের এত বেশী ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে।'[৭] এ যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, তা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থাকে একটা অবস্থা হিসেবেই মেনে নেওয়া চলে, তাকে কখনই পরিণাম বলে স্বীকার করা যায় না। তাই তো দেখতে পাই এক বা দেড় শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতা লোকসাহিত্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারে নি। তার প্রমাণ বিশ শতকের প্রথম ভাগে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পূর্ব-বাঙলার লোক-সাহিত্যের ব্যাপক অনুসন্ধান। ফলে 'মৈমনসিংহ গীতিকা',-'পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা' ও উত্তর বঙ্গের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', মাণিকচন্দ্র রাজার গান' ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের সম্পদ আমাদের হাতে আসে এবং ঐ সকল সাহিত্য-সম্পদ আমাদের রসচেতনাকে নবীনভাবে জাগ্রত করে তোলে। তাই আধুনিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের দিনেও লক্ষ্য করি কিছুসংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক লোক সাহিত্যের ভাণ্ডারে রসসন্ধানে প্রবৃত্ত। এরূপ মানস-সংঘটনের কারণ সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্য বলেনঃ—'যে জাতি সংহত পল্লীজীবনের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বাস করিয়া একটি সুপরিণত লোক-সংস্কৃতির জন্মদান করিয়াছে, আকস্মিকভাবে তাহাদের উপর এক বৈদেশিক সভ্যতা চাপিয়া বসিলেও, তাহা তাহার অন্তরের গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। সেই জন্য আমরা যতই আধুনিকতার মোহগ্রস্ত হই না কেন,

৬। A. H. Krappe: Standard Dtctionary of Mythology and Folk-lore, C. 404.

৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলার লোকসাহিত্য; সংজ্ঞা ও প্রকৃতি; পৃঃ ২৬।

এখনও আমাদের বিস্মৃতপ্রায় পল্লীর পরিচিত একটি গানের সুর শুনিতে পাইলে মনের মধ্যে যে সাড়া অনুভব করি, তাহার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা মথুরাপুরীতে বাস করিয়াও পরিত্যক্ত পল্লীবৃন্দাবনের জন্য বেদনা অনুভব করিতেছি। সেই বৃন্দাবনের আমাদের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় আছে, ততটুকুই আমাদের সাধনার মধ্যে দিয়া এখনও ফুটাইয়া তুলিতে চাই।'[৮] জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে আমরা যে 'দূরাগত রাখালের বংশীধ্বনি' শুনে মুগ্ধ হয়েছি, তা তাই সাহিত্যে নাগরিকতার এ জয়-জয়কারের দিনেও অস্বাভাবিক বলে বোধ হয় না। কারণ এর সাথে রয়েছে আমাদের নাড়ীর যোগ। আধুনিকতার ধূম্রজালে তা কতকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল মাত্র। জসীম উদ্‌দীন আমাদের সে-আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। সে জন্য আধুনিকতার কাছে তাঁর জবাবদিহির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এ যুগে পল্লীজীবন ও পল্লী-সাহিত্যের ঐতিহ্যাশ্রয়ে কাব্যসাধনা শুধু জসীম উদ্‌দীনই করেন নি, আরও অনেকেই করেছেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রানুসারী কবিরা পল্লীর অনাবিল শান্তি ও স্নেহের রূপ নিয়েই কাব্যকথার জাল বুনেছেন বেশী। তাঁদের এ বিশেষ মানসিক প্রবণতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন: "রবীন্দ্রকাব্যে এঁরা যে শান্তি ও সৌন্দর্যের আশ্বাস পেয়েছিলেন, তা বাস্তবপ্রতিবেশে সমর্থিত হবে না এই আশঙ্কাতেই বোধ করি এঁরা গ্রাম্যজীবনে ফিরে গিয়েছিলেন। নগর-জীবনের ফেনিল মদ্যপানে এঁদের ছিল অনীহা, গ্রাম-লক্ষ্মীর 'প্রসাদলাভে ছিল একান্ত আগ্রহ'।'[৯] 'গ্রামজীবন ও প্রকৃতির প্রতি এঁদের যে আসক্তি ও মমতা' লক্ষিত হয়, তা রোমাঞ্চের রঙ্ মাখানো।' সাধারণভাবে এঁরা সকলেই 'প্রকৃতির রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যানে বিভোর, গ্রাম্যপ্রকৃতির রূপবন্দনায় মুগ্ধ এবং প্রকৃতিতে শান্তির আশ্রয় সন্ধানে নিয়ত তৎপর।' এঁদের চারিত্র্যলক্ষণ হল: আস্তিকতাবোধ, সৃষ্টি ও

৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলার লোক সাহিত্য; সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, পৃ: ২৬

৯। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, পৃ: ১০।

মঙ্গলে গভীর আস্থা, শান্তিতে বিশ্বাস। 'ঐতিহ্যপ্রীতি ও প্রকৃতি-প্রীতি এই কাব্যাদর্শে পৌঁছতে এঁদের সাহায্য করেছে।' পল্লী-জীবনের শান্ত, আপাত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে তাঁরা আশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলেন—নগর-প্রতিবেশে তা সম্ভব ছিল না। একে 'পলায়নী মনোবৃত্তি' বলা হয়ত ঠিক হবে না, যদিও নাগরিক জীবনের অস্থিরতা, সংশয়-বেদনা, ব্যর্থতা, নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে এঁরা সজ্ঞানেই দূরে সরে এসেছিলেন। কারণ এঁরা আর যাই করুন, জীবন থেকে পলায়ন করেছিলেন এমন কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। নাগরিক জীবনের রূঢ়তা ও নির্মমতা থেকে এঁরা পল্লী-জীবনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন মাত্র। আর সে পল্লীজীবন তো তখনও আমাদের জীবনে নাগরিক জীবনের চেয়ে কম সত্য ছিল না। আধুনিক কবিদের সাথে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পার্থক্যের জন্যই এরূপ ঘটেছিল এবং একই কারণে এঁদের কব্যের প্রকাশও বিভিন্ন হয়েছে! তাই আধুনিক কাব্য যেখানে নাগরিক জটিল জীবন-জিজ্ঞাসায় বুদ্ধি-দীপ্ত, মনের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, প্রকাশ কলায় অতিমাত্রায় প্রসাধনাশ্রয়ী ; এঁদের কাব্য সেখানে শ্যামলপল্লী-প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত, জীবন-জিজ্ঞাসার জটিলতার পরিবর্তে অনুভূতির স্বচ্ছ প্রকাশে আশ্চর্যরূপে হৃদয়হারী। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই কবি কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টো-পাধ্যায়, কাদের নেওয়াজ, বন্দে আলী মিঞা প্রভৃতির নাম মনে আসে। এঁরা সবাই কমবেশী রবীন্দ্রপরিমণ্ডলে লালিত ও বর্ধিত। তাই এঁদের কাব্যবস্তু পল্লী থেকে সংগৃহীত হলেও, ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে এঁরা আধুনিকতারই নিকটবর্তী। কাব্যের উপাদান খুঁজতে গিয়ে এঁরা পুরনো ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হলেও, প্রকাশকলায় পুরাতনকে তেমন আমল দেন নি। এ-বিষয়ে এঁরা নতুন ও পুরাতনের কতকটা সন্ধিবন্ধন করেছিলেন মাত্র ; কিন্তু দুইয়ের সমাঞ্জস্যবিধানে খুব সার্থক হতে পারেননি।

জসীম উদ্‌দীন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে রবীন্দ্রানুসারীদের সগোত্র হ'লেও নানা দিক দিয়ে বিশিষ্টতার দাবী রাখেন। প্রথমত, জসীম উদ্‌দীন পল্লী-

সাহিত্যের যারস্থ হয়েছিলেন আন্তর-প্রেরণায়, স্বভাবের তাগিদে—কোন বিশেষ মানস-প্রতিক্রিয়ায় নয়। পল্লী তাই তাঁর কাছে শান্তি ও সৌন্দর্যের আশ্বাস মাত্র নয়, একান্ত সহজ স্বাভাবিক প্রতিবেশ। এ পরিবেশেই তিনি লালিত, পালিত, বর্ধিত। তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বটিকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে পল্লীর উদার শ্যামল রূপ—পল্লী যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। তাঁর সকল ধ্যান-চিন্তাকে জুড়ে রয়েছে পল্লীর স্নিগ্ধ নিরাবরণ নিরাভরণ রূপ, এর স্নেহ ও মমত্বময় পরিবেশ, এর নরনারীর 'প্রতি দিবসের আর প্রতি রজনীর তপ্ত প্রেম-তৃষা', সুঃখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা। গ্রাম-লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি। পল্লী নিজেই যেন এসে ধরা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। কোন আদর্শ, কোন বিশেষ দার্শনিক সত্যের মুখোস এঁটে নয়, অকৃত্রিক জীবনের প্রতিরূপ হয়েই ধরা দিয়েছে। রোমান্সের স্পর্শ সে-চিত্রে থাকলেও, তা কাব্য-মাধুর্য বাড়াতেই সাহায্য করেছে, পল্লীর যথার্থ রূপকে আচ্ছন্ন করে নি। দ্বিতীয়ত, জসীমদ্‌দীনের কাব্যের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী তাঁর একান্ত নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "জসীম উদ্‌দীনের কবিতার ভাব, ভাষা, ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের।··· অতি সহজে যাদের লিখবার ক্ষমতা নেই এমনতর খাটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।" বাস্তবিকপক্ষে আজ পর্যন্ত এমন চিত্তগ্রাহী, শ্রুতিবিনোদন মেঠো সুরের কবিতা অন্য কোন কবি রচনা করতে পারেন নি। কাব্যের যে নতুন পরিমণ্ডল তিনি গড়ে তুলেছেন, তার উপযোগী diction (কবি ভাষা) সৃষ্টিতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য-বস্তুর ন্যায় কাব্যের ভাষা গঠনেও তিনি পল্লীকাব্যের রত্নভাণ্ডার থেকে শব্দ, উপমা যথেষ্ট গ্রহণ করেছেন এবং অসাধারণ কলাকৌশল প্রয়োগে আধুনিক কাব্যের অপেক্ষাকৃত মার্জিত ও পরিশীলিত ভাষারূপের দেহে তাকে এমন করে মিশিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর কাব্য ভাষার এক নক্‌সীকাঁথায়ই যেন পরিণত হয়েছে। তাতে নানা বর্ণের সমাবেশ ঘটেছে অথচ কোথাও তেমন অসঙ্গতি দেখা দেয়নি। এখানেই গেঁয়ো কবি' ও 'নাগরিক কবি'—দুই থেকেই তিনি পৃথক হয়ে আছেন, অথচ উভয়ের যা গুণ তা তিনি

প্রায় সমপরিমাণেই আয়ত্ত করেছেন। পল্লীকাব্যের সরলতা ও আন্ত-রিকতা এবং নাগরিক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এ-দুইয়ের পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে। এখানে তিনি একক, অনন্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। এই বিশেষ দিকে রবীন্দ্রানুসারী কবিদের থেকে তিনি অনেক বেশী সাফল্যের অধিকারী। পল্লী নিয়ে কবিতা লেখাই বড় কথা নয়। পল্লী প্রকৃতির সাথে পরি-পূর্ণ সামঞ্জস্যে বিধৃত প্রকাশের কাব্যিক ভাষা সৃষ্টি করা তার চেয়ে অনেক শক্ত কাজ। এ দিকে জসীম উদ্‌দীনের সাফল্য আজও কোন কবির অনায়ত্ত। তৃতীয়ত, ঐতিহ্যভিত্তিক কাব্য-সাধনায় সার্থকতার জন্যে যে ব্যাপক জ্ঞান ও জীবনাভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তা জসীম উদ্‌দীনের অনেকের চেয়েই বেশী ছিল। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল, বৈষ্ণব কাব্য থেকে শুরু করে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' এবং, বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত অজস্র বৈচিত্র্যপূর্ণ পল্লীগীতির বিশাল ভাণ্ডারের সাথে তাঁর যে ব্যাপক ও গভীর পরিচয় ছিল এমনটি সমকালীন আর কোন কবির ছিল কিনা সন্দেহ। বহুকাল পল্লী-গীতি, গাথার সংগ্রাহকরূপে তিনি বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেই সূত্রে একদিকে তিনি লোক-সাহিত্যের ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, অপরদিকে অসংখ্য পল্লী নরনারীর জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে তিনি তাদের জীবন ও চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন। পল্লী নিয়ে কবিতা লিখেছেন হয়ত অনেকেই, কিন্তু জসীম উদ্‌দীনের ন্যায় ব্যাপক ও গভীর মানসিক প্রস্তুতি কারও ছিল না। তাই দেখতে পাই ভাব, ভাষা ও আবহ সৃষ্টিতে পল্লীকাব্যের ক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীনের সার্থকতা সর্বাধিক। সবচেয়ে বড় কথা কোন যুগ-সমস্যার কথা উল্লেখমাত্র না করে, [এ ক্ষেত্রে 'মাটির কান্না' কাব্যটি অবশ্যই ব্যতিক্রম] কোন 'ইজমের' দোহাই না দিয়ে তিনি দেশের 'গণমানসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে' কাব্যে অনেকটা রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। শত দুঃখ-দৈন্য, আঘাত-বেদনা, দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাত, লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখে দাঁড়িয়েও এ শক্তি পরাভব মানে না। ঘরে ঘরে স্নেহ-প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে সে

জীবনকে ভরস দেয়, কষ্টে অধীর হলেও জীবনকে অস্বীকারের প্রয়াস পায় না, হাসিমুখে দুঃখ বেদনাকে সহ্য করার অঙ্গীকার করে। মোট কথা জীবনের প্রতি শ্রদ্ধায় জসীম উদ্‌দীনের কাব্য ভাস্বর! এর চেয়ে বড় সার্থকতা কি হ'তে পারে?

পল্লীজীবন ও ঐতিহ্য নিয়ে কাব্য রচনায় সার্থকতার আর একজন দাবীদার রাঢ়ের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কুমুদরঞ্জনের মত পল্লী-প্রাণ কবি বিরল। তাঁর এই পল্লীপ্রীতি সাধারণ পল্লী-অনুরাগ নয়, এ তাঁর নিজ গ্রাম কোগাঁ'র প্রতি 'জননীবোধে ভক্তি। এর সাথে একটি সহজ বৈষ্ণব ভক্তিভাবের সুর বিজড়িত রয়েছে। কুমুদরঞ্জন শুধু পল্লীপ্রিয় নন, পল্লীনিষ্ঠ। তিনি মেঠো সুরে পল্লী মানুষের—চাষী, জেলে, জোলা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-ছোঁয়া জীবনের গান গেয়েছেন। 'আমার এ বাঁশের বাঁশী মাঠের সুরে আমার সাধন'—রবীন্দ্রনাথের এ কাব্যিক উক্তিটি, কুমুদরঞ্জনের কবিতার পক্ষে সত্য। রাঢ়ের, বিশেষত অজয় তীরের, পল্লী-প্রকৃতি তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মনে রাখা উচিত পল্লী কুমুদরঞ্জনের কাব্যের খুব বড় একটা অংশ জুড়ে থাক্‌লেও, তাঁর কাব্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। স্বদেশানুরাগ, ইতিহাস, পুরাণ প্রীতি তাঁর কাব্যে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই কুমুদরঞ্জনের কাব্যবস্তুর কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই কুমুদরঞ্জনের সাথে জসীম উদ্‌দীনের তুলনার কথা মনে উদিত হয়। কুমুদরঞ্জনের কাব্যিক সার্থকতা জসীম উদ্‌দীনের চেয়ে হয়ত কম নয়, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয়, বৃহত্তর বঙ্গ-প্রকৃতির বিচিত্রতর জনজীবনের উদার প্রকাশ জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে যতটা হয়েছে, কুমুদরঞ্জনের কাব্যে ততটা হয় নি। কুমুদরঞ্জনের কাব্যের পরিধি সংকীর্ণ, তার প্রকাশও তেমন মাধুর্যমণ্ডিত নয়। রাঢ়ের প্রকৃতির রুক্ষতা তাঁর কাব্যদেহেও যেন অনেকটা সংক্রমিত হয়েছে। কবিসমালোচক কালিদাস রায় জসীম উদ্‌দীনের 'রাখালী' কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে কুমুদ-রঞ্জন ও জসীম উদ্‌দীন সম্পর্কে যা বলেছেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেন: "বঙ্গ সাহিত্যে pastoral songs লেখার জন্য কবি

কুমুদদঞ্জনের খ্যাতি আছে। কবি কুমুদরঞ্জন রাঢ় দেশের লোক। রাঢ় দেশের রীতি-প্রকৃতি ও পল্লীজীবনটি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বেশ ফুটিয়াছে। জসীমউদ্‌দীনও pastoral poems লিখিয়াছেন—রাখালিয়া সুরে।... জসীম উদ্‌দীন যে দেশের পল্লী-প্রকৃতির আবহাওয়ায় ও সমাজে বাল্য-কৈশোর যাপন করিয়াছেন, সে দেশ ভৌগোলিক হিসাবে বাংলাদেশ হইলেও রাঢ় দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দেবমাতৃক রাঢ় দেশের নরনারীর জীবন ও প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য নদীমাতৃক পূর্ব-বঙ্গ হইতে রীতিমত বিভিন্ন। জসীম উদ্‌দীনের রাখালিয়া গান পূর্ববঙ্গের নদীর চড়া হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাই ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের অভিনব সম্পদ।

"তারপর কুমুদরঞ্জন বঙ্গের পল্লী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন হিন্দুর চোখে। শ্রীমান জসীম উদ্‌দীন তাহাকে বাঙ্গালীর চোখে দেখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন। সে হিসাবেও কবিতাগুলির অভিনবত্ব আছে।"[১০] ভাষাভঙ্গীতেও জসীম উদ্‌দীনের কাব্য সার্থকতর; কারণ তাঁর কবিতার ভাষা তাঁর আখ্যানবস্তু ও আবহাওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। সামগ্রিকভাবে পল্লী প্রকৃতির উদার রূপটি তাঁর কাব্যে যেমন স্বচ্ছভাবে ধরা দিয়েছে, তেমনটি আর কারও কাব্যে হয় নি।

জসীম উদ্‌দীনের আর এক পূর্বসূরী ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসও পল্লী-প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ ছিলেন। তা'হলেও তাঁর কাব্যে পল্লী পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করে নি। তাছাড়া গোবিন্দচন্দ্রের মানসিকতাও ঠিক পল্লীমুখীন ছিল না। গোবিন্দচন্দ্রের রচনায় বাসনা-আবিল কবিচিত্তেরই সুতীব্র দাহ যেন পরিস্ফুট। ভাবানুভূতির তীব্রতা তাঁর কাব্যের প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশসূত্রে পল্লী-প্রকৃতির উপস্থিতি তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ হলেও, তিনি মূলত আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিদের সুতীব্র হৃদয়াবেগের অধিকারী ছিলেন। আপন হৃদয়ের দুঃখ-বেদনা বিরাগ ইত্যাদির প্রকাশেই যেন তিনি বেশী মনোযোগী। যতীন্দ্রমোহন

১০। কালিদাস রায়: সম্মেলনী, ১লা পৌষ, ১৩৩৬।

বাগ্‌চী ও কালিদাস রায় রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এঁরা উভয়েই পল্লীজীবনের মাধুর্য সম্পর্কে বেশ অবহিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে 'যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী মশাই জীবনের বৃহত্তর দিক নিয়ে বড় বড় কথা বলে যাননি বটে, কিন্তু পল্লীজীবনের স্নিগ্ধতার সকল দিকগুলিই অপূর্ব আবেগ ও মমতায় উদ্ভাসিত করে গেছেন।'[১১] যতীন্দ্র-মোহনের 'কাজ্‌লাদিদি' ও 'অন্ধবধূ'র মত কবিতা এই দিক দিয়ে দুর্লভ সার্থকতার দাবীদার। কালিদাস রায়ের রচনায়ও প্রগাঢ় পল্লীপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। এ দের কারও রচনায় অর্থ ও ভাবের জটিলতা নেই। তবে কালিদাস রায়ের কাব্যে রোমান্টিক রঙ বেশ জোরালো। কালিদাস রায়ের 'কৃষাণীর ব্যথা', 'পল্লীর ঘাটে' (পর্ণপুট) ইত্যাদি·কবিতার সরলতা ও সহৃদয়তা উপভোগ্য। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পল্লীব্যথা' (১৯২০) নামক কাব্যের বাণীভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। তিনি পল্লীকাব্যের বিশেষ মেজাজটি সম্পর্কে তেমন মনোযোগী ছিলেন বলে মনে হয় না। বন্দে আলী মিয়া অন্যত্র রবীন্দ্রানুসারী হলেও পল্লীকাব্যের ক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীনের সহযাত্রী। তাঁর 'ময়নামতীর চর' রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টিআকর্ষণ করেছিল। 'মরাল' কাব্য রচয়িতা কাদের নওয়াজও পল্লী-বষয়ক কিছু কবিতা লিখেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে আধুনিক সাহিত্যে নাগরিকতার প্রবল প্রভাবের দিনেও স্বাভাবিক পল্লী প্রীতি বশেই অনেকে কাব্যের রাজ্যে পল্লীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। কমবেশী সার্থক কিছু কাব্যও রচনা করেছেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে রাঢ়ের কবি কুমুদরঞ্জন ও যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী এবং পূর্ব বাংলার কবি জসীম উদ্‌দীনই সমধিক সার্থকতার অধিকারী। সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের বিচারে যেমনই হোক পল্লীজীবন ও প্রকৃতির যথার্থ কাব্যিক মর্যাদাদানে জসীম উদ্‌দীন অনেক বেশী নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পল্লী-বিষয়ক রচনা কি ভাষায়, কি প্রকাশকলায়, কি বিষয় বৈচিত্র্যে, কি বাস্তবনিষ্ঠায় নিঃসংশয়ে অধিকতর কাব্যমূল্য বহন করে।

১১। শুদ্ধসত্ত্ব বসু: আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি পৃঃ ৮-৯।

পল্লীজীবন ও প্রকৃতিকে উপজীব্য করে লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের যোগে যে নতুন কাব্যধারার স্বষ্টি করলেন জসীম উদ্‌দীন, আপাতদৃষ্টিতে তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলে মনে না হলেও, তিনি যে আধুনিক বাঙলা কাব্যে পল্লীজীবন ও প্রকৃতির জন্য একটা সম্মানের আসন আদায় করে একটা মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, তা শিল্প রসিকমাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাই তো দেখি তাঁর কাব্যের মহত্বের স্বীকৃতির দাবী জানিয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের মত মনীষী সেদিন লেখনী ধারণ করেছিলেন। 'কল্লোলের' পৃষ্ঠায় 'কবর' কবিতা প্রকাশের পর তিনি 'ফরোয়ার্ড' নামক সাময়িকপত্রের এক বিশেষ সংখ্যায় 'An Young Mahommedan Poet' নাম দিয়ে বেশ বড় প্রবন্ধ লিখে মুসলমানদের মধ্যে নজরুল ইসলামের পরেই জসীম উদ্‌দীনের স্থান নির্দেশ করেছিলেন। তারপর তিনি কবিতাটিকে ম্যাট্রিক ক্লাশে পাঠ্য করে দিয়ে কবিকে অসাধারণ সম্মান দান করেন।

'নক্‌সীকাঁথার মাঠ' কাব্য প্রকাশের পর তিনি 'বিচিত্রা'য় আট-নয় পৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রবন্ধে কাব্যটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দীনেশচন্দ্র এমনিভাবে তরুণ কবি জসীম উদ্‌দীনকে লোক-চক্ষুর সামনে তুলে ধরেছিলেন। ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তরুণ কবি দেশবাসীর সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কোন মুসলমান কবির ভাগ্যে এরূপ সাদর অভ্যর্থনা বহুদিন জোটেনি। এ-সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন ঃ…"নজরুল ইস্‌লামই হচ্ছেন এ-যুগের প্রথম বাঙালী মুসলমান যিনি সমস্ত দেশের সম্ভ্রম ও সমাদর লাভ করলেন।…তাঁরপর সমস্ত দেশের সমাদর লাভ করেছেন মুসলমান পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন[১২] ওদুদ সাহেবের মতে এই দুই কবিই একালের মুসলমানের মনে তার সাহিত্যিক সার্থকতা সম্পর্কে আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দু'জনেই রবীন্দ্রযুগে সম্পূর্ণ নতুন কাব্যচেতনার পোষকতা করে বাঙলা কাব্যের আসরে

১২। কাজী আবদুল ওদুদ : শাশ্বত বঙ্গ, পৃঃ ৭৬।

অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁদের কাব্যচেতনার উৎস, অভিনবত্ব এবং প্রতিভার শক্তি-সীমা সম্পর্কে হুমায়ুন কবীর যা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি নজরুল ইসলাম ও জসীম উদ্দীন উভয়েরই প্রতিশ্রুতির মূলে লক্ষ্য করেছেন ইসলামের বিপ্লবী সাম্যবাদজনিত মুসলিম সামাজিক জীবনের আশ্চর্য ঐক্য। অধ্যাপক কবীর বলেনঃ 'সমাজ জীবনের এই ঐকে নজরুল ইস্‌লামের প্রতিশ্রুতির মূল প্রতিষ্ঠিত-এবং সেই জন্যেই দেখি যে নিপীড়িত জনমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার সাধনা তাঁর রচনায় সবল কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল। ঐতিহ্যের লঙ্ঘন তিনি করেননি— পুঁথি সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সহজ আত্মীয়তা। ভাষা ও ভঙ্গীতে নজরুল ইস্‌লামের কাব্যে যে বিপ্লবধর্ম, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে। দেশের গণমানসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাব্যে যতটুকু রূপান্তর করতে পেরেছেন, জসীম উদ্দীনের কাব্যসাধনার ঠিক ততখানি সিদ্ধি। উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চাদমুখী বলে সে শক্তি কল্পনা ও আবেগের নতুন নতুন রাজ্য জয়ে অগ্রসর হতে পারে নি। মানসসংগঠনের রূপান্তর হয় নি বলে দু'জনের বেলায়ই সৃজনী প্রতিভা অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে এল। আজ আত্মকেন্দ্রিক পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তাঁদের সাধনা সীমাবদ্ধ।[১৩]

অধ্যাপক কবীরের বক্তব্য থেকে নজরুল ও জসীম উদ্দীনের কাব্য-সাধনা সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, উভয়ে কমবেশী পুঁথি-সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বলে বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের রয়েছে সহজ আত্মিক যোগ। তাই নিপীড়িত জনমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্য, নজরুল যেখানে প্রচারে উচ্চকণ্ঠ, জসীম উদ্দীন সেখানে ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত। নজরুল নিপীড়িতের মর্মবেদনাকে ভাষা দিয়েছেন, সুর দিয়েছেন, জসীম উদ্দীন তাঁদেরই বাস্তব দুঃখবেদনা, প্রেমানুভূতির ব্যর্থতার চিত্র এঁকেছেন. সমালোচকের

১৩। হুমায়ুন কবির : বাঙ্‌লার কাব্য, পৃঃ ৯১।

ভাষায় "নজরুল ইসলামের পর জসীম উদ্‌দীনের আবির্ভাব যেন গায়কের পর চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব।"[১৪] দুই, উভয়ের রচনাতেই পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই অর্থে উভয়েই পশ্চাদ্‌মুখী। দেশের গণমানসের সাথে তাঁদের যোগ ঐ পুরাতন ঐতিহ্যের সূত্রে। দুইজনের কাব্যিক সার্থকতাই সীমাবদ্ধ। কারণ তাঁরা কল্পনা ও আবেগের নতুন নতুন ক্ষেত্র জয় করে অগ্রসর হতে পারেন নি। মানস-সংগঠনের বিশেষ কোন রূপান্তর না ঘটায় দুইজনের সৃজনী প্রতিভা অল্পদিনেই নিঃশেষিত হয়েছে ও পুনরাবৃত্তির একঘেঁয়েমিতে পর্যবসিত হয়েছে।

সাধারণভাবে নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে এ বক্তব্য গ্রহণ-যোগ্য হলেও, উভয়ের জীবনদৃষ্টি ও কাব্যসাধনার ধারায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পুরাতন ঐতিহ্যে-লালিত হলেও নজরুলের দৃষ্টি বর্তমানে প্রসারিত ছিল, তাঁর মন ছিল তীক্ষ্নরূপে দেশ, কাল ও সমাজ-সচেতন। রোমান্টিক কবির অতীত-প্রীতি, সৌন্দর্যানুভূতির তীব্রতা ও প্রেম-ব্যাকুলতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন যুগধর্মী। এটা সত্যি কথা যে তাঁর কাব্যে আবেগের মাত্রা-ধিক্য মাঝে মাঝে অতি পীড়াদায়ক। বাঙলা কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গীতে যে বিপ্লব তিনি এনেছিলেন, তা পরবর্তীদেরও অনেকটা প্রভাবান্বিত করেছে। পুরাতন ঐতিহ্যে লালিত হলেও কাব্যের ভাববস্তু গ্রহণে ও দেহনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কনিষ্ঠ সমসাময়িক সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অতি আধুনিক কবিরা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অসাধারণ মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেও, নজরুলের সমাজ-সচেতন মনোভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। মোটকথা নজরুলের মানস-সংগঠনে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা অনেকটা অতীতমুখী হলেও যুগচেতনা বিরহিত নয়। সামাজিক মানুষ হিসেবে আধুনিক জীবনের জটিলতার প্রভাব তিনি অনুভব করেছেন, আর তাতে নানাভাবেই সাড়াও দিয়েছেন। তবে পুরাতন ঐতিহ্যবোধের সাথে আধুনিক জীবন ও চিন্তার

১৪। সঞ্জয় ভট্টাচার্য: আধুনিক কবিতার ভূমিকা, পৃ: ২৪।

পূর্ণসঙ্গতি বিধান করতে তিনি পারেন নি; আর তা পারা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তাঁর স্বভাব ও তাঁর কাল এর বিরোধী ছিল। নজরুল কাব্যে যে অস্থিরতা, যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় তা দুই বিরোধী মনোভাবেরই টানাপোড়নের ফল। জসীম উদ্‌দীনের জীবন ও কাব্য এ-জটিলতা থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত। আধুনিক জীবনের জটিলতা তাঁকে যেন স্পর্শ'ই করে নি। পল্লীগীতি-গাথা ও পুঁথি-সাহিত্যের পুরাতন ঐতিহ্য তাঁর কবি-সত্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে তিনি সারা জীবনেও তা থেকে সামান্য দূরে সরে আসতে পারেন নি। ['মাটির কান্না'য় সে চেষ্টা দেখা গেলেও, তা জয়যুক্ত হয় নি]। অবশ্য বাঙলাদেশের গ্রামভিত্তিক জীবন আজও জীবনের যোগে লোক-সাহিত্যসম্পদকে সরস করে রেখেছে বলে, জসীম-উদ্‌দীনের কাব্য জীবনের সাথে বিচ্ছিন্ন-যোগ হয় নি কখনও। তথাপি লক্ষ্য করার বিষয় জসীম উদ্‌দীন কি জীবনাচরণে, কি কাব্যের বিষয় ও ভাষায় আধুনিকতাকে অনেকটাই এড়িয়ে গিয়েছেন। জসীম উদ্‌দীনের সমাজ-চেতনা নজরুলের মত অনুভূতির তীব্রতায় প্রকাশ পায় নি। আধুনিক জীবনের জটিলতা সম্পর্কে কেমন একটা নির্লিপ্ততার ভাব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। জসীম উদ্‌দীন পল্লীকাব্যের পুরাতন খাতেই সারা জীবন লেখনী চালনা করেছেন, তা থেকে সরে এসে আধুনিক কাব্যের সাথে যোগ স্থাপনের কোন জোর তাগিদ অনুভব করেন নি। মাঝে মাঝে আধুনিক জীবনভাবনা ও যুগজিজ্ঞাসার প্রভাবে নতুন বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি ভাষা ও ভঙ্গীতে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে খাত পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব। জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের ভাষায় আধুনিক কবির ন্যায় হয়ত কিছুটা পরিমার্জন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা পল্লীর আবহ ফুটিয়ে তুলতেই বিশেষরূপে সার্থক; আধুনিক জীবনের জটিলতা প্রকাশের পক্ষে এ ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অথচ এ চেতনা জসীম উদ্‌দীনের ছিল বলে কোন প্রমাণ আমরা পাই না। মোট কথা অতীতচারী রোমান্টিক মনোভঙ্গীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নজরুল ছিলেন যুগধর্মী—তাঁর কাব্যের বক্তব্যে ও ভঙ্গীতে তা অনেকটা প্রকাশিত। জসীম উদ্‌দীন মূলত পশ্চাদ্‌মুখীই রয়ে গিয়েছেন—তাঁর

কাব্যের বক্তব্য ও ভঙ্গীতে তা পরিস্ফুট। অবশ্য পরিণত বয়সে জসীম উদ্‌দীন তাঁর কিছু কিছু কবিতায় যুগোচিত ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের ভাব ও ভাষায় রবীন্দ্র-নজরুলের ভাব ও ভাষাভঙ্গীর অনুসৃতি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। তবু উপযুক্ত শিল্পচেতনা দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায়, তিনি ঐ ক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

জসীম উদ্‌দীন আধুনিক যুগের কবি হলেও তাঁর কাব্যে আধুনিকতার মূলধর্মের তেমন স্বীকৃতি নেই। আধুনিক কাব্য মন-মেজাজে ও রূপে সর্বতোভাবে নগরমুখীন; জসীম উদ্‌দীনের কাব্য মূলত পল্লীকেন্দ্রিক। "গ্রাম্যজীবন ও গ্রাম্য পরিবেশ তাঁর কাব্যের উপাদান যুগিয়েছে এবং তাঁর কবিতার কলাকৌশলের মধ্যে গ্রাম্য আবহকে আমরা মূর্ত হতে দেখি।"[১৫] কাব্যের ভাষায় কথঞ্চিৎ পরিমার্জন ব্যতীত আধুনিকতার মর্জির বিশেষ স্বীকৃতি নেই তাঁর কাব্যে। এদিক থেকে বিচার করলে জসীম উদ্‌দীন আধুনিক কাব্যধারা থেকে মূলত বিচ্ছিন্ন এক স্বতন্ত্র কাব্যধারার কবি। সমালোচকদের মতে তাঁর কাব্যকলার যদি কোন উৎস খুঁজে পেতে হয় তা হলে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল, ময়মনসিংহ গীতিকা ও অজস্র পল্লীগীতি-গাথার দিকে। সমকালীন কাব্যে তার সমর্থন তেমন মিলে না। সারাজীবন তিনি পল্লীসাহিত্যের অবহেলিত পথেই পরিভ্রমণ করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে একই কথা, একই ভাব, একই সুরের পুনরাবৃত্তি দুর্লক্ষ্য নয়। পল্লী নিয়ে যখন তিনি কথা বলেন তখন তিনি স্বাভাবিক, আর যেই সে গণ্ডী অতিক্রমের চেষ্টা করেন, অমনি তিনি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েন। তাঁর 'বালুচর', 'রূপবতী' ইত্যাদি কাব্যের প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনামূলক অনেক কবিতা ও 'মাটির কান্না' কাব্যের কথা এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে। 'মাটির কান্না' কাব্যটিতে জসীম উদ্‌দীন কিছুটা নতুন সুরের আলাপ করতে চেষ্টা করেও বিশেষ সফলকাম হতে পারেন নি। জনৈক সমালোচক এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন, 'যদিও এ কাব্য গ্রন্থের কোন কোন পঙক্তি বা উপমায় জসীম উদ্‌দীনের কবিত্বশক্তি বিদ্যুতের মত ঝিকিয়ে ওঠে,

১৫। মোহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২৪।

তবু বলবো, তিনি ক্রমেই তাঁর কাব্যের প্রসাদগুণ হারিয়ে ফেলছেন। আধুনিক হয়ে ওঠার ঘর্মাক্ত চেষ্টায় তাঁর বর্তমান কবিতাগুলি ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত। তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চাচ্ছেন দেখে আহত হয়েছেন তাঁর ভক্ত পাঠকগোষ্ঠী। তিনি যখন শাপলা লতা, বিলের কাজলা জল, নিঝুম রাতের বাঁশির সুর, ধান কাউনের অর্থই রঙের মেলা, রঙিলা নায়ের মাঝি, বাউ কুড়ানী আর উড়ানীর চর নিয়ে কবিতা লেখেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিতার এ পরিমণ্ডলেই তিনি সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন।[১৬] মোটকথা সারাজীবনেও তাঁর মানস-সংগঠনের বিশেষ রূপান্তর ঘটে নি। তাই কবিত্বের ঐ বিশেষ পরিমণ্ডল ছাড়া তিনি অন্যত্র বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি।

জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের শ্রী, ছাঁদ ও মর্জি একান্তভাবেই পল্লীর। 'কিন্তু তাই বলে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে গ্রাম্য কবি নন। তার কারণ উপমা-রূপক প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন এবং কাব্যকাহিনী নির্মাণে উপন্যাসের গঠন প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন।[১৭] তা' ছাড়া একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় পল্লীগাথা ও গীতিকায় পল্লী কবিরা পল্লীকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, জসীমউদ্‌দীন ঠিক তাই করেন নি। অজ্ঞাত, অখ্যাত, নিরক্ষর পল্লীকবিদের কাব্য রচনায় কখনই সচেতন শিল্প-প্রয়াস দেখা যায় না। তাই তার বেশভূষায় থেকে যায় প্রচুর অসঙ্গতি। জসীম উদ্‌দীন আধুনিক কালের উচ্চশিক্ষিত নিষ্ঠাবান কবি-শিল্পী; তাঁর রচনায় স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা সচেতন শিল্প-প্রয়াস লক্ষিত হয়। ফলে পল্লীকাব্য তাঁর হাতে অনেক বেশী শ্রী-সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে সাধারণ পল্লীকবির রচনা থেকে অনেকটা আলাদা সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কাব্যের পল্লী শিল্পীর চোখে দেখা পল্লী—তাঁর মনের বিস্তৃত ক্যানভাসে তা রংয়ে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

১৬। কবি শামসুর রাহমান।

১৭। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২৪।

এখানে জসীম উদ্‌দীনের মনোভঙ্গীর আধুনিকতা স্পষ্ট। তথাপি পল্লী নিয়ে কাব্য লিখ্‌তে গিয়ে জসীম উদ্‌দীন তেমন কোন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন নি। তার কারণ, বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত মানুষের প্রথম সচেতন প্রতিক্রিয়ার কালে জসীম উদ্‌দীনের কাব্য-রচনা শুরু হয়েছিল বলে তাঁর কাব্য একটা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিল। আর তা' ছাড়া পল্লী তখনও দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনের কর্ম ও চিন্তায় একটা নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করত।

আজ অবস্থা পাল্‌টে গিয়েছে—যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমপ্রসারণের ফলে নগরজীবনের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। নগর এখন জীবনের সর্বদিকের নিয়ামক হয়ে উঠেছে। আমাদের অর্থনীতির ভারকেন্দ্র এখন নগরে সরে এসেছে, পল্লী এখন প্রায় সকল দিক দিয়েই নগর-নির্ভর। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধ্যান-চিন্তার ক্ষেত্রে নগরের সর্বগ্রাসী প্রভাব আজ পল্লীতেও ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে—ফলে পল্লীবাসীর জীবন চিন্তায় বেশ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নগর এখন সকল দিকেই পল্লীবাসীর আদর্শ হয়ে উঠেছে। পল্লীবাসীর আমোদ-উৎসব, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষা-দীক্ষা, বেশভূষা, চালচলন সব কিছুই আজ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এখন পল্লী-রাখালের মুখে স্বভাব-সুন্দর পল্লীগীতির বদলে শহুরে সিনেমার গান শোনা যাবে। পল্লীর মেয়ে এখন হয়ত চোখে কাজল, নাকে নোলক পরা পছন্দ করে না। তাদের এখন সাদামাটা পোষাকে মন খুশী হতে চায় না। পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরে আর তাদের মন টিকে না। শহরের ঐশ্বর্যের জৌলুস তাদের চোখ ঝল্‌সে দিয়েছে। সেখানে ধনৈশ্বর্যের যে জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, তার কিছু অংশ তারাও দাবী করছে। পুরাতন কালের ন্যায় গ্রাম্য উৎসব-অনুষ্ঠান নিয়েই তারা খুশী থাকছে না। রাখালিয়া গান, ভাটিয়ালী গানে তাদের প্রাণে সে সাড়া জাগে না। এখন তারা পল্লীসাহিত্যের সহজ, সরল রূপে তৃপ্ত নয়, শহুরে ভদ্র-সাহিত্যের দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে। পল্লী কাব্যের দিনও তাই যেতে বসেছে। তাই তো দেখছি জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের আবেদনও ক্রমে ফিকে হয়ে আস্‌ছে। পল্লী জীবন ও প্রকৃতি তার সকল ঐশ্বর্য ও মাধুর্য যেন ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলছে। ফলে যে

পল্লীর নিস্তরঙ্গ শান্ত পরিবেশে সুন্দর ও কল্যাণের আশ্বাসে এককালে শহরবাসী কবিরা আশ্রয় খুঁজেছিলেন, আজ তাঁরা একে একে আসর থেকে বিদায় নিয়েছেন। মর্মান্তিক হলেও, এ মহা অঘটন আজ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি কালিদাস রায় অতি চমৎকার একটি কবিতায় এ অবাঞ্ছিত দুঃখজনক সংঘটনের করুণ দৃশ্য বর্ণনা করেছেন ঃ

'বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি যুঁই এর বনে
বিদায় নিল সজল চোখে ন'বছরের ক'নে।
বিদায় নিল কাঁচ পোকা টিপ, নয়নে কাজল
নাকটি হতে নোলক মোতি, চরণ হ'তে মল।
বিদায় নিল লাল পেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর
সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর।
সুভাসভরা টেক্কা খোঁপার চারু চিকন ছবি,
তাদের সাথে বিদায় নিল কবি।...
ধনপতি সাধুর পায়ের উদ্ধত দাপট
ভেঙে দিল খুল্লনা মার চণ্ডীপূজার ঘট
ধান দূর্বার আশিস্ গেল, মায়ের হাতের ফোঁটা
হৃৎকমলের পাপড়ি ঝরে রইল শুধু বোঁটা।
যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড়
বঙ্গ মাতার আঁচল আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যত পুঁজিপাটা বিদায় নিল সবি
তাদের সাথে বিদায় নিল কবি। [১৮]

জসীম উদ্‌দীন নিজেই সে বিদায় দৃশ্যের অভিনেতাদের একজন। তাঁরও কাব্যের পুঁজিপাটা ফুরিয়েছে, তাই চলছে পল্লীর আসর থেকে সরে যাওয়ার মৌন আয়োজন। দীনেশচন্দ্র তরুণ জসীম উদ্‌দীনের কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে 'সর্বগ্রাসী শহরের মায়াজাল কাটাইয়া পল্লীর অনাবিল ভাব ও স্ফূর্তি বজায় রা[illegible] যেরূপ

১৮। কালিদাস রায় : 'কবির বিদায়', বেতার জগৎ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৮৭৯ শকাব্দ।

শক্ত ব্যাপার তাতে জসীমউদ্‌দীন পল্লীর 'এ সাঁঝের ভোগ' হয়ত অল্প-দিনেই সব হারিয়ে ফেলবেন। তাঁর সে আশঙ্কা আজ সমগ্রিকভাবে বাঙলা কাব্য সম্পর্কে সত্য প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। তবু বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে জসীম উদ্‌দীন ও রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের এ পল্লীচেতনা ও তাকে কাব্যিক মহিমা দানের সাহসিক প্রচেষ্টা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলেই গণ্য হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে—পুরাতন পল্লীকেন্দ্রিক জীবনধারার সঙ্গে নতুন যান্ত্রিক সভ্যতা প্রসূত নগরচেতনার অনিবার্য সংঘর্ষের দিনে, তাঁরা হয়ত নিশ্চিত পরাজয় জেনেও পল্লীকেই জীবনের পরম নির্ভর ও আশ্বাস-স্থল বলে গ্রহণ করেছিলেন। পল্লীর স্নিগ্ধ ও মমত্বময় পরিবেশ এবং সরল জীবনধারাশ্রয়ী তাঁদের কাব্যে অতি আধুনিক কাব্যের জীবন-জিজ্ঞাসার জটিলতা, মননের সূক্ষ্মতা, প্রসাধন পারিপাট্য, শব্দ-উপমার ঐশ্বর্যের চাকচিক্য অনেক কিছুই হয়ত নেই। কিন্তু যা আছে—পল্লীর উদার নীল আকাশ, শ্যামল মাঠ, সাদামাটা জীবনের নিরাভরণ চোখজুড়ানো রূপ ও মন জুড়ানো প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের উত্তাপ. তা কিন্তু কম লোভনীয় সম্পদ নয়। হয়ত কাল-ধর্মে বাজার দরে তার মূল্য বেশী দেওয়া হয় নি। তাই বলে তার মূল্যহীনতা প্রমাণ হয়ে গেল—এমন কথা রসিকরা নিশ্চয় মেনে নেবেন না।

জসীম উদ্‌দীনের কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগেঃ তিনি সমকালীন কবিত্বের বাঁধা রাজপথে না গিয়ে, কেনই বা পল্লীকাব্যের পুরোনো ধূলিধূসরিত গ্রাম্য রাস্তাটা ধরেই অগ্রসর হলেন? একি একটা নিছক খেয়াল না, কবি-স্বভাবের একটা বিশেষ প্রবণতা? এ প্রশ্নের যথার্থ জবাব পাওয়া যাবে এই ভরসায় এখানে একজন কাব্যরসিক সমালোচকের একটি মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত করছি তিনি বলেছেনঃ 'কোন বিশেষ কালের কবিতার ধারা অনুসরণের অভিজ্ঞতায় এ সত্যটি বার বার ধরা পড়ে যে, এক যুগে বাস করলেই সেই যুগের সব কবি সমধর্মী, সমবিশ্বাসী, সমবোধময় অথবা সমানমনা হতে বাধ্য থাকেন না। সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা-দীক্ষার পরিমাণ, বংশগত ঐতিহ্য, বিত্তগত অবস্থা ইত্যাদি নানা ব্যাপারের ওপর এক একটি মনের বিশেষ

মননস্বভাব নির্ভর করে।[১৯] জসীম উদ্‌দীনের বেলায়ও এ বিশেষ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তাঁর কালের অধিকাংশ কবি থেকেই প্রকৃতিতে পৃথক ছিলেন, তাই তাঁদের সাথে তাঁর কর্মচিন্তার পার্থক্যও সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর কবিকর্মে বিশেষ সামাজিক পরিবেশ, বংশগত ঐতিহ্য. বিত্তগত অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। বাঙলার প্রধানত পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে যে বিশাল মুসলমান সম্প্রদায়, তারই মধ্যে তাঁর আবির্ভাব—এরা যুগ যুগ ধরে পল্লীতে বাস করে স্বভাবতঃই পল্লীকেন্দ্রিক জীবনদৃষ্টি ও জীবনভঙ্গিমার অধিকারী। পল্লী পরিবেশের স্নিগ্ধতা, সরলতা এদের সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জসীম-উদ্‌দীনের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেকটাই কেটেছে এ পল্লীতে—এখানকার মাঠে, ঘাটে, নদী তীরে, বালুচরে সাধারণ মানুষের সাথে। জন্মসূত্রে পল্লীর সাথে তাঁর এই যোগ পরবর্তীকালে আরও গভীর ও অন্তরঙ্গ হয়ে তাঁর স্ফুটনোন্মুখ কবিপ্রতিভার বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। পল্লী তাঁর জীবনে—'Meet nurse for a poetic child'—কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রীর কাজ করেছে। পল্লী পরিবেশে লালিত, পালিত, পরিবর্ধিত জসীম উদ্‌দীনের মনের অনেকটাই জুড়ে বসেছিল পল্লী প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও মাধুর্য। তা'ছাড়া পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য-লালিত পুঁথি-সাহিত্য ও গ্রাম্য গীতিগাথার সাথে তাঁর আবাল্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁকে পল্লীসংস্কৃতির প্রতি আরও বেশী শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। এ শ্রদ্ধাই আরো পুষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন জীবনের যাত্রাপথে পল্লীগীতির সংগ্রাহক হয়ে তিনি বছরের পর বছর বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে লোকসাহিত্যের অজস্র সম্পদ আহরণ করেছিলেন। দরদী কবিপ্রাণের অধিকারী জসীম উদ্‌দীন পল্লীগীতির বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্যে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন আপন হৃদয়ে। এ সবের সাথে আপন কবি-স্বভাবের একটা সহজ আত্মীয়তা অনুভব করলেন। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূত্রে আধুনিক কাব্যের প্রতি যে সামান্য আকর্ষণ বোধ করেছিলেন

১৯। হরপ্রসাদ মিত্র : সাহিত্যের নানা কথা পৃঃ ১৭৫।

তাও ক্রমশঃ দূর হয়ে গেল। তিনি কাব্যবস্তুর জন্যে অনির্বার্যভাবে ঝুকেঁ পড়লেন পল্লীসাহিত্যের দিকে।

জসীম উদ্‌দীনের কবিমানসের এ প্রবণতার মূলে ইসলামী সাম্যবাদ প্রভাবান্বিত জীবনচেতনাও যে অনেকটা ক্রিয়াশীল ছিল, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর তাঁর 'বাঙলার কাব্য' নামক গ্রন্থে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে মুসলিম প্রভাবের সবচেয়ে বড় অবদান পল্লী কবিতার ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। তিনি এর কারণ সম্পর্কে বলেছেন: 'ইসলামের মধ্যে যে বিপ্লবী সাম্যবাদ নিহিত ছিল, তাতে কেবল অবিনশ্বর থেকে নশ্বরের দিকে মানুষের দৃষ্টি টানে নি, মানুষের সমাজেও রাজসভা ও অভিজাতের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে কাব্যের উপাদান খুঁজেছে।'[২০] বাস্তবিক পক্ষে মুসলিম কবি-রচিত অজস্র জারীগান, কবি-কথা, গীতি-গাথার মধ্যে পল্লীর সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-প্রেম প্রভৃতিই আশ্চর্যরূপে মূর্ত হয়ে রয়েছে। জসীম উদ্‌দীনের ক্ষেত্রেও এই বিশেষ ধর্ম-দর্শনজাত জীবন-চেতনা যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে মনে করলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না।

জসীম উদ্‌দীনের কবিমানসের সংগঠনে সমকালীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘটনও অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, তা' নগরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনে একটা দারুণ হতাশা ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছিল। বাস্তবিকই নগরবাসী মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী ও পল্লীর স্বল্পবিত্ত মানুষের জীবন দিন দিন দুর্বহ হয়ে উঠছিল। বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশা থেকে দূরে সরে এই সময় কবিরা বিগতপ্রায় পল্লীজীবনের নিরাবিল শান্তি সুখের বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। পারিপার্শ্বিকে যে আশ্বাস তাঁরা খুঁজে পাননি, তাঁকে কল্পনায় খুঁজে বের করেছিলেন পল্লীর নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনে, প্রকৃতির শ্যামল শোভায়। পল্লীর সন্তান জসীম উদ্‌দীন হয়ত এতে কিছুটা

২০। হুমায়ুন কবির: বাঙলার কাব্য, পৃঃ ৩৭।

ভরসা পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের পল্লীচেতনা জসীমউদ্‌দীনের মনোভঙ্গীকে আরও বেশী পল্লীনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করেছিল। বিশেষতঃ বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙলাদেশেও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় পল্লীগীতি, গাথা, ছড়া, প্রবাদ সংগ্রহের যে একটা উদ্যম দেখা দিয়েছিল, তার ফলে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়েছিল পল্লীর দিকে। ১৯২২ সালে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ও আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হলে, সাহিত্য-সমাজে রীতিমত আলোড়ন দেখা দেয়। এ গীতিকা-সংগ্রহ তরুণ জসীমউদ্‌দীনের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। পল্লীর সন্তান তিনি; তারই চোখে দেখা পল্লী-প্রকৃতির এমন নিরাভরণ প্রাণমাতানো রূপ, পল্লী নরনারীর এমন আশ্চর্য সজীব মূর্তি, তিনি সাহিত্যে আর কোথাও প্রত্যক্ষ করেন নি। এ নতুন অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যবোধকে অনেকটা বলিষ্ঠতা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে পল্লীগীতির সংগ্রাহক হিসেবে অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ঘটায় পল্লীজীবন ও পল্লীসাহিত্যের আশ্চর্য ঐক্য আবিষ্কার করে তিনিও পল্লী-জীবন নিয়ে কাব্য লেখার উদ্যম অনুভব করেছিলেন। বাঙলা-সাহিত্যে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র এ অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভূমিকা আমাদের প্রায় এর দেড় শতাব্দী পূর্বের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের অনুরূপ একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের পল্লীজীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যখন নষ্ট হতে বসেছিল, তখন বিশপ পার্সীর সংগৃহীত 'Reliques of Ancient English Poetry (১৭৬৫ খ্রীঃ) এখনি করে সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আহ্বান জানিয়েছিল পল্লীকাব্যের বিস্মৃতপ্রায় ঐশ্বর্যের মূল্য অনুধাবন করতে। ফলে ইংরেজী সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়—গ্রে, গোল্ডস্মিথ, কুপার, ক্র্যাব, বার্ণস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট প্রভৃতি বহু কবির দৃষ্টি পল্লীর দিকে ফেরাতে পার্সীর এ 'সংগ্রহ' যথেষ্ট সাহয্যে করেছিল।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আমাদের পল্লীপ্রীতি প্রবল হয়ে ওঠার আরও একটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। এটা ঠিক যে যন্ত্রযুগের ক্রম-প্রসারণের

ফলে নগরচেতনা তখন বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং জীবনের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পল্লী কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এটাও সত্য বলে স্বীকার করতে হবে যে বাস্তবজীবনে পল্লীর ভূমিকা তখনও অনেকটা সক্রিয় ছিল। সমকালীন অসহযোগ আন্দোলনের 'গ্রামে ফিরে যাও' আহ্বান পল্লীর এই ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধিতে সাহায্য করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে ছিট্‌কে এসে কলকাতা শহরে পড়ে নানা-ভাবে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হয়ে, তরুণ জসীম উদ্‌দীন যে তিক্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই শহরের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা হয়ত কিছুটা বেড়েছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় পল্লীপ্রীতি আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। তবে অসহযোগ আন্দোলনের মত একটা নেতিবাদী আন্দোলন জসীম উদ্‌দীনকে পল্লী নিয়ে সাহিত্য সাধনায় খুব একটা প্রেরণা দিয়েছিল এমন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ দেখছি না। কারণ এ আন্দোলন আমাদের সাহিত্যের অন্য কোন ক্ষেত্রেও কোন বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে নি। এ আন্দোলন সমাজের নিতান্ত উপরের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল—এর মর্মমূলে সাড়া জাগাতে পারে নি। তা' না হলে পল্লীতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান, নিছক আহ্বানেই পর্যবসিত হত না। জসীম উদ্‌দীন পল্লীর সন্তান—পরিবেশ ও ঐতিহ্যসূত্রে পল্লীজীবন ও সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল অতি শৈশবেই। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তিনি প্রথমে হয়ত কিছুটা দ্বিধান্বিতভাবেই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অনুকরণে কিছু কবিতা লিখবার চেষ্টা করে-ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনস্মৃতি-বিষয়ক রচনা 'যাঁদের দেখেছি'-তে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু অতি শীঘ্রই কবি নিজ স্বভাবধর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন—আর তাঁর এ চেতনার বিকাশে উল্লিখিত সব ঘটনাই কম বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করি জসীম উদ্‌দীনের জীবন ও কর্মে পল্লী এক নিয়ামক শক্তিরূপে দেখা দেয়—আর তারই প্রভাবে তিনি সমকালীন কবিত্বের বাঁধা রাজপথ ছেড়ে কাব্যের মেঠো পথটাকেই

সার বলে গ্রহণ করলেন। তবে সে মেঠো পথকে তিনি আধুনিক কাব্যের রাজপথের সাথে কিছুটা জুড়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন, অসাধারণ শিল্পকুশলতার গুণে। তাই তো দেখি, কাব্যের রাজপথের পথিকরাও কালেভদ্রে এ পথে আনাগোনা করার প্রয়াস পান। তবে হ্যাঁ, এ পথে ভিড় নেই মোটেই! পল্লীপথের পাশে ছাত্রবিরল পাঠশালার ন্যায় জসীমউদ্‌দীনের কবিত্বের এই পাঠশালায়ও তেমন বেশী ছাত্র জোটে নি। তা' হলেও জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের অনুসারী ছোট এক কবি-গোষ্ঠী যে গড়ে উঠেছে, তা' তার শক্তিমত্তার পরিচয়ই বহন করে। কবি ও ঔপন্যাসিক বন্দে আলী মিয়া সাহিত্যের অন্যান্য দিকে যেমনই হউন, পল্লী কবিতার ক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীনেরই সহযাত্রী। তা'ছাড়া কবি রওশন ইজ্‌দানী, আবদুল হাই মাশ্‌রেকী—এঁরা তো সজ্ঞানেই তাঁর অনুসরণ করেছেন। তবে এঁরা অকৃত্রিম পল্লীকাব্য লিখবার প্রেরণায় তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রায় পুরোপুরি গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গী আশ্রয় করেছেন। এঁদের রচনায় কালধর্মের স্বীকৃতি নেই। তাই তাদের সাহিত্যিক সার্থকতাও কম হতে বাধ্য।

এ যুগে মুখ্যত পল্লীজীবন ও প্রকৃতিকে কাব্যের উপজীব্য করে কাব্যসাধনার নতুন ধারা প্রবর্তন করে জসীম উদ্‌দীন একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য আমাদের বহু শতাব্দীব্যাপী গড়ে-ওঠা সুসংবদ্ধ পল্লীজীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে যে নতুন সাহিত্য গড়ে ওঠে, তা সে ঐতিহ্য থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবেই গড়ে উঠেছিল। ফলে আমাদের হাজার বছরের বাংলা-সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছিল এবং তা' আমাদের জাতীয় স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল অনেক পরিমাণে। জসীম উদ্‌দীন জাতীয় স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন এ কাব্যধারাকে আবার পল্লীজীবন ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করে সমে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছেন। নাগরিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের দিনেও যে তিনি পল্লী নিয়ে কাব্য লিখে সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছেন, তাই প্রমাণ করে যে দুই এক শতাব্দীর

নাগরিক সভ্যতা আমাদের পল্লী ঐতিহ্যকে একেবারে কোণঠাসা করতে পারেনি। পল্লী যে এখনও আমাদের জীবনে একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে, তার সাথে যে আমাদের নাড়ীর যোগ এখনও ছিন্ন হয়নি, জসীম-উদ্‌দীন আমাদের তাই দেখিয়েছেন। আধুনিক কালে কাব্যে পল্লীজীবন ও প্রকৃতির প্রবক্তা হিসাবে জসীম উদ্‌দীন 'পল্লীকবি' হিসাবেই পরিচিত হয়ে রয়েছেন। 'জসীম উদ্‌দীন সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচকই যা বলতে চেয়েছেন তার মর্মার্থ এই : জসীম উদ্‌দীন মনেপ্রাণে পল্লীদরদী বলে পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র তাঁর লেখনীতে যেমন ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে—বাংলার আর কোন কবির লেখায় তেমনটি হয় নি।' 'লোককবি বা পল্লীকবি হিসাবে জসীম উদ্‌দীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।' 'বাংলা ভাষায় পল্লী সাহিত্য তাঁর অবদান তুলনাবিহীন।' তথাপি একথা সত্য বাংলাসাহিত্যে জসীম উদ্‌দীনের কাব্য সাধনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্ধারণের দায়িত্ব এখনও কোন রসিক সমালোচক পালন করেন নি। হয়ত পল্লীকাব্যের গুরুত্ব সম্পর্কে উপযুক্ত চেতনার অভাব, হয়ত বা নাগরিকসুলভ উন্নাসিক মনোবৃত্তিই এজন্য দায়ী। তাছাড়া জসীমউদ্‌দীনের কাব্যকাঠামোর সরলতা, তাঁর ভাষা ও ছন্দের সহজ-বোধ্যতা, কাব্যবস্তুর হৃদয়গ্রাহিতা ও অসাধারণ সাধারণতা তাঁকে অনায়াসবোধ্য করে তুলেছে সাধারণ পাঠকের কাছে। তাই পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও মনোযোগ সহকারে আজ আর বড় কেউ তাঁর কাব্য পড়েন না।

আমাদের জীবনে পল্লীর ভূমিকা আজ নানা কারণে গৌণ। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা আজ নগরকেন্দ্রিক। পল্লী এখন সর্বতোভাবে নগরমুখাপেক্ষী। স্বভাবতই আমাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যিক কর্মেও পল্লীর স্থান সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের দোহাই পেড়ে অনেকেই মুখে পল্লী-উন্নয়নের কথা বলেন বটে, কিন্তু কার্যত পল্লীর প্রতি ঔদাসীন্যই প্রদর্শিত হয় প্রায় সর্বত্র। পল্লী এখন নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিলাস উপকরণ তৈরীর কাঁচামাল সরবরাহের স্থল মাত্র। শিক্ষা, সংস্কৃতি

সর্ববিধ বিষয়ে নাগরিক প্রভাব অনুভূত হচ্ছে পল্লী অঞ্চলে। এককালে নগর ও পল্লীর পারস্পরিক নির্ভরতার দোহাই পেড়ে অনেকেই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের স্বপ্ন দেখতেন; কিন্তু বিপ্লবাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার ফলে, সে স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাচ্ছে। জীবনে যে সামঞ্জস্য সম্ভব হল না, সাহিত্যে তা আশা করা নিশ্চয়ই সমীচীন নয়। তাই তো দেখছি পল্লীর অন্যান্য জিনিসের ন্যায় পল্লীকাব্যের দিনও গতপ্রায়। এর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। জসীম উদ্‌দীনের কাব্য তাই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটা সাহসিক 'এক্সপেরিমেণ্ট' রূপেই থেকে গেল। তাতে যে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল, তা সম্ভাবনাই থেকে গেল।

এতৎসত্ত্বেও রসিক কাব্যপাঠকের কাছে জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের মূল্য অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আর সে মূল্য কাব্যবস্তুর বৈশিষ্ট্যের জন্য যতটা না হোক, তার চেয়ে ঢের বেশী কবিত্ববোধের স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা, অনুভূতির গভীরতা ও জীবনের প্রতি অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে। তাঁর অনেক কবিতাই হয়ত গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। কিন্তু 'কবর' ও 'পল্লীজননী'র মত কবিতা, 'নকসীকাঁথার মাঠ', ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'-এর মত কাব্যোপন্যাস কবিত্বের সকল মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ হবে এমন ভরসা করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না। জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের মূল্যায়নে সাহায্য করবে এই বিশ্বাসেই কল্লোলযুগের অন্যতম চিন্তানায়ক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সুচিন্তিত মন্তব্য উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের উপসংহার টানছি। তিনি বলেন: 'কবিতায় জসীম উদ্‌দীনই প্রথম গ্রামের দিকে সঙ্কেত, তার চাষাভুষা, তার খেত-খামার, তার নদীনালার দিকে, তার অসাধারণ সাধারণতার দিকে, যে দুঃখ সর্বহারা হয়েও সর্বময়, যে দৃশ্য অপজাতের হয়েও উঁচু জাতের। কোনো কারুকলার কৃত্রিমতা নেই, নেই কোনো প্রসাধনের পারিপাট্য, একেবারে সোজাসুজি মনস্পর্শ করার আকুলতা। কোনো 'ইজমের' ছাঁচে ঢালাই করা নয় বলে তাঁর কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।'[২০] এর পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

২০। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: 'কল্লোলযুগ' পৃঃ ১৮৩-৮৪।

বাঙলা লোকনাট্যের ধারা ও জসীম উদ্‌দীন

জসীম উদ্‌দীনের লোকজীবনাশ্রয়ী সাহিত্য-সাধনা যে শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, নাটকের ক্ষেত্রেও আপন প্রকাশ খুঁজে পেয়েছে, এ সংবাদ আজকের অনেক সাহিত্য-পাঠকই হয়তো রাখেন না। অথচ বাংলা সাহিত্যে লোকজীবনশিল্পী হিসাবে জসীম উদ্‌দীনের যে প্রতিষ্ঠা তার অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর রচিত লোকজীবনাশ্রয়ী নাটকগুলোর উপর। 'রাখালী', 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'-এর কবির শিল্পী-পরিচয়কে যথার্থই পূর্ণতা দিয়েছে তাঁর 'পদ্মাপার', 'মধুমালা', 'বেদের মেয়ে', 'পল্লীবধূ' ইত্যাদি লোক-জীবনাশ্রয়ী নাটকগুলো। এসব নাটক রচনার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন আমাদের লোকসাহিত্যেরই অন্যতম সম্পদ লোকনাট্যগুলো থেকে। সংস্কৃত ও ইউরোপীয় নাট্যাদর্শে আধুনিক কালে বাংলা নাটক সৃষ্টির পূর্বে যুগ যুগ ধরে এই লোকনাট্য-গুলোই বাংলার পল্লীর, এমন কি শহরেরও, সাধারণ মানুষের চিত্ত-বিনোদনে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য রচনার মতো এদেরও কোন লিখিত রূপ হয়তো ছিল না; কিন্তু পালাগানের আকারে লোকের মুখে মুখে নাট্যকাহিনী প্রচলিত ছিল। গানে গানে সে কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হতো, অভিনেতারা ফাঁকে ফাঁকে কথার সূত্র জুড়ে দিতেন। যাত্রাগান ও বিভিন্ন পালাগানের মধ্য দিয়ে, লোকনাট্যের এ ধারাটি যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তরিত হয়ে আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে। যদিও পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় এ-প্রবাহ আজ খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু এর আবেদন একালেও যে একে-বারে ফুরিয়ে যায়নি, তার প্রমাণ মেলে যাত্রা ও পালাগানের ব্যাপক

জনপ্রিয়তা দেখে। মুক্তাঙ্গনে, আসরে অভিনীত হয়ে এসব নাটক এখনও সাধারণ মানুষকে আনন্দে মাতিয়ে তোলে। শাস্ত্রীয় নাটক ও চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের দিনেও কোনক্রমেই এ সত্যকে অস্বীকার করা চলে না।

বাংলার এই লোকনাট্যের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। এর উৎস ও বিকাশধারা সম্পর্কে নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা করার জন্য কোনো লোকসংস্কৃতি প্রেমিকও এখন পর্যন্ত এগিয়ে আসেন নি। এ ক্ষেত্রে যা কিছু সামান্য কাজ হয়েছে, তার সবটারই কৃতিত্ব প্রাপ্য লোকজীবনশিল্পী কবি জসীম উদ্‌দীনের। কবিতার ন্যায় নাটকেও লোকজীবনকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি শৈল্পিক তাগিদ থেকেই লোকনাট্যের প্রকৃতি, উৎস ও বিকাশধারা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাঁর এই অন্বেষার ফলে বাংলা লোকনাট্যের অজ্ঞাত-প্রায় বিকাশধারার ইতিহাসটি আজ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে এবং আমরা লোকনাট্যের সরণি আশ্রয় করে লোকজীবনে প্রবেশের আর একটি পথ আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছি।

লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে এসে লোকসাহিত্যের মাল-মশলা সংগ্রহ করতে করতেই জসীম উদ্‌দীন লোকনাট্যের জন্মসূত্রটি নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলার বিভিন্ন জেলার মেয়েলি গানে, রাখালী গানে, ছেলে ভুলানো ছড়ায়, কথোপকথনের ছলে মাঝে মাঝে নাটকীয় সম্ভাবনা-পূর্ণ জীবনদৃশ্যের যে সব অংশ চিত্রিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, তার মধ্যেই তিনি বাংলার বড় বড় লোকনাট্যগুলোর উন্মেষ লক্ষ্য করেছেন। তিনি বহু লোকসঙ্গীত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এদের মধ্যে আমাদের পল্লীজীবনের বহু অংশ নাটকাকারে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। নিপুণ লোক-অভিনেতারা লোকনাট্যের স্থান বিশেষে এই খণ্ডিত জীবনদৃশ্যগুলো বেশ মুন্‌সিয়ানার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাকে একটা সহজ শিল্পসম্মত রূপ দিয়ে ফেলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জসীম উদ্‌দীন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'বাইস্থার তামাসা' নামক লোকনাট্যের 'জল ভর সুন্দরী মেয়ে জলে দিছাও ঢেউ' সঙ্গীতাংশটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এ অংশটি বহু রাখালী গান

ও বারমাসী গানে পাওয়া যায়। এমনকি যে সব অঞ্চলে 'বাইস্থার তামাসা' প্রচলিত নেই, সে-সব জায়গায়ও গানটি গাওয়া হয়। এর থেকে অনেকটা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে এ অংশটি প্রচলিত গ্রাম্যগান থেকেই 'বাইস্থার তামাসা' রচনাকার তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছেন। অন্যত্র তিনি বাংলাদেশের গাজীর গানের দলগুলো কেমন করে লোকনাট্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, তারও উল্লেখ করেছেন। এই দলগুলো গ্রামবাংলায় রূপকথা বলে বলে ঘুরে বেড়ায়। গল্পের যথাযথ আবহটির পরিস্ফুটনের জন্য এরা যেমন গানের সাহায্য নেয়, তেমনি গল্পের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে মাঝে মাঝে কথোপকথনের অবতারণা করে একটা নাটকীয়তা আমদানীর চেষ্টা করে। পরে ক্ষেত্রান্তরে এই কথোপ-কথনই ক্রমপরিণতি লাভ করে লোকনাট্যে পরিণত হয়। বস্তুত লোকশিল্পীরা এভাবেই বিচিত্রাস্বাদী লোকনাট্য যুগ যুগ ধরে রচনা করে এসেছেন। আমাদের শিক্ষিতসমাজ সে-সব খবর রাখার গরজ বোধ করেন নি বলে, আমাদের সাহিত্যে তাদের স্থান না হতে পারে; কিন্তু জনসাধারণের রসপিপাসা মেটানোর ব্যাপারে এদের গৌরবজনক ভূমিকার তাতে একটু ও লাঘব হয় না।

জসীম উদ্‌দীন লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের মর্মমূলে পৌঁছে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সত্যিকার লোকসংস্কৃতি-প্রেমিক ও শিল্পীর মন নিয়ে লোকনাট্যের সম্পদকে তথাকথিত ভদ্রসমাজের গোচরীভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন। লোকনাট্যের নিদর্শন সংগ্রহ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, তার ঐতিহ্য আশ্রয় করে লোকজীবন-ভিত্তিক নাটক রচনা করে তাকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় করে তুলেছেন। লোকনাট্যের যে একটি মানবিক আবেদন আছে, সেটিকে চাবিকাঠি করে এক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই কাব্যের ন্যায় নাটকের এ নতুন ক্ষেত্রেও তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন। বলা বাহুল্য, বাংলা লোকনাট্যের বিভিন্ন ধারার সাথে ব্যাপক পরিচিতি ও অন্তরঙ্গ যোগ না ঘটলে লোক-জীবননাট্যের এই নতুন ক্ষেত্রে অনায়াস সাফল্য লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। বিশ ও তিরিশের দশকে লোকসাহিত্য-

সংগ্রহের অভিযানে শরিক হয়ে বাংলার লোকজীবনের গভীরে প্রোথিত এই রস-সাহিত্যের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আবিষ্কারের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ঐ উপলক্ষে লোকজীবন ও লোক-সাহিত্যের অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে লোক-নাট্যের নিগূঢ় আত্মীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এদের শিল্পমূল্য সম্পর্কেও নিঃসংশয়িত হয়েছিলেন। এই উপলব্ধিই যেমন একদিকে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল বাংলা লোকনাট্যের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে, অন্যদিকে অবশ্য অনেক কাল পরে, লোকজীবন-ভিত্তিক নাটক রচনায় ব্রতী হতে।

জসীম উদ্‌দীন তাঁর লোকনাট্য সম্পর্কিত অন্বেষার ফলাফল বিবৃত করেছেন 'আমাদের লোকনাট্য, শীর্ষক একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথেষ্ট মূল্যবান তথ্য-সম্বলিত। অসম্পূর্ণভাবে হলেও আমরা এই প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যের সাহায্যে বাংলা লোকনাট্যের বিকাশধারার একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র নির্মাণ করতে পারি। বাংলাদেশে সাধারণত তিন রকমের লোকনাট্যের প্রচলন দেখা যায়—মালদহ জেলার 'আলকাফ', রংপুর, কুচবিহার ও ময়মনসিংহ জেলার 'তামাসা' এবং ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল ও ঢাকা জেলার 'যাত্রাগান'। এসব গীতিধর্মী লোকনাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। মালদহ জেলায় প্রচলিত 'আলকাফ'গুলোর অধিকাংশই ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা নাটিকার মতো। বিষয়বস্তু গ্রাম-জীবনের ঘটনা আশ্রয়েই গড়ে ওঠে; এতে পৌরাণিক কাহিনীর উপাদান গ্রহণ করা হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক জীবনপ্রবাহ থেকেই নাটকের ঘটনা নির্বাচন করা হয়। নাটকগুলোতে সাধারণত জুয়াখেলা, সুদখোরি, অপব্যয়ের কুফল ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার অবতারণা করা হয়। হাস্যরসের ভিতর দিয়ে নীতিশিক্ষাদানের একটি সজ্ঞান প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এ নাটকগুলোতে। হাসির মোড়কে পুরে অনেক নিষ্ঠুর জীবন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার এই প্রচেষ্টার মধ্যে লোকজীবনশিল্পীর সুস্থ জীবনচেতনার পরিচয় যেমন পাই, তেমনি পাই সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয়। রংপুর, কুচবিহার ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত 'তামাসা' ও ফরিদপুর-যশোহর-ঢাকা অঞ্চলের 'যাত্রাগানে'র তারতম্য সামান্যই। রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলোতে

গদ্য কথোপকথন সামান্য থাকে, গানে গানেই প্রধানত কথোপকথন চলে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যকগুলোর আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো প্রায়শই হাস্যরস প্রধান। এমন কি করুণ রসাত্মক বিষয়ও এসব অঞ্চলে হাস্যরসে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। রংপুর জেলার 'মোনাই যাত্রা', 'বলাইগান', 'বোষ্টম-বাদিয়া', 'হুমরা বাইস্থা', 'ময়নামতির গান' প্রভৃতি লোকনাট্য ব্যাপকভাবে সমগ্র উত্তর-বঙ্গে অভিনীত হয়। এ সকল লোকনাট্যের অভিনয় প্রত্যক্ষ করেই জসীম উদ্‌দীন এদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লোকজীবনভিত্তিক নাটক রচনায় সার্থকতা লাভের জন্যে তিনি যে এসব লোকনাট্যের কাছে যথেষ্ট ঋণী রয়ে গিয়েছেন তার স্বীকৃতি তাঁর নিজের উক্তিতেই পাই ঃ "আমার 'পদ্মাপার' নামক লোকনাট্যখানিতে কতকটা 'মোনাই যাত্রা' লোকনাট্যের অনুসরণ করিয়াছি। 'হুমরা বাইস্থা' নাটকের মোড়লের চরিত্রের কিছুটা আভাস আমার রচিত 'বেদের মেয়ে' নাটকের মোড়লের চরিত্রে পাওয়া যাইবে।"

আগেই উল্লেখ করেছি উত্তরবঙ্গের 'তামাসা' জাতীয় লোকনাট্যের সাথে পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের মূলগত পার্থক্য খুব বেশী নয়। তবে উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের মতো পূর্ববঙ্গের লোকনাট্যে গানের প্রাচুর্য থাকলেও, তাতে গদ্য কথোপকথনের স্থানও উল্লেখযোগ্য। হাস্যরসের অপ্রতুলতা না ঘটলেও করুণরসের একটি বাস্তব আবহসৃষ্টিতেও পূর্ববঙ্গের লোক-নাট্যকাররা যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেক লোকনাট্যে একটি বিশেষ সুরই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এর রস-সার্থকতা সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন বলেন ঃ "সেই সুরের মাদকতায় নাট্যবর্ণিত সমস্ত কাহিনী যেন মধুময় হইয়া দলের পর দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে।" বলা বাহুল্য, যেহেতু 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts' সেই হেতুই করুণরসের সৃজনেই পূর্ববঙ্গের লোক-নাট্যগুলোও সার্থকতা অর্জন করেছে বেশী। সেই জন্যেই দেখি করুণ-রসের দিকেই শিল্পীদের পক্ষপাত বেশী। এর ফলে লক্ষ্য করি কোনো কোনো লোকনাট্যের প্রথম দিকে হাস্যরসের সমাবেশ ঘটলেও শেষের দিকে

ঘটনাপ্রবাহ করুণ হয়ে চারদিকে একটা অপূর্ব নীরবতা সৃষ্টি করে। ফরিদপুর, বরিশাল, কুষ্টিয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত 'ভাসান যাত্রা', 'আসমানসিংহ যাত্রা', 'জামাল যাত্রা' ইত্যাদি এই জাতীয় লোকনাট্যের সার্থক উদাহরণ। এই লোকনাট্যগুলিতে একটি উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। তাই দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষ একত্র হয়ে এসব নাটক অভিনয় করে এবং সমবেত হিন্দু-মুসলমান শ্রোতা একত্রে বসে সে অভিনয় উপভোগ করে। নীতিশিক্ষা বা আদর্শ প্রচারের একটি সজ্ঞান-প্রবণতা এ জাতীয় নাট্যসৃষ্টি ও অভিনয়ের পিছনে কাজ করলেও, কেউ যদি মনে করেন নীতিশিক্ষাদান বা নীতিকথা প্রচারণাই এগুলোর একমাত্র লক্ষ্য, তা' হলে কিন্তু তিনি খুবই ভুল করবেন। কারণ এগুলোতে লোকজীবনশিল্পীরা নরনারীর জীবন বাস্তবকে পূর্ণ মূল্যদানের চেষ্টা করেছেন। এবং সে চেষ্টা প্রায়শ শিল্পসার্থকতামণ্ডিত হয়েছে।

এই লোকনাট্যগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে, ভাসান যাত্রা ও পালাকীর্তনের প্রাচীন রসধারার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কালের জীবনধারার সংযোগ ঘটায়, এদের আকর্ষণ আজও অনেকটা বজায় রয়েছে। নাটকগুলোর কথোপকথনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কথাবার্তার ভঙ্গীটিই রক্ষিত হয়েছে। অথচ তা' অবলম্বন করেই নাটকের চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং ঘটনার নানা ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে অপূর্ব রসতরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। লোকনাট্যের কথোপকথনের এই স্বাভাবিকতাই এদের অনায়াস অভিনয়োপযোগী করে তুলেছে। এতে আর একটি সুফল হয়েছে এই যে অভিনেতারা বিভিন্ন চরিত্রের পাঠ বলতে অনেকটা স্বাধীনতা পায় বলে, অভিনয় কালে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং আপন আপন অভিনয়নৈপুণ্য দেখানোর পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। আবার ঐ কারণেই একদলের অভিনীত নাটকের সঙ্গে অন্যদলের নাটকের গুণগত পার্থক্যও দেখা দেয়। ভাল দলপতির হাতে পড়লে নাটকের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অক্ষম দলপতির হাতে পড়লে অপকর্ষ ঘটে। এ ছাড়াও এই লোকনাট্যগুলো সম্বন্ধে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার

আছে, তা হচ্ছে এই যে অভিনেতার অভিনয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা নেয়ার সুযোগ থাকায় এ নাটকগুলো নানা কণ্ঠে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমেই খোলস বদলিয়ে চলে। বিভিন্ন অঞ্চলের রুচির বিভিন্নতার জন্যে এদের অংশ বিশেষ প্রলম্বিত হয়, কোন অংশ বা খসে পড়ে। দলবিশেষে কোন অভিনেতা অভিনয় দক্ষতা দেখানোর জন্য অনেক সময় অভিনয়ের অংশটি ইচ্ছামতো পরিবর্তন করেন, আবার দক্ষতার অভাবে অপর অভিনেতা সে অংশ সংক্ষিপ্ত করেন। এই ভাবে লোকচর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে বলেই তো লোকরঞ্জনের জন্যে সৃষ্ট এ নাটকগুলোকে লোকনাট্য বলে। জসীম উদ্‌দীনের ভাষায়, "কোন বিশেষ ব্যক্তির রচনায় নয়, দেশের সকল লোকের রচনায় রূপায়িত হয় বলিয়াই এগুলি লোকনাট্য।"

শুধু যে পূর্ববঙ্গের 'যাত্রাগান' সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য তা নয়, মালদহের 'আলকাফ' এবং উত্তরবঙ্গের 'তামাসা' জাতীয় লোকনাট্যগুলো সম্পর্কেও শেষের এই বক্তব্য প্রযোজ্য। এই লোকনাট্যগুলোর সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও এক গভীর সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। জসীম উদ্‌দীনের মতে : "এই নাটকের ভিতরেই আমাদের গ্রাম্যজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, কি তাহারা হইতে যাইয়া কি তাহারা হইতে পারে নাই, সেই সুখ দুঃখের জীবন্ত আলেখ্য রচিত হইয়া আছে। দেশকে যাহারা ভালবাসেন, দেশের জনগণের অন্তরের সঙ্গে যাহারা আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহারা এই লোকনাট্যগুলির মধ্যে অনেক কিছু খুঁজিয়া পাইবেন।" বস্তুত লোকনাট্যগুলো লোকজীবন ও লোকমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে সমৃদ্ধ বলেই এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা গ্রাম-বাঙলাকে, গ্রাম-বাঙলার মানুষকে যথার্থরূপে জানতে ও বুঝতে পারি। লোককাব্যের বাতায়ন পথে প্রথম এই গ্রাম-বাঙলার মানুষের জীবনে প্রবেশের সুযোগ ঘটেছিল জসীম উদ্‌দীনের; লোকনাট্যের সদর রাস্তায় তার সাথে ঘটেছে তাঁর নিবিড়তর পরিচয়! আমার মনে হয়, এই আলোতে বিচার করলেই তাঁর লোকনাট্য সৃষ্টি-প্রয়াসটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা

সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে যার নাগাল পান নি, গান দিয়ে তাকে স্পর্শ করার কথা ভেবেছিলেন; জসীম উদ্‌দীন লোককাব্যের বাতায়ন পথে যাকে শুধু স্পর্শই করতে পেরেছেন, লোকনাট্যের সদর রাস্তায় নেমে তার সাথে কোলাকুলি করে তাঁর অপরূপ মিলন-পিপাসা মিটিয়েছেন। তাই জসীম উদ্‌দীনের লোকনাট্য সৃষ্টির প্রয়াসকে বিশেষ মূল্য দিতেই হয়।

জসীম উদ্‌দীনের হাতে বাঙলা লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবনই শুধু ঘটে নি, তার জন্মান্তরও ঘটেছে। আধুনিক শিল্পচেতনার পোষকতা থাকায় তাঁর রচিত লোকনাট্যের ভাষাদেহে যুগোচিত পরিমার্জন ছাড়াও অবলম্বিত কাহিনীতে যে সুসংবদ্ধতা দেখা যায় এবং ঘটনাবিন্যাসে যে চাতুর্য ও চরিত্র-চিত্রণে যে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে একে এক প্রকার নতুন সৃষ্টি বললেও চলে। তবু জসীম উদ্‌দীন তাঁর লোকজীবনের সুরাশ্রিত কবিকর্মের ন্যায় তাঁর লোক-নাট্যের ক্ষেত্রেও সর্বদা এর বিশেষ স্বভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। ঐ উদ্দেশ্যেই তিনি সর্বত্র লোকজীবন থেকেই নাট্যবস্তু সংগ্রহ করেছেন আর তার শিল্পরূপ দানে লোকসঙ্গীত, রূপকথা, কেচ্ছা, লোকগীতিকা, ছড়া, প্রবাদের রাজ্য থেকে অবাধে উপকরণ সংগ্রহ করে কাজে লাগিয়েছেন। সংলাপ রচনা কালে তিনি পল্লী নর-নারীর স্বাভাবিক বাচনভঙ্গীর প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্য রক্ষা করে চলেছেন। মোটকথা লোকজীবন থেকে মালমশলা নিয়ে লোকজীবন ভঙ্গিমাকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে জসীম-উদ্‌দীন লোক-নাট্যের যে নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন, তা তাঁর লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাহিত্যসাধনারই ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টার ন্যায় তাঁর লোক-নাট্যগুলোর জনচিত্ত জয়ের ক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হয়েছে। শৌখীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রচেষ্টায় বেতারে, রঙ্গমঞ্চে ও আসরে নানাভাবে অভিনীত হয়ে এগুলো সর্বস্তরের লোকের মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে! বলাবাহুল্য লোকনাট্যের এই নতুন দিগন্তে জসীমউদ্‌দীনের সাথকতার মূলে কাজ করেছে লোকচরিত্রে তাঁর

অসাধারণ জ্ঞান, লোকজীবন ও লোকমানস সম্পর্কে তাঁর সমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকার এবং সব কিছুকে সমঞ্জসিত করে শিল্পরূপদানের সহজাত ক্ষমতা।

লোকনাট্য জসীম উদ্‌দীন খুব বেশী লেখেন নি। কারণ, সম্ভবত লোকসাহিত্যের এই দিকটির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল সাহিত্যিক প্রৌঢ়ত্ব লাভের পরে। লোকনাট্যের যে-সব উপাদান পল্লীসাহিত্যে ছড়িয়ে ছিল, তার সাথে তাঁর পরিচয় অবশ্য ঘটেছিল অনেক আগেই। এ পরিচয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী'র অন্তর্ভুক্ত 'সিঁদুরের বেগতি' নামক গীতিনাট্যাংশটির উল্লেখ করতে পারি। তাঁর 'রঙিলা নায়ের মাঝি'র কিছু কিছু গানে এবং অন্যত্র সংকলিত বহু গানেও লোকনাট্যের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাই। তা ছাড়া তাঁর রচিত পল্লীজীবন গাথা 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'-এর উচ্চ নাটকীয় বৈশিষ্ট্যও দুর্লক্ষ্য নয়। এতৎসত্ত্বেও লোকনাট্য রচনার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছেন অনেক কাল পরে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও উৎসাহ প্রাপ্তির ফলে। সে প্রেরণা কার্যকরী হয়েছে আরও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর নয় বছর পরে মাত্র এই সেই দিন ১৯৫০ সালে। অথচ জসীম উদ্‌দীনের কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালেরও আগে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে তাঁর কাব্যসাধনায় যখন ভাটার টান এসে গিয়েছে, তখনই জসীম উদ্‌দীন লোকনাট্যের নতুন খাতে চলার গরজ বোধ করেছেন। মোট পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য তিনি রচনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে 'পদ্মাপার', 'মধুমালা', 'বেদের মেয়ে', 'পল্লীবধূ' ও 'গ্রামের মায়া'। এ ছাড়া 'বদল বাঁশী', 'করিম খাঁর বাড়ী', 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের কাইজ্যা' শীর্ষক চারটি ক্ষুদ্র একাঙ্কিকাও জসীম উদ্‌দীন রচনা করেছেন। এগুলো সবই মোটামুটি লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত। 'বদল বাঁশী' ও 'করিম খাঁর বাড়ী' 'পল্লীবধূ'-নাট্য-গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে এবং 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের

কাইজ্যা' জসীম উদ্দীনের সর্বশেষ নাটক (কাব্যনাট্য) 'ওগো পুষ্পধনু'র কলেবর পুষ্ট করেছে। এসব লোকনাট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে নেই বলেই আমরা সংক্ষেপে এদের বিষয় ও শিল্পকৌশলগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে প্রসঙ্গটির উপসংহার টান্‌ব।

জসীম উদ্‌দীনের প্রথম লোকনাট্য অভিধেয় রচনা 'পদ্মাপার' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত একটি অধ্যাত্মরূপক-জাতীয় লোকনাট্য। শৈব, শাক্ত, সহজিয়া সাধনার ধারায়, বাউল, মুর্শিদা, মারফতী প্রভৃতি গানের সুরে বাঙালীর অধ্যাত্মবোধের যে সহজ প্রকাশ ঘটেছে যুগে যুগে, কথার সূত্রে গানের মালা গেঁথে তাকেই জসীম উদ্‌দীন নাট্যরূপ দিয়েছেন 'পদ্মাপারে'। এ নাটক রচনার সূত্র তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'মোনাই যাত্রা' লোকনাট্য থেকে। 'পদ্মাপার' নাটক রচনায় 'মোনাই যাত্রার' অনুসরণ সম্পর্কে জসীম উদ্‌দীনের স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়, লোকনাট্য সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধে। সে কথা পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি। লক্ষ্য করার বিষয় মোনাই যাত্রার ন্যায় এ নাটকের নায়কের নামও মোনাই। নাটকটিতে ভবপথের পথিক মানুষের পরমকে জানা ও পাওয়ার অপরূপ উৎকণ্ঠাই মোনাই সওদাগর ও সুজন মাঝির অনির্দেশ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। মোনাই এখানে ভবপথের যাত্রী, পরমের উদ্দেশ্য সন্ধানী মানুষের প্রতীক, আর সুজন মাঝি ভবপথযাত্রী মানুষের পথ-প্রদর্শক গুরু বা মুর্শিদেরই প্রতীক। পরমকে জানা ও পাওয়ার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন; কিন্তু সে সাধ বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ সুদুঃসহ ত্যাগ ও সাধনা-সাপেক্ষ। সে সাধনার পথে সংসারী মানুষের বাধা অনেক। লোভ, মোহ-মাৎসর্য, বিষয়-বুদ্ধি সব সময়ই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তাই পথের দিশা হারিয়ে ফেলার ভয় রয়েছে প্রতি পদে। বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি এ পথের পথিকের বড় সম্বল। কিন্তু শুধু এসবের উপর ভরসা করেই ভবপথিক চলতে পারে না। কারণ পদে পদে সংশয় এসে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাকে ভুল পথে ঠেলে

দিতে চায়। এ অবস্থায় সদ্‌গুরুর উপদেশ বা নিদেশের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। তিনিই কেবল তাকে সকল মোহজাল ছিন্ন করে, সংশয় কাটিয়ে উঠে যথার্থ পথে চলবার উপযুক্ত শক্তি ও প্রেরণা জোগাতে পারেন। নতুবা ভবপথযাত্রীর ভরাডুবি অনিবার্য। মোটা-মুটিভাবে আমাদের বাউল, মুর্শিদী-পন্থার সাধকরা অনন্তের সঙ্গলাভপ্রয়াসী ভবপথিক মানুষের সমস্যাটাকে এইভাবেই তুলে ধরেছেন এবং তার সমাধান নিদে'শ করেছেন। আলোচ্য 'পদ্মাপার' লোকনাট্যে রূপকচ্ছলে এই অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার স্বরূপটিই ব্যক্ত হয়েছে।

নাটকটিতে দেহতত্ত্বের সুপ্রচুর উল্লেখদৃষ্টে অনায়াসে অনুমান করা চলে যে বাঙলার বাউলপন্থী লোকসাধকদের অধ্যাত্মভাবনাই যেন এতে কৌশলে রূপায়িত করা হয়েছে। বাউলরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা মানব দেহেই স্থিতি করেন। তাঁকে দেহাধারেই যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব; তবে সে জন্যে সুকঠিন যোগমার্গের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। তাঁরা বলেন, যোগবলে দেহস্থ মূলাধারে স্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সহস্রদলপদ্মে স্থির পরমাত্মার যোগে যুক্ত হতে পারলেই ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব। এ-মার্গ স্বভাবতই দুরধিগম্য। পথ চলতে উপযুক্ত গুরুর সাহায্য, উপদেশ ও নিদে'শনা সর্বদা প্রয়োজন। নানা ভ্রান্তি, প্রলোভন পথিকের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে-সত্যকে জানার আন্তরিক আগ্রহ ও ত্যাগবরণের সামর্থ্য থাকলে শেষ পর্যন্ত সকল বাধা উত্তীর্ণ হয়ে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব। আলোচ্য নাটকে সোনাই সওদাগরের বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতা ভবপথিকের সাধনার কঠোরতাই ইঙ্গিত দিচ্ছে। জসীম উদ্‌দীন সহজ রূপকের আবরণে রূপ-কথার মতো সুন্দর করেই ভবপথিক অনন্ত সঙ্গলিপ্সু মানুষের এই সংকট ও সাধনার কথা 'পদ্মাপার' নাটকে প্রকাশ করেছেন। তাত্ত্বিক জটিলতা সত্ত্বেও যে এ নাটকেব বক্তব্য সহজ ও হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পেরেছে. তার জন্যে কৃতিত্বের দাবি অবশ্যই জসীম উদ্‌দীন করতে পারেন। তবে এ কঠোর পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য

করেছে বাঙলার লোকায়ত জীবনভাবনা-সমৃদ্ধ পল্লীগীতিগুলো। অধ্যাত্ম ভাবনার তাত্ত্বিক রূপ যত জটিলই হোক না কেন, লোককবিরা লোকজীবন থেকে রূপক তৈরী করে তাকে অতি সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য করে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন। জসীম উদ্‌দীন ঐ গানের সরণি অবলম্বন করেই অনায়াসে দুস্তর বাধা অতিক্রম করেছেন। আর একটি কারণেও অধ্যাত্ম জীবনভাবনার জটিলতায় পূর্ণ এ লোকনাট্যটি লোকচিত্ত জয় করতে পেরেছে। তা হচ্ছে এই লোক-নাট্যে ভাববাদী বাঙালী স্বভাবের মজ্জাগত অধ্যাত্মবোধের সাড়া রয়েছে। যুগ যুগ ধরে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সহজিয়া, আউল, বাউল, মারফতী সাধকের অধ্যাত্ম সাধনার রসনিষেকে উর্বর সাধারণ বাঙালী চিত্তে লোককবিরা এমন সুকৌশলে এইসব অধ্যাত্মভাবনার বীজ বুনে দিয়েছেন যে একটু ভক্তি বা আবেগের বর্ষণেই তাতে ভাবনার মুকুল ফুটতে শুরু করে। তাই অনায়াসেই তারা তত্ত্বের বেড়ি অতিক্রম করে যে-কোন ভাবনার মর্মমূলে পৌঁছে যায়। এই জন্যেই তো তত্ত্বসর্বস্ব হয়েও 'পদ্মাপার' লোকনাট্য হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছে।

'পদ্মাপার' লোকনাট্যের একটি শিল্পগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এতে ঘন ঘন গানের সমাবেশে একটি অবিচ্ছিন্ন গীতিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। গানগুলো সবই পল্লী থেকে সংগৃহীত; তবে জসীম উদ্‌দীন এগুলোকে কিছুটা পরিমার্জিত, ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত করে, তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন। যে ভাষার সূত্রে এগুলোকে গেঁথে একটি অখণ্ড সুরসঙ্গতি দানের প্রয়াস পেয়েছেন, তাও যথাসম্ভব পল্লীর প্রাত্যহিক কথাবার্তারই ভাষা। ফলে পল্লীপ্রাণের যথার্থ স্পন্দনটি অনুভব করা যায় এ-নাটকে। তবে একথা ঠিক যে এ নাটকের চরিত্রগুলোর কথোপকথন ও গানের ভাষায় কিছুটা হেঁয়ালির ভাব লক্ষ্য করা যায়। 'পদ্মাপার' নাটকের ভাববস্তুর নৈর্ব্যক্তিকতাই যে এর জন্যে অনেক পরিমাণে দায়ী তা না বললেও চলে। জসীম উদ্‌দীনের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি লোকজীবন থেকে রূপকের উপাদান নিয়ে লোকভাষায় রূপকথার আদল সৃষ্টি করে

দুরূহ তত্ত্বভাবনাকেও একটা স্বাদুতা দান করতে পেরেছেন। 'পদ্মাপার' নামকরণটিও তাঁর সহজাত শিল্পবোধের সুন্দর পরিচয় বহন করে। তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ খরস্রোতা পদ্মাপ্রবাহের চেয়ে অনন্ত সঙ্গলিপ্সু ভবপথিকের দুরূহ সাধন পথের শ্রেষ্ঠ উপমান আর কিইবা হতে পারে !

রূপকথাশ্রয়ী লোকনাট্য 'মধুমালা' জসীম উদ্দীনের দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ। বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে লোকমুখে প্রচলিত মদনকুমার ও মধুমালার রূপকথা অথবা 'মধুমালার কেচ্ছা' অবলম্বনে এটি রচিত হয়েছে। বহুকাল নিঃসন্তান এক রাজা ও রাণীর অনেক তপস্যা ও সাধনার ফল একমাত্র পুত্রের যৌবন-স্বপ্ন-মত্ততার এক আকুল-করা কাহিনী 'মধুমালা' লোকনাট্যের বিষয়। সঙ্গীদের সাথে বনে শিকার করতে গিয়ে সারাদিন ছুটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাজপুত্র মদনকুমার। দৈবক্রমে ঐ বনের উপর দিয়ে যাচ্ছিল কালপরী ও নিদ্রাপরী। রাজ-পুত্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে ওরা তারই উপযুক্ত পাত্রী মনে করে ভিন-দেশের এক রাজকন্যা মধুমালার সঙ্গে স্বপ্নযোগে ঘটিয়ে দেয় তাঁর মিলন। স্বপ্নভঙ্গ হতেই রাজপুত্র আকুল হয়ে ওঠে স্বপ্ন দেখা সেই রাজকন্যাকে পাবার জন্যে। এদিকে রাজকন্যা 'মধুমালা'ও ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকে তার জন্যে। তারপর কেমন করে বহু দুস্তর বাধার সমুদ্র অতিক্রম করে, বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে রাজপুত্র পেলেন সেই মধুমালার দেখা তাই বিবৃত হয়েছে এই নাটকটিতে। বলা বাহুল্য মদনকুমারও মধুমালার মিলনের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করেছে নাটকটি।

তেরটি বিভিন্ন দৃশ্যে বিন্যস্ত করে এ জনপ্রিয় রূপকাহিনীটিকে লোকনাট্য রূপে গড়ে তুলেছেন জসীম উদ্‌দীন। দৃশ্যগুলোর মধ্যে সঙ্গী-তের প্রবাহ সঞ্চার করে দিয়ে তিনি সুকৌশলে তাদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছেন। বস্তুত এই নাটকে গানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে গানের সুরে ভর করেই নাটকের কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে জসীম উদ্‌দীনের নিজের উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেনঃ "প্রাচীন গানের আলোক প্রদীপ

জ্বালাইয়া এ কাহিনী রূপলোকের দিকে চলিতেছে।" এই যাত্রাপথে কথোপকথন যেন কাহিনীর অগ্রগতির পরিমাণটা নির্ণয়ের জন্যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ থেমে হিসেব নেয়ার কৌশল মাত্র। নাটকের নরনারীদের স্বপ্নকামনা, ভাবাবেগ, কৌতুকপ্রিয়তা—তাদের চরিত্রের যাবতীয় ক্রিয়াশীলতা ভাষা পেয়েছে ঐ গানের মধ্যেই। 'পদ্মাপার' লোকনাট্যের মতো এখানেও আমরা তাই লক্ষ্য করি গানের সুরেরই প্রাধান্য। অবশ্য লোকনাট্যে সুর-প্রাধান্যই স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ লোক-কবিরা, মন দিয়ে নয়, গান দিয়েই সব জিনিসের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন আপন সৃষ্টিকর্মের সার্থকতা। জসীম উদ্‌দীন লোকনাট্যের এ ট্র্যাডিশন রক্ষা করে চলেছেন সযত্নে।

জসীম উদ্‌দীন এ-লোকনাট্যটি সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন "গ্রাম্য-রূপকথা ও কথন কথার ভাণ্ডার" তাঁর এক অন্ধ দাদার (পিতার চাচা) কাছ থেকে। তিনি নিজেই বলেছেন যে শুধু কাহিনী নির্বাচনেই নয়, এর প্রকাশভঙ্গীতেও তিনি তাঁর দাদার অপরূপ কথন ভঙ্গীটিকে যথা-সাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এ নাটক রচনায় তাঁর দাদার কাছে তাঁর অপরিসীম ঋণের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে তিনি বলেছেন: "এই নাটকের মধ্যে মধুমালার কেচ্ছার পুরাতন গানগুলি যথা সম্ভব রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই গানগুলি সব একই সুরের। সেই পুরাতন সুরের পাখা বিস্তার করিয়া অতীত যুগের ভাবধারা টানিয়া আনিতে প্রয়াস পাইয়াছি।" কারণ তাঁর বিশ্বাস "আমাদের অবচেতন মনে সেই সুর হয়ত আজও বাসা বাঁধিয়া আছে।" আমার মনে হয়, পুরাতন গল্পকথার আবহটি যথাযথ সৃষ্টি করতে হলে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর পন্থা আর থাকতে পারে না। পুরাতন গানগুলো নির্বাচনে জসীম উদ্‌দীন নির্ভুল রসচেতনার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কিছুটা স্বাধীনতাও নিয়েছেন। গানগুলোর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্যে তিনি কয়েকটি নতুন গানও এ-নাটকে জুড়ে দিয়েছেন। বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত 'আসমান সিংহ' লোক-

নাট্যের কয়েকটি গানের সুর তিনি নাটকের দুই তিনটি গানে প্রয়োগ করেছেন। তদুপরি নাটকের ঘটনা বিন্যাসেও কিছুটা নতুনত্ব এনেছেন ঐ 'আসমান সিংহ' লোকনাট্য থেকে কালপরী ও নিদ্রাপরীর কথা-বার্তার প্রসঙ্গটি আমদানি করে। লোকনাট্য 'মধুমালা'য় অনুসৃত ভাষাভঙ্গীটি কিন্তু লোকনাট্যের স্বভাবধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লোক-নাট্যের ভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার আবশ্যকতার প্রশ্নটিকে এই অজুহাতে তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন যে কোন বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্য-ভাষা ব্যবহার করলে তা অন্য অঞ্চলের লোকেরা বুঝতে পারবে না। অতএব সর্বজনবোধগম্য কলকাতা অঞ্চলের ভাষাভঙ্গীকে তিনি শ্রেয়ঃ করেছেন। কিন্তু লোকনাট্যের ভাষায় আঞ্চলিকতা বর্জনের পক্ষে এ যুক্তি যথেষ্ট জোরাল নয় বুঝতে পেরেই তিনি বিনীতভাবে নিজ অসামর্থ্য স্বীকার করে অন্যত্র বলেছেন, "যে সহজ কথাবার্তায় আমাদের লোক-নাট্যগুলি রচিত, আমার রচনায় তাহা সম্যক ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। কারণ অতি সাধারণ কথায় রস সৃষ্টি করার অপূর্ব ক্ষমতা আমার নাই।" কবির আত্মসমালোচনাপূর্ণ এই উক্তি বিনা প্রতিবাদে আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে রূপকথার রস-পরিবেষণটি মুখ্য মনে করায় এবং রূপ-কাহিনী বর্ণিত চরিত্রগুলির স্থানিক ও ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটনের অবকাশ না থাকায়, জসীম উদ্‌দীন ভাষায় আঞ্চলিক রীতি পরিহার করে খুব অন্যায় করেন নি বলেই আমরা মনে করি।

'মধুমালা'র পরে প্রকাশিত হয় জসীম উদ্‌দীনের বিখ্যাত লোকনাট্য 'বেদের মেয়ে'। এটি নানা কারণে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। বলতে গেলে এ নাটকেই জসীম উদ্‌দীন প্রথম বাংলা দেশের লোকজীবনের বাস্তবকে আশ্রয় করেছেন। 'পদ্মাপার' নাটকে বাস্তবজীবনের প্রতিভাস থাকলেও, লোক-জীবন নয়, লোক-মানসেরই একটা অধ্যাত্ম-বিশ্বাসশাসিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। 'মধুমালা' তো নিছক রূপকথা রাজ্যেরই বাসিন্দা। রূপকথার রসলোকের সিঁড়ি বেয়ে সে অবশ্য নেমে এসেছে লোক-জীবনের আঙিনায়। 'বেদের মেয়ে'তেই আমরা সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করি আমাদের পল্লীবাংলার

নর-নারীর স্নেহ-ভালবাসা-সিক্ত অথচ বিয়োগব্যথা-কণ্টকিত জীবনকে। আমাদের বেদে সমাজের একটি বলিষ্ঠ চিত্র হিসেবে এই লোকনাট্যটি বিশেষ মূল্য বহন করছে বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। যদিও এ নাটকে 'চম্পা' নাম্নী এক বেদের মেয়ের ট্র্যাজেডিই মুখ্য বিষয়, তবু ঐ ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নাট্যকার আমাদের বেদে সমাজের একটি বাস্তবানুগ ছবিও উপহার দিয়েছেন। ঐ উপলক্ষে আমাদের সামনে বৃহত্তর বাংলার কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের চেহারার সুস্পষ্ট আভাসও উপস্থাপিত করেছেন লেখক। 'বেদের মেয়ে' নাটকে কোনো বিশেষ ঘটনা নয়, বেদের মেয়ে চম্পার নারী-আত্মার ক্রন্দন ধ্বনিই যেন প্রথম থেকে বেজে ফিরেছে। গয়া বেদেকে নিয়ে সে ঘর বেঁধেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল এক সুন্দর প্রেমস্নিগ্ধ জীবনের। কিন্তু হতভাগিনী নারী তার অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাধ্য হয়েছিল এক গ্রাম্য মোড়লের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। বেদে সমাজের মঙ্গলকে সবচেয়ে কাম্য মনে করে সে ঐ লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিয়েছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে মোড়ল কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সে ফিরে আসে তার পূর্বপ্রণয়ী, স্বামী গয়া বেদের কাছে। গয়া বেদে তখন নতুন বেদেনী নিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে। তাই চম্পাকে গ্রহণ করতে রাজী হলো না স্ত্রীর মর্যাদায়। প্রত্যাখ্যাতা চম্পা এ-অবস্থায় বেঁচে থাকার কোনো অর্থই খুঁজে পায়নি। তাই সে অভিমানে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বিদায়ের আগে সর্পদষ্ট গয়া বেদেকে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়ে সে তার প্রেমের মহিমাকেই স্পষ্ট করে তুলে গিয়েছে। চম্পার ব্যথাহত প্রেমের কান্না গোটা নাটকটিতে একটা চূড়ান্ত লিরিক্যাল আবেগ সৃষ্টি করে সকল চরিত্র ও ঘটনাকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সঙ্গত কারণেই তাই সমালোচক বলেছেন, 'বেদের মেয়ে' নাট্যাকারে রচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি অনুপম গীতি সৌন্দর্যে চিহ্নিত প্রেমের কাব্য।

অন্যত্র যেমন এ-লোকনাট্যেও তেমনি, লোকনাট্যের স্বভাবধর্ম পুরোপুরি বজায় রাখার জন্যে জসীম উদ্‌দীন সংলাপে আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গীকে

পূর্ণমূল্য দিয়েছেন এবং লোকসঙ্গীতের সম্পদও ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। আগেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছি যে এ-নাটক রচনার ব্যাপারে তিনি উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত 'হুমরা বাইদ্যা' নামক লোক-নাট্যের কাছে অনেকটা ঋণী। বিশেষত 'হুমরা বাইন্থা' নাটকের মোড়ল চরিত্রের আদলেই যে তিনি 'বেদের মেয়ে' নাটকের মোড়ল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, এমন আভাস জসীম উদ্‌দীন স্বয়ং 'লোকনাট্য' সম্পর্কিত স্বরচিত একটি প্রবন্ধে দিয়েছেন। 'বেদের মেয়ে' নাটক রচনার ব্যাপারে জসীম উদ্‌দীন যে লোকনাট্য ও গ্রাম্যগানের কাছে বিশেষভাবে ঋণী তা তিনি নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে এটিকে সচেতনভাবে গ্রাম্য তথা লোকনাট্যে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাও স্বীকার করেছেন। প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ "এই নাটককে গ্রাম্য নাটকে রূপান্তরিত করিতে যাইয়া আমি কোন কোন স্থানে প্রচলিত লোকনাট্যের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া এই নাটকের পরিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কয়েকটি গ্রাম্য-গানের প্রথম পদ লইয়া তাহার সঙ্গে নতুন পদ জুড়িয়া দিয়াছি।" মোটকথা একজন সচেতন শিল্পীর মন নিয়েই জসীম উদ্‌দীন লোকনাট্য ও গ্রাম্যগানের উপাদান সমীকৃত করে, গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন ও সংযোজন ব্যাপারে ব্যাপক স্বাধীনতা গ্রহণ করে 'বেদের মেয়ে' লোকনাট্যটি রচনা করেছেন। 'বেদের মেয়ে' নাটকে সংলাপ রচনায় ও চরিত্রচিত্রণে জসীম উদ্‌দীনের সফলতা নিতান্ত সামান্য নয়। জনচিত্তজয়ী এ-লোকনাট্য লোকজীবনশিল্পী হিসেবে জসীম উদ্‌দীনকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে অনেকখানি।

'বেদের মেয়ে'র পর প্রকাশিত 'পল্লীবধূ' নাটকটি জসীম উদ্‌দীনের এই পর্যায়ের চতুর্থ এবং 'বোধহয়' শ্রেষ্ঠ রচনা। 'পল্লীবধূ' পল্লীজীবনের একটি বাস্তব আলেখ্য। পাড়াগাঁয়ে বিবাহাদি ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে যে বিভ্রাট দেখা দেয়, দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি সামান্য কারণে হানাহানি বেধে যায় এবং আবার গাঁয়েরই দু'চারজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের প্রচেষ্টায় অতি সহজেই কেমন করে তার মীমাংসা হয়ে যায়, তারই একটি বাস্তব দৃশ্য 'পল্লীবধূ' নাটকে রূপায়িত হয়েছে। পল্লীর আঞ্চলিক

ভাষার সংলাপে গ্রথিত এ-নাটকটিতে বর্ণিত জীবনদৃশ্যের সজীবতা খুবই উপভোগ্য হয়েছে। নাটকটির কাহিনীর গতিশীলতা, এর ঘটনাপ্রবাহের আকস্মিক মোড় পরিবর্তন এর নাট্যগুণ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। 'পল্লীবধূ' নাটকের প্লটটি জসীম উদ্‌দীন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। তবে নানা কারণে কবির জীবিতকালে নাটকটি রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি; এমনকি পরবর্তীকালে যখন তিনি লোকনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখনও এটিকে প্রথম সৃষ্টির মর্যাদা দিতে পারেন নি। সে যাই হোক, বিলম্বিত হলেও 'পল্লীবধূ' নাটক রচনায় জসীম উদ্‌দীন কবি প্রদত্ত প্লটটি প্রায় হুবহু গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্লটটি বলে দিয়ে এর ট্র্যাজিক ও কমিক দুই পরিণতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও বলেছিলেন। ট্র্যাজিক পরিণতিটিই স্বাভাবিক হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কবি। তবে জসীম উদ্‌দীন সে ইঙ্গিত গ্রহণ না করে সুকৌশলে ঘটনাপ্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে একে শেষ পর্যন্ত কমেডিতেই পরিণত করেছেন। যদিচ ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সম্ভাবনাগুলো দেখাতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হননি।

'পল্লীবধূ' নাটকে বর্ণিত জীবনবৃত্তটি হচ্ছে এইরূপ: গ্রামের ছদন মোড়লের ছেলে আজিম উচ্চশিক্ষা গ্রহণান্তে বহুদিন পর কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরেছে। গ্রাম্যরীতিতেই গ্রামের লোকেরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। যদিচ শিক্ষিত আজিমের কাছে ব্যাপারটা স্থূলরুচির পরিচয় বলেই মনে হয়েছে। সে যাই হোক, দুদিন যেতেই পিতামাতার কাছ থেকে আজিম জানতে পারল, পাশের গ্রামের আলিম মাতব্বরের মেয়ে হাসিনার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা বহুদিন আগেই স্থির হয়ে আছে; এবার আজিম রাজী হলেই তারা কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। নতুন শিক্ষাভিমানী আজিম প্রথমটা গ্রাম্য মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাবটাকে উষ্মাভরে প্রত্যাখ্যান করে। তখন মেয়ের বাবা আলিম মোড়ল অন্যত্র মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে দৈবক্রমে হাসিনার সাথে আজিমের একদিন দেখা হয়ে যায়। যৌবনবতী রূপসী হাসিনাকে দেখে আজিম মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে

ভুল করেছে বুঝে মন খারাপ করে বাড়ি ফেরে। ব্যাপারটা ছদন মোড়লের কানে যায়, তিনি দৌড়ে চলে যান আলিম মোড়লের বাড়িতে এবং তাকে অনুরোধ জানান পূর্ব-প্রস্তাবমত আজিমের সঙ্গে হাসিনার বিয়ে দিতে। কিন্তু আলিম মোড়ল তাতে রাজী হন না, কারণ হাসিনার বিয়ে তিনি অন্যত্র ঠিক করে ফেলেছেন। এই নিয়ে দুই মোড়লের মধ্যে নানা কথা কাটাকাটি হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ রেষারেষিতে পরিণত হয়। ফলে হাসিনার বিয়ে উপলক্ষে দুই গ্রামের মধ্যে দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। শেষপর্যন্ত সরলপ্রাণ হাজী গৈজদ্দি ভূইঞার সময়োচিত হস্তক্ষেপে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যায়। তিনি তার ছেলেকে বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে আজিমের সাথে হাসিনার বিয়ে দেওয়ার জন্য আলিম মোড়লকে আহ্বান জানান। হাজী সাহেবের মর্যাদার প্রশ্ন ভেবে আলিম মোড়ল তাতে সহসা রাজী হন না; কিন্তু ছদন মোড়ল নিজ কন্যাকে হাজী সাহেবের ছেলের সাথে বিয়ে দেবার প্রস্তাব করে সমস্ত ব্যাপারটার একটা সুন্দর ফয়সলার ব্যবস্থা করেন। ফলে আজিম ও হাসিনার বিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকটি বাঞ্ছিত মিলনান্তক পরিণতি লাভ করে। 'পল্লীবধূ' নাটকটির সার্থকতা এইখানে যে এতে গ্রাম্যজীবন-বাস্তবের চমৎকার স্বীকৃতি রয়েছে এবং তাকে শিল্পরূপদানে জসীম উদ্‌দীন অনায়াস ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

'পল্লীবধূ' নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা বোধহয় এই যে জসীম-উদ্‌দীনের যাবতীয় লোকনাট্যের মধ্যে এ-নাটকেই যথার্থ নাটকীয় গুণের সমাবেশ বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বিন্যাসচাতুর্যে নাটকের ঘটনাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে climax-এর চড়া তারে বেঁধে, তারপর সুকৌশলে তাকে প্রসন্ন সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, নাটক সৃষ্টির চাবিকাঠিটি তাঁর ভালোভাবেই হস্তগত হয়েছে। 'পল্লীবধূ' নাটক সৃষ্টি-কলাকৌশলগত বৈশিষ্ট্যেই অন্যান্য লোকনাট্য থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। অন্যান্য লোকনাট্যে জসীম উদ্‌দীন মুখ্যত গ্রাম্যগানের সুরে ভর করে মাঝে মাঝে কথোপকথনের আশ্রয় নিয়ে লোকচিত্ত জয়ের চেষ্টা পেয়েছেন। সেখানে

তিনি গ্রাম্য নাট্যকারদেরই পথানুসারী। 'পল্লীবধূ' নাটকে পারতপক্ষে জসীম উদ্‌দীন গানের আশ্রয় নেননি। এখানে বিশেষ বিশেষ অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আঞ্চলিক ভাষায় বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা করেই আগাগোড়া কাজ চালিয়েছেন। পল্লী-নরনারীর সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ক্রোধের অনুভূতি প্রকাশে তিনি পল্লীর নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গীটিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন বলেই তা আশ্চর্যরূপে বাস্তবধর্মী ও চিত্তস্পর্শী হয়েছে। সরল মৌল আবেগের অধিকারী পল্লী-নরনারীর প্রতিটি চরিত্র স্বল্পাক্ষরে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে নাটকটিতে। দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হতে উদ্যত দুইদল লোকের প্রাথমিক কথার লড়াইয়ের ভাষা নির্বাচনে জসীম উদ্‌দীন 'গ্রাম্য কাইজ্যা'র ভাষার রূপটিকে যথাযথ গ্রহণ করায় ঐ দৃশ্যে আমরা গ্রাম্য-জীবনের সাথে প্রকৃতপক্ষে একেবারে মুখোমুখি হতে পেরেছি। বস্তুত বাস্তব গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাদ-সমৃদ্ধ এই 'পল্লীবধূ' নাটকটি জসীম উদ্‌দীনের একটি মৌলিক লোকনাট্য সৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত হওয়ার দাবি রাখে।

'পল্লীবধূ' লোকনাট্যের শেষে সংযোজিত 'বদল বাঁশী' ও 'করিম খাঁর বাড়ী' শীর্ষক লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা দুটির কথা এখানেই বলে রাখা যেতে পারে। 'বদল বাঁশী' প্রেমেরই একটি সুর: সরলপ্রাণ পল্লীর ছেলে বছির ও পল্লীর মেয়ে বড়ু পরস্পরকে ভালোবেসেও পায়নি মিলনের সুযোগ। সমাজ বিধানে বড়ু বাধ্য হয়েছে পরের ঘর করতে। যদিও বছিরকে ভুলতে পারেনি সে কোনোদিন। আর বড়ুকে হারিয়ে রিক্তপ্রাণ বছির রাতভর বাঁশীর সুরে প্রাণের বেদন নিবেদন করে স্বস্তি খুঁজে ফিরেছে। অবশেষে বড়ুর দাবিতে বাঁশীটি তার হাতে তুলে দিয়ে প্রেমের ভিখারী বছির নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। জসীম উদ্‌দীনের রচনার মনোযোগী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন যে 'বদল বাঁশীতে' তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী'র নাম কবিতার বক্তব্য ও বিষয়েরই প্রতিধ্বনি করেছেন। 'রাখালী' কবিতার প্রেমের সুরটিকেই তিনি এখানে গান ও কথোপকথনের সূত্রে লোকনাট্য হিসেবে রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে এ-

লোকনাট্যে বর্ণিত ঘটনায় তেমন নাটকীয়তা নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ কবি এখানে কোনো বাস্তব ঘটনা নয়, প্রেমের শরে বিদ্ধ দুটি কিশোর-কিশোরীর বেদনাক্লিষ্ট প্রাণের সুরটির প্রতিই মনকে নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তার ভাষা। তবু প্রেমের এই সুর জীবনাশ্রিতই বটে। জসীম উদ্‌দীনের কৃতিত্ব এইখানে যে সীমাবদ্ধ সুযোগ সত্ত্বেও তিনি গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গী ও গ্রাম্য গানের সুর সংযোগে আলোচ্য একাঙ্কিকায় বাস্তব গ্রাম প্রতিবেশের একটা আভাস এনে দিতে পেরেছেন।

'বদল বাঁশী'র পাশে 'করিম খাঁর বাড়ী' সম্পূর্ণ বিসদৃশ সৃষ্টি। এটি নাটক নয়, একটি জীবনদৃশ্যেরই অতি সংক্ষিপ্ত নাট্যরূপ মাত্র। এতে লোকজীবনে উত্থিত একটি অনতিলক্ষ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গেরই একটি ছবি ধরা পড়েছে। একটি মহৎ জীবন ভাবনার অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থিত বলেই এটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবনের সবচেয়ে কাম্যবস্তু হচ্ছে অন্তত একবার মক্কাশরীফে হজ্জ করার সুযোগ পাওয়া। সেই সুযোগ পেয়েও কেমন করে এক গ্রামের মাতব্বর শুধু তার গরীব প্রতিবেশী করিম খাঁর দুঃস্থ পরিবারের সর্বনাশের কাহিনী শুনে হজযাত্রা বন্ধ রেখে হজের খরচের জন্যে নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে সেই দুঃখী পরিবারের দুঃখ মোচনে ব্রতী হলেন, তারই কাহিনী অত্যন্ত দরদ দিয়ে জসীম উদ্‌দীন তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাট্যকণিকাটিতে। ক্ষুদ্রপরিসরে স্বল্পাক্ষরে গ্রাম্য মাতব্বর, মৌলবী সাহেব ও করিম খাঁর মেয়ে এই তিনটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন জসীম উদ্‌দীন সহজ নৈপুণ্যে; মূর্ত করে তুলেছেন একটি গ্রাম্য আবহ। দৃশ্যটি রূপায়ণে জসীম উদ্‌দীন 'মধুমালা' লোকনাট্যের ন্যায় এখানেও আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গীর আশ্রয় না নিয়ে কলকাতার কথ্যভাষা প্রয়োগ করেছেন। লোকনাট্যের মূলগত বৈশিষ্ট্য এতে যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে লোকজীবনের পটেই যে এ-নাট্যদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য সৃষ্টির সর্বশেষ প্রয়াস হিসেবে গণ্য হবে জসীম উদ্‌দীনের 'গ্রামের মায়া' নাটকটি। সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো তাগিদ থেকে এটি সৃষ্টি হয়নি; সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ একটি রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার কার্যের বাহন হিসেবে। আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার লোককল্যাণকর দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন কবি এই নাটকে। দেশের সৎ ও কর্মী যুবকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসতে। দেশ থেকে সকল দুর্নীতি, চোরাবাজারী, কালোবাজারীর পাপ উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে গ্রামের ছেলে নইম, গ্রামের কবিয়াল হানিফ ও তার সঙ্গীরা। তাদের সাথে হাত মিলায় শহরের ছেলে আসলাম ও তার বোন রাজিয়া। তাদের আন্দোলনে বিপদাপন্ন বোধ করে চোরাকারবারী আরজান, পাচারকারী আসাদ প্রভৃতি সমাজের দুশমনরা আর তাদেরই তল্পিবাহক গ্রাম্য মৌলবী কলিম উদ্‌দীন। তারা চক্রান্তে মেতে ওঠে এদের জব্দ করার জন্যে। কিন্তু পারে না। মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন উপলক্ষ করে ম্যাজিষ্ট্রেট আসেন গ্রামে, গণতন্ত্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে। আরজান, আরশাদ গ্রামবাসী-দের প্রতিনিধি সেজে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং ঐ সভায় আসলাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালে, আরজান মুখোস খুলে পড়ার ভয়ে নইম ও আসলামের মতো যুবকদের নিন্দা করে এবং বিদেশীর দালাল বলে তাদের আখ্যা দেয়। কিন্তু তার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর সুযোগ বুঝে হানিফ বয়াতি সেই আসরেই কবিগান বেঁধে চোরাকারবারী আরজান ও আরশাদের কীর্তি ফাঁস করে দেয়। ফলে আরজান ও আরসাদ ধরা পড়ে, এবং তল্পীবাহক মৌলবী কলিম উদ্‌দীনসহ সাজা পায়। এই হচ্ছে মোটামুটি নাটকটির বিষয়বস্তু।

নাটকটির পরিকল্পনায় মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত 'আলকাফ' লোকনাট্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'আলকাফ' নাটকের ন্যায় কতকগুলো সামাজিক সমস্যার কুফলের কথা এ নাটকেও তুলে ধরা হয়েছে। বয়াতির গানের সুরে তার তাৎপর্য অনায়াসেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে লোক-মানসে। সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিকতার স্বীকৃতি নাটকটিকে লোকজীবন-

ঘনিষ্ঠ রচনা করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে কবি এই নাটক-টিকে নিছক প্রচারকার্যের একটি হাতিয়ার করে গড়ে তোলার সজ্ঞান প্রচেষ্টায় এর শিল্প মূল্য অনেক পরিমাণেই নষ্ট করে ফেলেছেন। নাটকে বর্ণিত কোনো কোনো চরিত্রে একটু প্রাণের আভাস এলেও অধিকাংশ চরিত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে যান্ত্রিক, টাইপ ধরনের। মোট কথা নাট্যসৃষ্টি হিসেবে 'গ্রামের মায়া' নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি বলেই মনে হবে।

'গ্রামের মায়া'র পরেও জসীম উদ্‌দীনের আর একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। এটির নাম 'ওগো পুষ্পধনু'। এটি কাব্য-সংলাপে গ্রথিত একটি প্রেমের আখ্যায়িকা মাত্র। 'পুষ্পধনু'র বিচিত্র আকর্ষণে হৃদয়ে প্রেমের যে-তরঙ্গ দোলা উঠে নরনারীকে কিভাবে বিড়ম্বিত করে এই সংসারে, সে-বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির পথই বা কি তারই ইঙ্গিত দিয়ে কবি এই নাটকটি রচনা করেছেন। লোকনাট্যের সামান্য লক্ষণগুলোও এতে উপস্থিত নয়। কিন্তু এই নাট্যগ্রন্থের শেষে সংযোজিত 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজনচরের কাইজ্যা' নামক ক্ষুদ্র একাঙ্কিকাদ্বয় নিঃসন্দেহে লোকনাট্য-লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমটিতে তথাকথিত ভদ্র ও বিত্তবান সমাজের মানুষের হৃদয়হীনতার পটভূমিতে গ্রাম্য সরল, দরিদ্র মানুষের আর্ত অসহায়তার ছবিটিই ফুটে উঠেছে। রুগ্ন ছেলের ঔষধ জোটাতে পারেনি দরিদ্র পিতা। তার শেষ সম্বল দিয়ে সে ডাক্তারকে বাড়িতে আনার চেষ্টা পেয়েছে। তবু হৃদয়হীন ডাক্তার সময়মতো আসেনি। ফলে প্রকৃতপক্ষে বিনা চিকিৎসায় ছেলেটি তার মারা গেল। এই মর্মান্তিক জীবনদৃশ্যের অভিনয় পল্লীর ঘরে ঘরে কতই না চলছে। জীবন এখানে বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। শুধু অর্থমূল্যেই চলছে তার বেচাকেনা। এই অতি নির্মম সমাজ সত্যটিই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। বিষয়ের সর্বজনীন সামাজিক আবেদন একাঙ্কিকাটিকে লোকনাট্যের গণ্ডী থেকে একটু দূরেই সরিয়ে এনেছে। তবু এতে আমাদের দেশের লোকজীবন-বাস্তবই মর্যাদা পেয়েছে স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয় একাঙ্কিকা 'গাজন চরের কাইজ্যা', 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের চরের জমির ফসল-কাটা নিয়ে

দাঙ্গার দৃশ্য অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নায়ক রূপা, নায়িকা সাজু ছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র চরিত্র এতে ভিড় করেছে। গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গী সর্বত্র অনুসৃত হওয়ায় লোকনাট্যের স্বভাবটি এতে বেশী করে ধরা পড়েছে। 'গ্রাম্য কাইজ্যা, ঝগড়া-ফ্যাসাদের ভাষা দাঙ্গারত দুই পক্ষের মুখে অপূর্ব স্ফূর্তি লাভ করেছে। গ্রাম্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা, সহজ জীবন-প্রীতি, গ্রাম্য রসিকতা সব কিছু নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসর একাঙ্কিকাটি লোকজীবনের একটি উজ্জ্বল আলেখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

জসীম উদ্‌দীনের লোকনাট্য-সাধনা এখানেই এসে থেমেছে। লোক-নাট্যের নতুন ধারাশ্রয়ে লোকজীবনকে নিবিড়তর করে জানা, চেনা ও বোঝার যে চেষ্টা তিনি করেছেন তা যে বহুল পরিমাণেই সার্থক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর কাব্যের ন্যায় তাঁর লোকনাট্যগুলোর জনপ্রিয়তা এই সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়।

শিশু-সাহিত্যিক জসীম উদ্‌দীন

পল্লীকবি অভিধার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে জসীম উদ্‌দীনের অন্য সব পরিচয়। সেটা তাঁর সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য জানি না। তবে বাংলা শিশু-সাহিত্যের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন, জসীম উদ্‌দীনের ঐ পরিচয় অসম্পূর্ণ। শিশু-সাহিত্যিক জসীম উদ্‌দীনকে অস্বীকার করে 'পল্লীকবি'র শিল্পী পরিচয় কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ তাঁদের মতে, 'রাখালী', 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এর মত পল্লীচিত্র-সমৃদ্ধ কাব্য রচনা করে একালের নাগরিক মানুষের হৃদয় তিনি জয় করেছেন যেমন অনায়াসে, তেমনি অনায়াসে বাংলাদেশের অগণিত শিশুর চিত্ত জয় করেছেন তিনি 'হাসু' ও 'একপয়সার বাঁশী'র মত শিশু-কবিতার বই লিখে এবং 'ডালিমকুমার', 'বাঙালীর হাসির গল্প'-এর মত প্রাণমাতানো রূপকথা ও কৌতুকরসে ভরপুর গল্পের ঝাঁপি উপহার দিয়ে। এ দুইয়ের কোনটাই তাঁর কম কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে না। এমন অবস্থায় শিশুসাহিত্যিক জসীম উদ্‌দীনকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে, তাঁর 'পল্লীকবি' পরিচয়টিকে সার করে তুল্‌লে, তা কখনই তাঁর শিল্পী-সত্তার যথার্থ পরিচয় বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। বস্তুত শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব রীতিমত ঈর্ষার বস্তু। শিশুচিত্তে সাড়া-জাগানোর ক্ষমতাই যদি শিশুসাহিত্যের সার্থকতার পরিমাপক হয়, তা হলে একথা বল্‌তেই হবে যে জসীম-উদ্‌দীনের মত ভাগ্যবান শিশু-সাহিত্যিক খুব কমই আছেন। 'পল্লী-কবির' প্রশংসায় মুখর আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই এই ভাগ্যবান শিশু-

সাহিত্যিককে ভুলতে বসেছি। কারণ তাঁর পক্ষ নিয়ে আজও কেউ সত্য কথা বল্‌তে এগিয়ে আসেন নি।

শিশু-সাহিত্যিক জসীম উদ্‌দীনকে নিয়ে তাই ভাববার সময় এসেছে। শিশুদের জন্যে তিনি প্রচুর লেখেন নি। সব সময়ও লেখেন নি। লিখেছেন মাঝে মাঝে, রয়ে সয়ে, ভেবে চিন্তে। কিন্তু যে-টুকু লিখেছেন, যা লিখেছেন, তা যে অনেকটাই সোনার মত খাঁটি, তাতে সন্দেহ নেই। ছড়া কেটে, গল্প বলে শিশুদের সাথে ভাব জমিয়ে অনায়াসে বয়সের বেড়াটা দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের সাথে হাস্য-কৌতুকে মেতে উঠতে বাধে না তাঁর। তাই তিনি সহজেই হয়ে ওঠেন তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই অন্তরঙ্গতাই তাঁকে দিয়েছে শিশুমনে প্রবেশের সহজ ক্ষমতা। এর ফলে শিশুর প্রতি এক অপূর্ব সহমর্মিতা বোধের অধিকারী হয়েছেন তিনি। এই বোধই তাঁকে মানবশিশুর জীবন সত্যকে যথার্থ রূপে অনুধাবনে সাহায্য করেছে। এই বোধ ছিল বলেই তিনি শিশুদের আনন্দ দানের জন্যে ছড়া, রূপকথার বল্গাহীন কল্পনার রাজ্যে খেলাঘর রচনায় আগ্রহী হয়েও কখনই ভুলতে পারেন নি যে তারাও বাস্তবজগতের অধিবাসী, প্রাত্যহিক জীবনের কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করে চলছে অসহায়ের মত। সেই জন্যেই তো দেখি 'গল্পদেশের কল্পনদীর তটে' আসন পেতেই তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। মাঝে মাঝে ছুটে গিয়েছেন 'নিমতলীর গলিতে', 'রহিমদ্দির বাড়ী রসুলপুরে। খোস্‌মানীর খুশি মুখের পাশেই তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে আসমানীর বেদনাদীর্ণ মলিন মুখটি। তবু শিশুর জন্যে তিনি হিসেবের জগতটা কাম্য মনে করেন নি কখনই; কারণ ওটা যে তার মনের স্বাস্থ্য-বিরোধী! বেহিসেবের বেপরোয়া কল্পনার জগতে শরতের মেঘের মত মুক্তির আনন্দে যথেচ্ছ ছুটে বেড়ানোতেই যে তার স্বভাবের স্ফূর্তি ঘটে বেশী, এ সত্য তিনি বিস্মৃত হন নি। তাই সকল শিশুর জন্যেই তিনি বাস্তব-জীবনের 'অন্ধকারা' থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন। মোটকথা শিশুদের কথা ভাবতে গিয়েও তিনি শিল্পীসুলভ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্যুত হন নি। আর এই জন্যেই শিশুসাহিত্যিক

জসীম উদ্‌দীন একজন বড় শিল্পীরূপে গণ্য হওয়ার দাবি রাখেন। বলাবাহুল্য, বড় শিল্পীর ন্যায় শিশুসাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রেও তিনি ভাষা, ছন্দ ব্যবহারে অনায়াস নৈপুণ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী।

শিশু-সাহিত্য-রচনায় জসীম উদ্‌দীন যে অনায়াস সার্থকতার অধিকারী হয়েছিলেন, তার পিছনে গূঢ় কারণ বর্তমান রয়েছে। শিশুদের জন্যে লেখা শুরু করেছিলেন তিনি বিশেষ এক আন্তর প্রেরণায়ঃ কোন সখ বা খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে নয়। জীবনস্মৃতি-বর্ণন প্রসঙ্গে শিশুদের জন্যে কবিতা লেখার প্রেরণা তিনি কোথায় পেলেন, তা তিনি অকপটেই ব্যক্ত করেছেন। একটি শিশুর প্রতি কবির সদাজাগ্রত স্নেহ-ব্যাকুলতা কেমন করে কবিতা হয়ে ঝরে পড়েছে, তারই প্রমাণ শিশুদের জন্যে রচিত জসীম উদ্‌দীনের প্রথম কবিতার বই 'হাসু'র কবিতাগুলো। কবি একবার শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাসায় কয়েকদিনের জন্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্পের আসর জমিয়েছিলেন। ঐ সময়ই হাসু নামক শিশুটির সাক্ষাৎ পান তিনি। পাঁচ ছয় বছরের এই শিশু মেয়েটির করুণ মমতা-মাখানো মুখখানি দেখে কবির হৃদয়ের সুপ্ত বাৎসল্য স্নেহ কেমন যেন গুঞ্জরণ করে উঠেছিল। তিনি এক অপরূপ স্নেহ-ব্যাকুলতা বোধ করলেন হাসুর জন্যে। কেমন করে হাসুকে খুশী করা যায় তাই হয়ে উঠল তাঁর দিনরাত্রের চিন্তা। অনেক ভেবে তিনি ঐ একটি পথই খুঁজে পেয়েছিলেন—ছড়া কেটে, ছন্দে ভরে কথা বলে হাসুর সাথে আলাপ জমানোর পথ। বছরের পর বছর ধরে এই আলাপ চলেছিল; তাতে ছেদ পড়েছিল ঠিক তখনই যখন বয়সের দরজা দিয়ে একদিন সেই শিশুটি পালিয়ে গেল তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে। ছড়া কেটে, ছন্দে গেঁথে হাসুর সাথে এই যে কবির আলাপ জমানোর প্রয়াস, তারই ফল হল জসীম উদ্‌দীনের প্রথম শিশু-কবিতার বই 'হাসু'।

'হাসুর' কবিতাগুলো প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিশুমন জয় করতে পেরেছিল। একটি কথা এখানে উল্লেখ্য যে পঁচিশটি কবিতা ছাড়া একটি ছড়ার গল্পও 'হাসু'তে স্থান পেয়েছে। এতে ছন্দ-পতন হয়েছে, মনে

করবার কোন কারণ অবশ্য নেই। কারণ ছড়ার গল্পটিত গল্প নয়, ছড়া কেটে শিশুকে মুগ্ধ করা, আনন্দ দান করাই কবির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে। এক সঙ্গে অনেক ছড়া কাটতে গিয়ে গদ্যকথার সুতোয় জুড়ে একটা ছড়ার মালাই তিনি রচনা করে বসেছেন, গল্প নয়। এ সত্যটি কোন মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। 'হাসু'র এক একটি কবিতা কবির হৃদ্‌কমলের এক একটি দল বা পাপড়ির মত, স্নেহের উত্তাপ পেয়ে একে একে নিজেদের যেন মেলে ধরেছে। আর এইখানেই তাদের জিত। তারা অনায়াসে শিশুর হৃদয়ে স্থান জুড়ে বস্‌তে পেরেছে। বলা বাহুল্য 'হাসু'র জগৎ বয়স্কদের ছক-মেলানো চুল চেরা হিসেবের জগৎ নয়, বা ভূগোল ইতিহাসের সীমানা-দ্বারা চিহ্নিত জগৎ নয়; রূপকথার 'ছায়ালোক ধরে তা অনন্তের দিকে প্রসারিত'। এখানে তাই সম্ভবে-অসম্ভবে কোলাকুলি চলে অবাধে। এখানে মনের আকাশের রঙ পালটায় বড় তাড়াতাড়ি। তাই সবকিছুর অবস্থা, এই আছে, এই নেই। শিশু এখানে স্বরাট! সীমানার মানা নেই বলেই সে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে ছুটে চলে যেমন খুশি, তেমন-খুশির দেশে। সেখানে রাজার কুমার, রাজার কুমারী যেমন তাকে আকৃষ্ট করে, তেমনি করে খেলার পুতুল, আরশুলা, নেংটি ইঁদুরটা পর্যন্ত। কখন কাকে মনে ধরে যায় বলা যায় না তো! জসীম উদ্‌দীনের শিশুরা সীমানার বেড়া ডিঙিয়ে চল্‌তেই অভ্যস্ত বটে; তাই বলে সীমানার মধ্যে তারা কখনও ধরা দেয় নি, তা কিন্তু বলা চল্‌বে না। তাই যদি হবে, তা হলে মাঝে মাঝে তাকে পল্লীর আম কাঁঠা-লের বন, খেজুর গাছ, শিমূল গাছ, পদ্মপুকুর ইত্যাদির সন্ধান পেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখি কেন? কেনই বা তাকে দেখি গাঁয়ের জেলে বছিরউদ্দির খবর নিতে, নিমতলীর গলিতে গিয়ে তার শিশু-বন্ধুটির খোঁজ করতে, ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদুল হকের তত্ত্ব-তালাস করতে? শুধু কি তাই? পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া শিশু বোন্‌টির কবরে বসে দু ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌তেও দেখি তাকে; আবার প্রসঙ্গান্তরে তাকেই দেখি কৌতুক-উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে 'আত্মারামের

ঠান দি' আর 'জগার আজী নেত্যকালীর' এক ক্লাসের ছাত্রী হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় !

মোট কথা 'হাসু'র শিশুর জগত বাস্তব থেকে রূপকথার জগতের দিকে প্রসারিত হয়েছে; আবার রূপকথার জগত থেকে বাস্তবের সমভূমিতে এসে ঠেকেছে বার বার। তাই দেখি তাঁর কাব্যে রাজপুত্তুর, চাঁদের বোন উদয় তারা, কমলাবতী মেয়ে যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি পেয়েছে 'বুবুহারা' ছোট ছেলেটি, পেয়েছে নূরন্নাহার নামে ছোট্ট মেয়েটি যার—পোষা মুরগীটিকে জবাই করা হয়েছে শুনে সে কেঁদেই অস্থির, পেয়েছে মামার বাড়ী যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত ছোট একটি খোকা, পেয়েছে জন্মদিনের নিষ্ঠুর কৌতুকের শিকার দীপালি নামক মেয়েটি! জসীম উদ্‌দীন অবলীলায় শিশুকে নিয়ে গিয়েছেন কল্পনার রামধনু-লোকে, আবার সেখান থেকে নামিয়ে এনেছেন আমাদের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনায় গাঁথা ঘরের কোণে! এ দুইলোকে তিনি যথেচ্ছ ভ্রমণ করেছেন ছড়ার নৃত্যচপল ছন্দে ভর করে, মিষ্টি কথার ঝুমঝুমি বাজিয়ে। দু-এক জায়গায় বেসুরো ঠেকলেও ছন্দ কথার কলপ্রবাহে তা শেষ পর্যন্ত মানিয়ে গিয়েছে।

'হাসু'র বেশ কিছু কাল পরে প্রকাশিত হয় শিশুদের জন্যে লেখা জসীম উদ্‌দীনের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ কবিতার বই 'এক পয়সার বাঁশী'। সতেরটি সুখপাঠ্য কবিতার সংকলন এ কাব্যেও কবি শিশুকে নিয়ে শুধু কল্পনার জগতে রামধনু পাখা মেলে বিচরণ করেন নি, তাকে বাস্তব প্রতিবেশেও প্রত্যক্ষ করেছেন। সমাজ-বাস্তবের কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত অসহায় শিশুর ম্লানমুখ তাঁকে ব্যথিত করেছে সবচেয়ে বেশী। এক পয়সার বাঁশীতে সে ব্যথার সুর বেজে উঠেছে বার বার। তবু শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার পবিত্র কর্তব্য তিনি কখনই বিস্মৃত হন নি। নামকবিতা 'এক পয়সার বাঁশী'তে দেখতে পাচ্ছি কবি তাঁর অতি আদরের স্নেহের শিশুবন্ধুটির হাতে তুলে দিচ্ছেন একটি এক পয়সার বাঁশী। এই বাঁশীটি আসলে সাম্যের বাঁশী—যা কৃত্রিম আভিজাত্যের বেড়ি থেকে

তাকে মুক্তি দিয়ে সর্বহারা, রিক্ত শিশুদের জীবনের শরীক হতে প্রেরণা দিবে। ঐ প্রেরণাতেই কবি লিখেছেন গরীবের মেয়ে আসমানীর কথা, যার 'জীর্ণ পাঁজর বুকের মাঝে' তিনি শুনেছেন দারিদ্র্যের হাহাকার; লিখেছেন সেই খোকার কথা যে মায়ের নিষেধ না মেনে অবলীলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের মধ্যে আর্তকে বাঁচানোর জন্যে, রাত জেগে সেবা করে রোগীর; লিখেছেন গরীব চাষীর মেয়ে ছদন শেখের কন্যার কথা, অনাহারে যার বাপ-মা দুই জনই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে; লিখেছেন নগরের অন্ধগলির বদ্ধ কারায় বন্দিনী গ্রামের মেয়ে পূর্ণিমার কথা। তবু কবি ভুলতে পারেন নি যে শিশুদের একটি নিজস্ব জগত আছে; সেখানে ওরা মুক্তির আনন্দে ছুটে বেড়াতে চায় কল্পকথা গল্পকথার দেশে রামধনুতে সওয়ার হয়ে, যেখানে অরুণ বরুণ ভাইটি তার ঘোড়ায় চড়ে 'সাত সমুদ্দুর পার' হয়ে হাজির হয় এসে 'মরুর গায়', যেখানে তার সাধ জাগে 'লাউয়ের নায়ে সোয়ার হয়ে আকাশ পাড়ি দিতে' অথবা 'জলের দেশের জলকুমারী মেয়ের কেশের মাঝে মাছের নাচন দেখবার'। এই শিশুদের মধ্যে আছে একদল যারা গল্পপাগল, একে ওকে ধরে গল্পশোনাই যাদের কাজ। আবার আছে যারা একদম ঘর-কুনো, লাজুক; মুখফুটে কথাটি পর্যন্ত বলতে চায় না। এ ছাড়াও আছে হরিণীর মত চঞ্চল দুষ্টু মেয়ে—যে 'এধার এধার সেধার দিয়ে ঠিকরিয়ে যে পড়ে', যাকে সামলাতে গিয়ে বাপ-মা রীতিমত হয়রান। এদের সবাইর হয়েই কথা বল্‌তে চেয়েছেন জসীম উদ্‌দীন—এদের তিনি গল্প বলে, ছড়া কেটে আনন্দ দিতে চেয়েছেন, কখনও বা একটা উপলক্ষ পেলেই এদের নিয়ে হাস্য কৌতুকে মেতে উঠেছেন, আবার কখনও বা এদের জন্যে দুঃখ শোষণমুক্ত এক সুন্দর জগতের বার্তা বয়ে এনেছেন, বাস্তব জীবনের ক্লিন্নতা থেকে তাদের মুক্তিপথের নির্দেশনা দিয়েছেন। 'এক পয়সার বাঁশী'তে তাই দেখ্‌ছি কবি নানান সুরের আলাপন করেছেন। সেই সুর রূপকথা ও বাস্তবের রাজ্যের মধ্যে অবলীলায় পদচারণা করেছে!

'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশী'—এই দুটো কবিতার বই ছাড়া একান্ত করে শিশুদের জন্যে জসীম উদ্‌দীন লিখেছেন দুটি গল্পের বই। একটি রূপকথার বই, নাম 'ডালিমকুমার'। অপরটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত অজস্র মজার, হাসির গল্পের সংকলন। দুটির কোন-টিতেই জসীমউদ্‌দীন কোন-প্রকার মৌলিকতার দাবী করতে পারেন না। তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব সব রয়েছে গল্পগুলোকে শিশুদের উপযোগী করে সরস সহজ ভাষায় পরিবেশন করার মধ্যে। সেখানে তাঁর সার্থকতা যে অসামান্য তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। ডালিমকুমার-এর প্রসিদ্ধ রূপকথাটি তিনি রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত গাজীরগানের ঢঙে পরিবেশন করেছেন; কথার সূত্রে গানের মালা গেঁথে গল্পবলার রীতিটির সার্থকতা এতে ভালভাবেই প্রতিপন্ন হয়েছে। এর পর আসে দুইখণ্ডে প্রকাশিত 'বাঙালীর হাসির গল্প'গুলির কথা। প্রথমখণ্ডে ২৭টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ২৪টি মোট একান্নটি গল্প স্থান পেয়েছে সংগ্রহ গ্রন্থটিতে। গল্পগুলো সবই জসীম উদ্‌দীন সংগ্রহ করেছেন কর্মোপলক্ষে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ কালে বিভিন্ন গল্পকথকের মুখ থেকে। এসব গল্পের লোকগল্পের যা সাধারণ চরিত্র—মানুষ, পশু, পাখীর অবলীলাক্রমে পরস্পরের সাথে সখ্য স্থাপনের ক্ষমতা—যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষিতব্য নীতিকথা বলার প্রয়াস, কোথাও বা লোকচরিত্র উদঘাটনের মানবিক আকাঙ্ক্ষা। সব গল্পেই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা হচ্ছে গল্পগুলোর শ্রোতাদের আনন্দ বিধানের জন্যে অবিমিশ্র কৌতুক রসের যোগান দেওয়া। এই গল্পগুলো গ্রাম অঞ্চলে ছেলে বুড়ো সবাই একজায়গায় বসে উপভোগ করে। জসীম উদ্‌দীন অবশ্য এদের বিশেষ করে শিশুদের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি 'টুনটুনীর বই'-এর বিখ্যাত লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছেন।

কবিতার ন্যায় গল্পবলার ক্ষেত্রেও জসীম উদ্‌দীন অনায়াস সাফল্যের অধিকারী হয়েছেন, বক্তব্য প্রকাশের একটি অতি ঋজু ভঙ্গীর গুণে। বলাবাহুল্য এই ঋজুতা রয়ে গিয়েছে তাঁর শিল্পীস্বভাবের মধ্যে। পল্লীর সন্তান তিনি—স্বাভাবিক জীবন-পারিপার্শ্বে'র উত্তরাধিকার সূত্রেই তাঁর

শিল্পীসত্তা আবাল্য পুষ্টি লাভ করেছে, ছড়া, প্রবাদ, রূপকথা ইত্যাদির প্রায় নৈসর্গিক রসসৃষ্টি থেকে রসগ্রহণ করে। এর ফলে লোক মানস, তথা শিশু-মানসে, প্রবেশের একটা সহজাত ক্ষমতা তাঁর জন্মেছিল। এই ক্ষমতা পল্লীজীবনভিত্তিক তাঁর কাব্যে যেমন সক্রিয় দেখি, তেমনি দেখি তাঁর শিশুদের জন্যে রচিত বইগুলোতেও। জসীম উদ্‌দীনের অকৃত্রিম কবিত্ব-বোধ, সংবেদনশীল হৃদয় ও মানবচরিত্রে স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি অন্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিশুসাহিত্য রচনায়ও তাঁকে সার্থকতা অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ছড়া, প্রবাদ, রূপকথার রাজ্য থেকে রচনার নানা উপকরণ সংগ্রহ করে এমন এক ধরণের শিশুসাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন যা আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান, যা কখনও অন্য কারো রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না। শিশুদের জন্যে রচিত তাঁর কবিতা ও গল্পে এই একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, সেখানে রূপকথা প্রায়শঃই বাস্তবের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে অথবা উলটো করে বলা চলে যে বাস্তব সেখানে শিল্পীর কল্পনাগুণে রূপকথার সীমান্ত ছুঁয়ে গিয়েছে। তাই এই সীমান্তের অধিবাসী শিশুদের কাছে তাঁর কবিতা ও গল্পের আবেদন যথেষ্ট হয়েছে। এসব দেখে শুনে কেউ যদি রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়, সুকুমার রায়, নজরুল ইস্‌লাম, সুনির্মল বসু প্রভৃতি কীর্তিমান শিশু সাহিত্যিকদের সাথে জসীম উদ্‌দীনের নামটিও উচ্চারণে উন্মুখ হয়ে ওঠেন, তা হলে সেটা বোধ হয় রসিকজনের উপযুক্ত কাজই হবে।

বাংলা কাব্য-সমালোচনার পথিকৃৎ ঃ
হরচন্দ্র ও রঙ্গলাল

প্রথাবদ্ধ ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসনের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে মানুষের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে সমালোচক মনের অস্তিত্ব বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেব আনীত ভাব-বিপ্লবের ফসল প্রথম যুগের পদাবলীতে যে স্বাধীন মনের পক্ষ-বিধুনন শোনা গিয়েছিল, তাও অচিরেই নতুন প্রথার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে পক্ষ গুটিয়ে নিয়েছিল। তাই দেখি বৈষ্ণব মহাজনগণ-কৃত পদাবলীর রসভাষা নির্মাণ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রীদের নন্দনতাত্ত্বিক নীরস সূত্রভাষ্য বিশ্লেষণাদির অনুবর্তনেই পর্যবসিত হয়েছে। রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তি-রত্নাকর' ইত্যাদি গ্রন্থে বৈষ্ণব প্রেম-ভক্তিবাদ পণ্ডিতী শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় আপন সমর্থন খুঁজে ফিরেছে। একমাত্র 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে কিছুটা স্বাধীন মনের সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যায়। 'মণি'কার তাতে প্রেমপথিক নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে এবং প্রেম ভাবনার স্তরপারম্পর্য প্রদর্শনে সুগভীর বাস্তববোধ ও মনীষার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভক্তিরসে সিক্ত পাঠক হৃদয়ে 'উজ্জ্বলনীলমণি' আর একটি 'ভক্তি রসামৃত-সিন্ধু'র মর্যাদাই লাভ করেছিল। মধ্যযুগের শেষে ভারতচন্দ্র তাঁর 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এটি কোন স্বাধীন রচনা নয়; ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের সংস্কৃত পণ্ডিত ভানুদত্তের উক্ত-নামীয় গ্রন্থেরই

স্বচ্ছন্দ অনুবাদ মাত্র। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতচন্দ্র আর একবার রসবাদী সমালোচনার দ্বার খুলে দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, বাংলাকাব্যের পাঠকদের জন্য। সংস্কৃত রসবাদী-সমালোচনার এই অনুবর্তন প্রচেষ্টাও কিন্তু বাংলা সমালোচনার জন্যে নতুন কোন সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয় নি। কারণ সকল বিচার-বুদ্ধির পরিপন্থী ধর্মীয় সংস্কার ও আবেগ-বিহ্বল মানসিকতা আমাদের চিন্তাশক্তিকে এতটাই পঙ্গু করে ফেলেছিল যে কোন কিছু নতুনের ইশারা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের ছিল না। মোট কথা মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় আমাদের সাহিত্যবিবেক একেবারেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। বৈষ্ণব মহাজনদের ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠের আহ্বানে যেমন তার জড়তা কাটেনি' তেমনি ভারতচন্দ্রের সোচ্চার ঘোষণা 'যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে', তাকে উচ্চকিত করে তোলেনি।

বাঙালীর সাহিত্য-বিবেক তথা সমালোচনী বুদ্ধির জাগরণের জন্যে তাই কালান্তরের অপেক্ষা ছিল। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচণ্ড অভিঘাতে সেই কালান্তরের বাণী যখন বজ্র-নির্ঘোষে উচ্চারিত হল, তখন সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিল না। অপ্রতিরোধ্য সে-আহ্বান আধুনিক যুগপ্রবৃত্তির ঝড়ো হাওয়া রূপে আমাদের বন্দী মনের অন্দর মহলে প্রবেশ করে আমাদের সমগ্র চেতনাকে এমন করে নাড়া দিয়ে গেল যে আমরা এক নতুন প্রাণাবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে মুহূর্তে যুগ-যুগাচরিত প্রথাবদ্ধ ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসনের বশ্যতা অস্বীকার করে সরাসরি জীবন-বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার প্রচণ্ড তাগিদ বোধ করলাম। আমরা সর্বপ্রথম অলৌকিক ও আধিদৈবিক দুঃস্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবের সুস্থ মানবচেতনার উপকূলে জেগে উঠলাম, জানলাম 'এ জগত স্বপ্ন নয়'। একে এক ধরনের আত্মাবিষ্কারই বলা চলে। এই আত্মাবিষ্কার সূত্রেই বাঙালী তার সহস্র বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সব কিছু দেখে শুনে যাচাই করে গ্রহণ করার প্রবৃত্তি অর্জন করল। আর তারই ফলে তার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনেই শুধু নয়,

ভাব জীবনেও ঘটল এক সুমহান বিপ্লব। এই ভাববিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন নানাবিধ নতুন সৃষ্টিকর্মে ঘটল বাঙালী মনীষার বিস্ময়কর প্রকাশ, অন্যদিকে তার মধ্যে জাগ্রত হল আত্মসমীক্ষণ ও আত্মসমালোচনার এক ঐকান্তিক তাগিদ। উনিশ শতকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ-লগ্ন থেকেই তাই বাঙালীর সমালোচক বুদ্ধিকে উন্মত দেখতে পাই। গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের বিকাশধারার সাথে সঙ্গতি রেখে এই সমালোচনী বুদ্ধি ক্রমবিকশিত হয়ে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে তার বর্তমানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা-ভূমি দান করেছে। বাংলা-সাহিত্যের আবেদন তাই আজ আবেগের উপরি স্তর থেকে জীবন-চেতনার গভীরে প্রসারিত হয়েছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর সমালোচনী বুদ্ধিকে প্রথম ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে দেখি উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে পুস্তক সমালোচন প্রয়াসের মধ্যে। সমাচার দর্পণ, Friend of India প্রভৃতি পত্রে পুস্তক পরিচয়ের আকারে যে সাহিত্য-সমালোচনার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল, তা ছিল অস্ফুটবাক্। বাংলা গদ্যের ক্রম বিকাশের সাথে ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা যতই বেড়ে যেতে লাগল, ততই সমালোচক কণ্ঠও শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বের শুরু থেকে সাহিত্যিক সঞ্চয় যতই বাড়তে লাগল, ততই সমালোচনা কর্মে শিক্ষিত বাঙালীর ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দেখা যেতে লাগল। তাঁরা সমসাময়িক সাহিত্য-কর্মই শুধু নয়, পুরাতন বাংলা-সাহিত্যের মূল্যায়নেও উৎসাহী হয়ে উঠলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কিত যা কিছু সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠ অংশটাই রচিত হয়েছিল ইংরেজী ভাষায়। প্রথমে 'Friend of India' এবং পরে 'Calcutta Review' পত্রিকা ইংরেজীতে লিখিত বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করে এ ক্ষেত্রে যথার্থ পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল। তুলনায় বাংলা পত্রিকাগুলোর ভূমিকা ছিল খুবই দুর্বল। উন্নতমানের সমালো-

চনার অভাব এবং নব্য শিক্ষিতদের প্রাথমিক উপেক্ষা বাংলায় সমালোচন কর্মের বিকাশের প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার আদিপর্বে ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলোর ভূমিকা তাই খুব মূল্যবান ছিল। কারণ তৎকালীন নব্যশিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য-শিক্ষার মাধ্যমে যে উচ্চ-সাহিত্যিক রসজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন, তা প্রকাশে স্বভাবতই ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করতেন। বাংলা ভাষার শক্তি ও সীমা সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ সন্দিহান ছিলেন। সে যাই হোক, ইউরোপীয় সমালোচনার উন্নত আদর্শে ইংরেজী ভাষায় বাংলা কাব্য-সমালোচনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী বাংলা সমালোচনার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। বাংলায় তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টান্ত এঁরাই স্থাপন করেন সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় বাংলা কাব্যের দৈন্য ও সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে। ১৮৪৪ সাল থেকে দীর্ঘকাল ধরে 'Calcutta Review' পত্রিকা ইংরেজীতে বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করে এবং সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করে ভবিষ্যতের বাংলা সমালোচনার জন্যে যথার্থ আদর্শ উপস্থাপিত করে খুবই মূল্যবান কাজ করেছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশের পরেও দীর্ঘদিন 'Calcutta Review' এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান জুগিয়ে চলেছিল। বাংলা সমালোচনার ইতিহাস তাই 'Friend of India' ও 'Calcutta Review'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করে কখনই সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

বস্তুত বাংলা সমালোচনার পথিকৃতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছিলেন প্রথম যুগের কতিপয় ইংরেজীভাষী প্রাচ্য সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী এবং তাঁদেরই ভাবশিষ্য নব্য শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা। দেশীয় বিত্তার অধিকার নিয়ে যেখানে বাংলা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা রসবাদী সংস্কৃত-সমালোচনার ঢেকুর তোলা ছাড়া নতুন সাহিত্যের জন্যে আর কোন সুষ্ঠু সমালোচনার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হননি, সেখানে পাশ্চাত্য

শিক্ষাজনিত উন্নত রসজ্ঞানের অধিকারী নব্যশিক্ষিত বাঙালী ইংরেজীতে অবলীলায় তা করতে পেরেছিলেন। বাংলা কাব্য-সমালোচনার আদি পর্বে এ বিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন কলকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবারের সন্তান হরচন্দ্র দত্ত। ১৮৫২ সালের জানুয়ারী সংখ্যা 'Calcutta Review' তে 'Bengali Poetry' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে পূর্ণাঙ্গ বাংলা কাব্য-সমালোচনার যে প্রশংসনীয় উদ্যম তিনি দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁকে বাংলা কাব্য-সমালোচনার পথিকৃতের গৌরব অবশ্যই দিতে হয়। হরচন্দ্রের আগে কি ইংরেজী, কি বাংলায় বাংলা কাব্য নিয়ে এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা আর কেউ করেছেন বলে আমরা জানি না। বাংলা কাব্য-সমালোচনার আদি পর্বের ইতিহাস-সম্পর্কে উৎসুক পাঠকের অবগতির জন্যে আমরা হরচন্দ্রের প্রবন্ধটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখছি।

হরচন্দ্র যখন বাংলা কাব্য-সমালোচনায় ব্রতী হন, তখন ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্য-গগনে উদীয়মান জ্যোতিষ্ক। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্রের আবির্ভাব তখনও প্রতীক্ষিত। বাঙালীর সাহিত্যিক রুচি তখনও পুরোপুরি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকূল হয়ে ওঠেনি। মুকুন্দরাম, বিশেষতঃ ভারতচন্দ্র তখনও কাব্যরসিক বাঙ্গালীর একটা বিরাট অংশের মনে প্রবল প্রতাপে সমাসীন। কবিওয়ালাদের বাগ্‌বিস্তারের স্বভাব-পটুত্ব সাধারণ্যে তখন ব্যাপকভাবে সমাদৃত। হরচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা কাব্য আলোচনাকালে তাঁর সামনে আদর্শরূপে এঁদের রচনাকেই পেয়েছিলেন। প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে আলোচনার জন্যে তিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডী', ভারত চন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যা সুন্দর', দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' এবং কবিয়াল ও পাঁচালীকারদের কিছু রচনাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তাই হরচন্দ্রের কাব্য-সমালোচনার পরিধি সীমিত ছিল। তা হলেও পাশ্চাত্য কাব্যের সমৃদ্ধির চিত্রের পটভূমিতে বাংলা কাব্যের একটা আন্তরিক মূল্যায়নের প্রয়াস তাতে ছিল। আলোচনার মুখবন্ধে তিনি প্রথমে

বাংলা ভাষার উৎস, ঐশ্বর্য, শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি মন্তব্য করে গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে ল্যাটিন সাহিত্যের সম্পর্কের তুলনা টেনে সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। সংস্কৃতের কাছে নানাভাবে ঋণী হয়েও যে বাংলা ভাষা অনেকটাই স্বকীয়তার অধিকারী, একথা হরচন্দ্র প্রত্যয়ভরেই ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ হরচন্দ্র প্রচলিত বাংলা ছন্দগুলোর বৈশিষ্ট্য কিছুটা বিস্তৃত ভাবেই নির্দেশ করেছেন। মুখবন্ধের এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যেই হরচন্দ্র কৌশলে প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ও গ্রীক-সাহিত্যের ঋদ্ধি সম্পর্কে মূল্যবান কথা পুরে দিয়েছেন এবং এদের সঙ্গে তুলনায় যথাক্রমে বাংলা ও ল্যাটিন সাহিত্যের দৈন্য পরিস্ফুট করে তুলেছেন। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, দুর্গাপ্রসাদের কাব্যসমূহের বিষয় ও কাব্যমূল্য কিছুটা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার তুলনামূলক বিচারও প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে। প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃতিসহ ভিন্ন সাহিত্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে কোথাও তিনি কার্পণ্য করেন নি। বাংলা গীতিকা ও সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করতে গিয়ে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনে গীতিকা ও সঙ্গীতের অনিবার্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত গীতিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও মূল্যবান কথা বলেছেন। এরপর তিনি পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক 'রাজা কর্ণ' ও 'প্রহ্লাদ' সম্পর্কিত গাথা দুইটির গল্পাংশ সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। গীতিকা প্রসঙ্গ শেষ করে তিনি বাংলা গানের কথা বলতে গিয়ে বিশেষভাবে নিধু বাবু ও দাশরথি রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কবিওয়ালা রূপে আখ্যাত এই সঙ্গীতস্রষ্টাদের বাক্‌চাতুর্যের প্রশংসা করেও এঁদের রুচি ও ভাবচিন্তার দৈন্য সম্পর্কে হরচন্দ্র বিরূপ মন্তব্য না করে পারেন নি। হরচন্দ্র পাঁচালী জাতীয় পালাগানে ও অন্যান্য সঙ্গীতে স্থূল রুচির প্রকাশের মূলে এতদ্দেশীয় মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক অবনতিমূলক যে সব কারণ নির্দেশ করেছেন, তা তাঁর বাস্তব দৃষ্টিরই পরিচায়ক। প্রবন্ধের উপসংহারে হরচন্দ্র

বাংলা কবিতা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন, তা অপ্রিয় সত্যভাষণের রূঢ়তায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যপ্রেমীকে পীড়া দিলেও, সম্ভবত যথার্থই সত্যভাষণ ছিল। বাংলা কাব্য-সাহিত্য যে ইংরেজীসাহিত্য, এমন কি সংস্কৃত-সাহিত্যের তুলনায়ও নিতান্তই অবজ্ঞেয়, এমন কথাই তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন ইংরেজী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। তবে হরচন্দ্র দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় শিক্ষিত সমাজের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও প্রয়াস লক্ষ্য করে সমাপ্তিতে এই আশাই ব্যক্ত করেছেন যে অনতিদূর ভবিষ্যতেই বাংলা ভাষা আপন মহিমা আবিষ্কারে সমর্থ হবে এবং বাঙালী সংস্কারাচ্ছন্নতা ও কূপমণ্ডুকতা কাটিয়ে উঠে একটি সুসভ্য সুসংস্কৃত জাতিতে পরিণত হবে।

হরচন্দ্রের প্রবন্ধটির একটি অসম্পূর্ণতা ছিল এইখানে যে বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে তা সম্পূর্ণ নীরব ছিল। তবু বাংলা কাব্য সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা-প্রয়াস হিসেবে প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য কখনই অস্বীকৃত হবে না। ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত হরচন্দ্রই প্রথম বিশ্ব-সাহিত্যের পটভূমিতে বাংলা কাব্য বিচারের সূত্রপাত করেন। বাংলায় তুলনামূলক সমালোচনার সূত্রপাতও এই প্রবন্ধের দ্বারাই হয়েছে। অনেকটা নিরপেক্ষ সমালোচকের ন্যায়ই হরচন্দ্র প্রবন্ধটিতে বাংলা কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে অকপটে আপনার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত তুলনায় বাংলো-সাহিত্যের দৈন্যের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেও বিকশমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করে আপনার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। যতদূর জানা যায় বাংলা-কাব্য সম্পর্কিত হরচন্দ্রের বক্তব্য আরও কিছুটা প্রসারিত ও পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছিল ১৮৫২ সালেরই এপ্রিল মাসে বীটন সোসাইটিতে ইংরেজীতে পঠিত আর একটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ যে প্রথমোক্ত প্রবন্ধেরই অনুবৃত্তি মাত্র ছিল না, তার প্রমাণ মেলে সোসাইটির পরবর্তী অধিবেশনে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পঠিত 'বাংলা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধে'র বক্তব্য থেকে। রঙ্গলাল তাতে হরচন্দ্র নির্দেশিত বাংলা কবিতার ত্রুটি-নির্দেশক কয়েকটি বক্তব্যের প্রতিবাদে যে ব্যঙ্গমূলক উক্তি করেছিলেন,

তা থেকে বুঝা যায় হরচন্দ্র সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধে কিছু নতুন কথার অবতারণা করেছিলেন। সে যাই হোক, আমাদের হাতের কাছে প্রবন্ধটি আজ আর নেই বলে ঐ সম্পর্কে বিস্তৃত কোন আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে ডঃ সুকুমার সেন আমাদের জানিয়েছেন যে 'বীটন সোসাইটির পূর্ববর্তী অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত ইংরেজী কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়া বাঙ্গালা কবিতার নিন্দা করেন। ইহারই প্রতিবাদে (রচিত হয়েছিল) রঙ্গলালের প্রবন্ধ।'[১] রঙ্গলালের প্রবন্ধ থেকে প্রতিপক্ষের প্রতি অম্ল মধুর কটাক্ষ-পূর্ণ নিম্নোক্ত পংক্তিচয় উদ্ধৃত করে ডঃ সেন তাঁর ধারণার যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন। রঙ্গলালের উক্তি:

"বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল, তিনি বেণী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু কামিনীগণ কাল সর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন নাই; অহো দেখিয়াছেন বই কি! তবে বুঝি ইংরেজী বিদ্যা-প্রভাবে তেঁহ খাট খাট রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন।"[২]

এর থেকে আমরা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি যে বীটন সোসাইটিতে পঠিত বাংলা কবিতা সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতে হরচন্দ্র ইতিপূর্বে 'Calcutta Review' পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের চেয়েও জোরালো ভাষায় বাংলা কবিতার প্রতি সমালোচনার কশাঘাত প্রয়োগ করেছিলেন। তাতে মাত্রাধিক্য ঘটেছিল বলেই মনে হয়। রঙ্গলালের উপরি উক্ত ব্যঙ্গমূলক উক্তি থেকে অন্তত তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

আদি পূর্বের বাংলা কাব্য-সমালোচনার ইতিহাসে হরচন্দ্রের ইংরেজী প্রবন্ধের সমকালে রচিত রঙ্গলালের ঐ 'কবিতা বিষয়ক' বাংলা প্রবন্ধটিও সমান মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। হরচন্দ্রের ন্যায় রঙ্গলালেরও ইংরেজী বিদ্যায় যথেষ্ট অধিকার ছিল, তদুপরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল অপরিসীম অনুরাগ। রঙ্গলাল ইউরোপীয় বিদ্যার প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনি সংস্কৃত-লালিত দেশীয়

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: (২য় খণ্ড) ডঃ সুকুমার সেন: তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬২, ১০৯ পৃ:।

২। বাংলা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ (১২৫৯): রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাই ইউরোপীয় কাব্যের মহিমা অস্বীকার না করেও বাংলা কবিতার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে তিনি কোন দ্বিধা-বোধ করেন নি। হরচন্দ্রের রচনায় যেখানে ইংরেজী শিক্ষাজনিত সাহিত্য রুচির কৌলিন্য বোধের অতিরেক লক্ষ্য করা যয়, রঙ্গলালের রচনায় দেখা যায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্য রুচির সমন্বয় বিধানের এক অপরূপ প্রয়াস। রঙ্গলালের বিচার কর্মে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বোধ যেমন কাজ করেছে, তেমনি কাজ করেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-সাহিত্যের দেশ-কাল-ঐতিহ্যগত পার্থক্যের একটি বাস্তব বোধ। তথাপি রঙ্গলাল হরচন্দ্রের তুলনামূলক বিচার পদ্ধতিকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছিলেন। রঙ্গলাল অনেকটা আরোহ-পন্থী (Inductive) আধুনিক সমালোচকদের মত বিজ্ঞান-সম্মত সত্য সন্ধানের তাগিদে সমালোচ্য রচনার উপাদান বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিক বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে একটি যুক্তি-সম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। বাংলা কাব্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকায় [এবং নিজে একজন সুকবি হওয়ার ফলে] রঙ্গলালের কাজ নিঃসন্দেহে হরচন্দ্র অপেক্ষা সহজতর হয়েছিল। তাই দেখি রঙ্গলালের সমালোচনায় হরচন্দ্রের আলোচনার সমস্ত গুণই বর্তেছিল, কিন্তু তার দোষ বড় একটা স্পর্শ করে নি। তবে সমকালীন বাংলা গদ্য ভাষা ইংরেজীর মত অত শক্তিশালী প্রকাশক্ষম বাহন হয়ে উঠতে পেরেছিল না বলে রঙ্গলালের সমালোচনার ভাষায় অনেকটাই জড়তা থেকে গিয়েছিল, তা অস্বীকার করা চলে না। তবে সেটা রঙ্গলালের ব্যক্তিগত ত্রুটি নয়, সমকালীন, বাংলা ভাষারও সীমাবদ্ধতার ফল।

হরচন্দ্র বাংলা কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারে ইউরোপীয় সাহিত্যের মাপ কাঠিটির সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। তিনি দেশীয় রসবাদী সমালোচনার ঐতিহ্যকে উপেক্ষাই করেছেন। ফলে তিনি বাংলা কবিতায় প্রশংসা করবার মত বিশেষ কিছু খুঁজে পান নি। মুকুন্দরামের স্বভাব-বর্ণন ক্ষমতা ও বাস্তব সমাজচিত্র অঙ্কনে নৈপুণ্য, ভারতচন্দ্রের বাক্ বৈদগ্ধ্য ও বর্ণনাচাতুর্য এবং কবিওয়ালাদের গানে প্রকটিত বাক্‌চাতুর্যের

প্রশংসা করলেও হরচন্দ্র কোথাও ইউরোপীয় কাব্যের মত বাংলা কবিতায় শিল্পসুষমা সঞ্চারিত হতে দেখেন নি। রঙ্গলাল কিন্তু প্রেক্ষিত বোধের পরিচয় দিয়ে কাব্যবিচারে অগ্রসর হয়ে বাংলা কবিতায়ও লক্ষণীয় শিল্পগুণ দেখতে পেয়েছেন। রঙ্গলালের স্বদেশপ্রীতি বাংলা কবিতার নিরপেক্ষ মূল্যায়নের প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন ধারণা কেউ কেউ পোষণ করলেও, তাকে বিচারসহ বলা যায় না। রঙ্গলাল নিজে কবি ছিলেন, পাশ্চাত্য কাব্যানুশীলনেও তাঁর অনীহা ছিল না; তদুপরি সংস্কৃত কাব্যেরও তিনি ভক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্যের অনুশীলন ও অধ্যয়নের ফলে রঙ্গলালের সাহিত্য-বিবেক যথেষ্টই পরিপুষ্ট হয়েছিল। তাই তিনি যখন বলেন ঃ

"ইউরোপীয় কবিতাসতী আমাদিগের সম্ভ্রমের পাত্রী, সাধ্বী এবং লজ্জাশীলা স্ত্রীলোককে কদাচ ঘৃণা এবং উপহাস করা যায় না, কিন্তু আমাদিগের দেশীয় কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করিব।"[৩]

তখন একটি নিরপেক্ষ, পরিচ্ছন্ন ও সহানুভূতিশীল সাহিত্য-বিবেকই আমাদের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। দেশীয় কবিতার প্রতি কোন অসঙ্গত মোহ নয়; বরং তার অন্তঃপ্রকৃতির মহত্ত্ব সম্পর্কে সুগভীর প্রত্যয় ছিল বলেই, বোধ হয়, রঙ্গলাল তাকে হেয় মনে করতে পারেন নি। এখানেই হরচন্দ্রের উপর রঙ্গলালের জিত। কাব্য বিচারে কবি মনের সহায়তা থেকে হরচন্দ্র একেবারেই বঞ্চিত ছিলেন। তাই বাংলা কবিতার হৃৎ-কমলের সন্ধান কোন দিনই তিনি পান নি; আর পান নি বলেই তার সৌরভে কোনদিন আকুলতাও বোধ করেন নি। রঙ্গলালের এই বাধা ছিল না। তাই রঙ্গলাল বাংলা কাব্য সমালোচনায় হরচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশী সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। রঙ্গলালের আলোচনার পরিধিও হরচন্দ্রের অপেক্ষা ব্যাপক ছিল, এ কথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যের সামগ্রিক ঐতিহ্যের নিরিখে বাংলা কাব্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস; মুকুন্দরাম,

৩। বাংলা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ (১২৫৯): রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতচন্দ্র হয়ে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত আলোচনাকে প্রসারিত করেছিলেন। এ আলোচনায় তিনি সঙ্গত যুক্তি দেখিয়েই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের প্রশংসা করেছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের সমাজ চিত্রের যেমন উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তেমনি ভারতচন্দ্রের কাব্যের গুণাগুণ নির্দেশ প্রসঙ্গে অশ্লীলতার অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন পাশ্চাত্য কবিদের রচনা থেকে থেকে সমধর্মী রচনাংশের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে। লক্ষ্য করার বিষয় রঙ্গলাল বাঙলার প্রাচীন কবিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে দু একটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য কবিদের কিঞ্চিৎ তুলনার আভাস দিয়েছিলেন। প্রবন্ধ মধ্যে অন্যত্রও তিনি প্রয়োজন বোধে পাশ্চাত্য কবিদের দৃষ্টান্ত টেনে এনেছেন। মোট কথা হোমর, ওভিড, পেত্রার্ক হতে শেক্সপীয়র, বেন জনসন পর্যন্ত বহু পাশ্চাত্য কবির কথা যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন, তেমনি বাল্মীকি, ব্যাস, ভর্তৃহরি কালিদাস, বররুচি থেকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার পর্যন্ত সংস্কৃত কোবিদদের ও স্মরণ নিয়েছেন।

রঙ্গলালের কাব্য-সমালোচনা সর্বত্রই নির্ভুল ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। যেখানে তিনি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে Shakespeare এর Venus and Adonis কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, সেখানে তিনি ঠিক সাহিত্য মূল্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি; কিন্তু যেখানে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন: ''মনুষ্য বড় বিদ্বান হইলেই যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপীয়র অপেক্ষা বেন্ জনসন এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন; পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্য শাস্ত্রের পয়োধি বিশেষ এবং প্রকৃত কবির অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে; কিন্তু অস্মদ্ ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বর গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিতা শক্তি ধারণ করেন''[৪] তখন সে কথা নিশ্চয়ই সাহিত্য-বিচারের কথা। মোট কথা রঙ্গলালের 'বাংলা কবিতা বিষয়ক' প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে তাঁর সমালোচন রীতির যে বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে, এক, রঙ্গলাল আধুনিক

৪। বাংলা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ (১২৫৯): রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস-সাপেক্ষ সমালোচনার আদর্শ অনুসরণে উৎসুক ছিলেন; দুই, তিনি তুলনামূলক আলোচনা রীতি যেখানে সুপ্রযুক্ত সেখানেই অনুসরণ করেছেন; তিন, রসবাদী সমালোচকদের মত তিনি কবিতার সার্থক অন্তর্নিহিত আনন্দের লক্ষণটি চিহ্নিত করতে পারতেন। তাই কাব্য বিচারে পাণ্ডিত্যের দাবী অগ্রাহ্য করার মত সৎসাহস তিনি দেখাতে পেরেছিলেন। রঙ্গলালের সমালোচনা পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ক্রিয়াশীল দেখতে পাই সন্দেহ নেই; তবে রঙ্গলাল তাঁর আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকের ন্যায় শান্তভাবে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না হয়ে, প্রতিবাদের উত্তেজনায় আবেগের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন। আসলে স্বভাবসিদ্ধ কবিধর্মে রঙ্গলাল ছিলেন হৃদয়বোধেরই পক্ষপাতী। তাই তাঁর আলোচনায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সব সময় জয়যুক্ত হয় নি। তবে রঙ্গলালের পক্ষে একটি কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, যে তিনি যখন কোন কিছু প্রমাণ করতে বসেছেন তখন তর্ক করেছেন, সাধ্যানুসারে যুক্তি দিয়েছেন। আসলে রঙ্গলালের সমালোচনায় কবিস্বভাব ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সংমিশ্রণ দেখা যায়। তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিক সমালোচনা উপহার দিতে না পারলেও, প্রবন্ধের প্রায় সর্বত্র আপনার বিচারশক্তির স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন।

হরচন্দ্র ও রঙ্গলাল ১৮৫২ সালে বাংলা কাব্যের এই যে সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, ১৮৭১ সালে 'Calcutta Review' পত্রিকার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলা সাহিত্য' সম্পর্কীয় ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশের কাল পর্যন্ত, বাংলা কাব্য-সমালোচনার তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল উন্নত দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনীবুদ্ধি পরে তাকে আর ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়েছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ', ইত্যাদি পত্রে প্রকাশিত নানা কাব্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তারই পথ প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীদের সাধনায় বাংলা কাব্যের সে-সমালোচন ক্ষেত্র আজ যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। হরচন্দ্র অথবা রঙ্গলাল কেউ হয়ত আজকের বিচারে বড় কাব্য সমালোচক বলে গণ্য হবেন না কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্য-সমালোচনার পথিকৃতের গৌরব যে তাঁদেরই প্রাপ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।